মিহির আচার্য

ক্যালকাটা পাবলিশার্স

১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৬৬

প্রকাশক
মলয়েন্দ্রকুমার সেন
ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা।

মুদ্রক
প্রাণকৃষ্ণ পাল
শ্রীশশী প্রেস
৪৫, মসজিদবাড়ী স্ট্রীট
কলিকাতা।

প্রচ্ছদ শিল্পী
টাস্

দাম পাঁচ টাকা॥

And Jesus saith unto him, the foxes have holes, and the birds of the air have nests ; but the Son of man hath not where to lay his head.

Bible

এই লেখকের

জোনাকির আলো

ছয় ঋতু বারো মাস

'রুটির গায়ে মাখনের মতো আবেগ হচ্ছে সেই বস্তু যার কল্যাণে জীবন সতেজ, সচল আর প্রাণবান হয়।' জয়শীলার ছুঁড়ে-মারা কথাগুলো কেমন কেতাবী শোনায়।

ওর ভারি-ভারি কথার ভারে, নাকি স্বভাবগুণে দেবপ্রিয়ের মাথার সঙ্গে রেস্টুরেন্টের টেবিলের দূরত্ব নিকটতর হয়ে এল। আনমনে কাঁটা চামচ দিয়ে প্লেটের বুকে হিজিবিজি কাটতে লাগল। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, কপালে দু'একটা টুকরো অবাধ্য ভরে ঝুলে পড়েছে, মোটা মোটা ভুরু, আর তার নিচে চোখা নাকের পেলব ডগাটা ঘর্মখিন্ন। কোনোদিনই সবাক নয় দেবপ্রিয় আর জয়শীলার মুখোমুখি বসে এমনিতেই কথার খেই যায় হারিয়ে, অন্ধকারের লতার মতো তখন চলে নিজের মনে মনে আলাপন। সত্যি বলতে কি, ওর এই অ-বাক ভঙ্গিই টেনেছিল জয়শীলাকে দুর্বোধ্য রহস্যের মতো। ছেলে-বেলায় পূর্ণিয়ায় থাকতে ওদের বাসার ধারে ছিল একটা প্রকাণ্ড বটগাছ, খাড়া রোদে জড়পিণ্ডের মতো অকম্প এক ফালি ছায়া গড়িয়ে পড়ত গাছের পায়ের নিচে, বটগাছের পাকা ফল কুড়োতে-কুড়োতে ওই নিশ্চুপ রোদের সঙ্গে যেন কেমন করে গূঢ় আত্মীয়তা হয়ে গিয়েছিল ওর। দেবপ্রিয়ের মূক ভঙ্গিটুকু ছিল ওই ছায়ার মতোই নির্লিপ্ত আর উদাস।

'আজ কত তারিখ? ফাল্গুনের তিন-চার হবে। মনে আছে: গত বছরের এমনি সময়েই তোমার সঙ্গে আমার মনের গাঁটছড়া—' হাই তুলল জয়শীলা: 'কলেজ স্ট্রিট দিয়ে কত লক্ষ লক্ষ বার ট্র্যাম ছুটে গেছে!' ওর চোখ ঘুরল অন্য টেবিলে, রেস্তোরাঁয় ভিড় জমবার সময় এটা, ওই কোণের সুবেশ ছেলেটি সুমুখের মেয়েটির সঙ্গে কথা-বলার ফাঁকে-ফাঁকে দৃষ্টি ছুঁড়ছে তার দিকে। ক্ষতি কী, চোখ যখন তার আনন্দ নিঙড়ে নেয়, কথা তো থেমে থাকে না! জয়শীলার আত্মসচেতন মনটা স্বাভাবিক-গর্বে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। মেয়েটি কি ছেলেটিকে ভালবাসে? আর ছেলেটি?—ভালোবাসার চোখ দুটো বুঝি পাথরের!...হাসি, শব্দ, আর চামচের টুং-টাং। দেয়ালে ক্যালেণ্ডারে মেয়েটি হাসছে। দরজার গোড়ায় মালিকের টেবিল, দামি গেঞ্জী, হাতে রিস্ট্ওয়াচ, কেয়ারী করা গোঁফ। চোখ ফেরাল জয়শীলা। দেবপ্রিয়ও চোখ তুলেছিল, আবার নামিয়ে নিল।

'কটা বেজেছে?' উত্তরের জন্যে নয়, ভূমিকার প্রস্তুতি হিসাবেই আল্‌গা

জিজ্ঞাসা করল জয়শীলা: 'এই এক বছরে তোমার মনের একটি পাতাও নড়ল না।—আচ্ছা, মাথার ওপরের ফ্যানটা যদি জোরে চালিয়ে দিতে বলি তাহলেও কি-একবার ঝাড়া দিয়ে উঠবে না তোমার দেহটা, মনটা?'

বাইরে সন্ধ্যা ঘন হয়ে নেমেছে। শহরের যান্ত্রিকতার মাথা ছাড়িয়ে অনেক দূরে আকাশে বোধহয় নক্ষত্রগুলি এতক্ষণে দীপ জেলে বসেছে। রাজপথের ওপর বিশ্রী আর্তনাদ তুলে ডবল-ডেকারটা থামল, ফেরিওলার চিৎকার, সু-সাইন ছোকরাদের হাঁকডাক, ক্রমাগত একটা কোলাহলের ঘূর্ণি উড়ছে বায়ুস্তরে।

'—আচ্ছা' একটু থেমে আবার জয়শীলার জিজ্ঞাসা: 'বিয়ের পরেও কি তুমি এমনি থাকবে? এমনধারা নিশ্চুপ, নির্বাক, নিথর। তা না হয় হল! কিন্তু, বিয়ের কথাবার্তাগুলো তো তোমাকেই চালাতে হবে।'

দেবপ্রিয় এবার ভাষা খুঁজে পেল, মুখটা টেবিল থেকে অনেক কষ্টে তুলে জয়শীলার মুখের দিকে তাকাবার ভরসা খুঁজে পেল সে। কিন্তু কথাগুলো এমন শুকনো পাতার মতো ঝরঝর করে ঝরে পড়বে, কে জানত। বললে, 'বিয়ে—এরি মধ্যে?'

'কেন? অসুবিধেটা কি মশায়ের? এম. এ. রেজাল্ট বেরুল, ফার্স্ট ক্লাশ সেকেণ্ড হয়েছ। সরকারী কলেজে না-হোক ধারে কাছে কোনো প্রাইভেট কলেজে তো কাজ পাবে?'

'সে কথা হচ্ছে না—'

'তবে?' ঘাড়ের থেকে পিঠের ওপর বিনুনিটা সরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল জয়শীলা।

'তোমার মামাবাবু—'

'মামাবাবুকে রাজি করানোর ভার আমার।'

'কিন্তু—'

'দোহাই তোমার, আর কিন্তু-কিন্তু কোরো না।'

আবার নিঃশব্দত.।

রেস্টুরেণ্টে কথার ঝড় উঠেছে। হাসি, আনন্দ, বিদ্যুতের লহর। কোণের সেই ছেলেটি কায়দা করে সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করল। তারপর একমুখ ধোঁয়া সামনের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ওর সুমুখে-বসা মেয়েটির ঘাড়ের পাশ দিয়ে আবার জয়শীলার চোখে চোখ। সহসা চোখ ফিরিয়ে নিল না সে। আলতো হাতে ভ্যানিটি ব্যাগের স্ট্র্যাপটা নিয়ে পাকাতে লাগল। একবার হাতঘড়িটার দিকে চেয়ে সময় দেখে নিল। ছেলেরা এত মেয়েদের দিকে তাকায় কেন! কি

দেখে তারা? দার্মিগেঞ্জি রেস্টুরেন্টওলা হাত তুলে বয়কে ডাকলেন, দু'আঙুলে হীরের আঙটি ঝলমল করে উঠল। গোঁফের ফাঁকে হাসি, দাঁতগুলো দুধ-শাদা, বাঁধানো নয় নিশ্চয়! আবার চোখ রাখল দেবপ্রিয়ের ওপর। নাকের ডগা, প্রশস্ত ললাট, অবিন্যস্ত চুল। হাতের আঙুলগুলো সরু-সরু, মেয়েলী।

হাসল জয়শীলা। বললে, 'শুনেছ, এবারও আমি কলেজে দৌড়ে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছি, আর টেবিলটেনিসে আমাদের দলই উইন করেছে।' একটু থেমে, 'আর অভিনয়ে যে মেডেল পেয়েছি সে কথা থাক।'

জয়শীলা উইমেন্স্ কলেজে ফোর্থ ইয়ারে পড়ে।

'ভাবছ পড়াশোনায় ফাঁকি দিচ্ছি?—মোটেই না। কলেজে খোঁজ নিতে পারো।'

বিশ্ববিত্তালয়ের ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক মামা বিজয়কেতু সেন। রোজ সন্ধ্যায় বাড়িতে ছাত্রদের আনাগোনা। নির্মাল্য আসে, বরুণ আসে, আসে দেবপ্রিয়, শুভ্রাংশু। সন্ধ্যার আকাশটা তপোবনের পবিত্র আগুনের স্পর্শে গম্ভীর হয়ে ওঠে। পশ্চিমের জানলার নিচে ইজিচেয়ারে শরীর ছড়িয়ে দিয়ে বসেন বিজয়কেতু। শ্রীনিকেতনের কাজ-করা মোড়ায় গোল হয়ে বসে ছাত্রেরা। কোনোদিন চা, কোনোদিন কফি। বৈদিক সংস্কৃতের সঙ্গে পৌরাণিক সংস্কৃত ভাষার তফাৎ কোথায়। অবেস্তাঁর ভাষার সঙ্গে ঋগ্‌বেদের ভাষার গোড়ায় কেমন মিল ছিল, অবেস্তাঁর 'অহুর' এবং সংস্কৃত 'অসুর' অভিন্ন। প্রাচীন ঋগ্‌বেদে 'অসুর' দেবতা অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, পরবর্তীকালে দুই জাতির বিরোধের ছাপ ভাষার ওপর এসে পড়েছে। অবেস্তাঁর 'অসুর' হল ভারতীয় আর্যভাষায় রাক্ষস, আর পারসিকরাও পাল্টা প্রতিশোধ নিল আমাদের 'দেব'-কে 'দানব' বানিয়ে। ছাত্রেরা এই জ্ঞানবৃদ্ধ গুরুর কথা শুনত মুগ্ধ হয়ে। মাঝে মাঝে এই বিদ্বজ্জন সভায় জয়শীলারও ডাক পড়ত, কখনো কফি বানাতে, কোনো-কোনোদিন শুধু মামার পাশে বসে সান্নিধ্য দেবার জন্যেও। আর এক লহমায় যেত তপোবনের ধ্যানরূপ খান খান হয়ে। নির্মাল্য চঞ্চল হত, বরুণ, শুভ্রাংশু—সকলেই কেমনধারা তৎপর হয়ে উঠত। অধ্যাপকের নিমীলিত চোখের পাশ দিয়ে তাদের দৃষ্টি ফিরত জয়শীলার বেশবাসে তার চামচ-নাড়ার টুংটাং শব্দে। প্রথম-প্রথম রক্তিম হয়ে উঠত সে, কিন্তু খারাপ লাগত না। উনিশ বছর বয়সটা খারাপ লাগবার বয়স নয়। অনেক রাত করে যখন আসর ভাঙত, খাওয়া দাওয়া সেরে ক্লান্ত হয়ে ঘরে এসে ঘুম আসত না তার চোখে।

মাসি স্নেহলতা ইস্কুলের খাতা দেখতে-দেখতে ঠাট্টা করত। কি যে সব বলত, শুনতে ভালো লাগলেও ঘোর-ঘোর আচ্ছন্নতার মধ্যে স্পষ্ট করে বুঝতে পারত না জয়শীলা।

ঊনচল্লিশ বছর পার-করে-দেয়া মাসিকে বড় অবাক লাগত জয়শীলার। মেয়েদের এমন নিখুঁত রূপ দুর্লভ। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত অনন্য। বয়েসের কোনো ভাঁজ পড়েনি, চোখের কোণে কোনো আঁকিজুকি নয়, কেবল চোখের কোল ভরা কাজলের মতো দাগ, চোখ দুটো তাতে আরো গভীর আর ঘন দেখায়। আর সমস্ত চরিত্রের মধ্যে এমন এক ঘরোয়া আচ্ছাদন, এত সহজ, নির্ভয়, যার ফলে বয়সের ব্যবধান সত্বেও বন্ধুর প্রগাঢ়তা অনুভব করে জয়শীলা।

কিন্তু, এত সহজ বলেই বোধহয় দুর্জয়। মনের রাজ্যে এমন একটা কোণ আছে যেখানে মাসি নিঃসঙ্গ, ধ্যানী। ঊনচল্লিশ বছর পর্যন্ত বিয়ে না-করার রহস্যটা বোধহয় স্নেহলতারই নিজস্ব জিনিস।

এখানে, মামার এই বিদ্বজ্জন সভাতেই, নির্বাক দেবপ্রিয় তার চোখ মনকে হরণ করে নিল। ও এতো নির্জন ছিল বলেই ওকে ঘিরে জয়শীলার ভাবাবেগের উৎস-মুখ খুলে গেছে, নিজের মনে রাঙিয়ে ফুলিয়ে ফেনিয়ে দেবপ্রিয়ের আর-এক ছবি তার মনে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। কোনাদিন রাস্তায় রাস্তায়, হেদোর মোড়ে, রেস্তোরাঁয়, কোনোদিন আউটরাম বুকের ব্যালকনিতে, গান্ধিঘাটের ঘনায়মান নির্জনতায় অবসরের মুহূর্তগুলো কাটিয়েছে দুজনে। দেবপ্রিয় কথা বলেছে কম, আর সেই ঘাটতি সুদেমূলে পূরণ করেছে জয়শীলা। কী ভালোই লাগে কথার তোড়ে ভেসে যেতে, যখন পাশে পরমপ্রিয় নির্বাক শ্রোতা অপলকে চেয়ে থাকে। কথা, কথা, আর কথা। মফঃস্বলের ছেলে দেবপ্রিয়। উত্তর বঙ্গের ছোট্ট শহর বালুরঘাটে বাড়ি। ওর বাবা ইস্কুলের সেকেণ্ড পণ্ডিত, বিত্ত নেই, কৌলীণ্য আছে। মধ্যবিত্ত সংসারের আরো কয়েকজন ভাইবোনের মধ্যে মানুষ। শান্ত, ধীর আর বিশ্বস্ত। জীবন সম্বন্ধে কোনো ভাবালুতা নেই, যেন হাতের মুঠোয় খুঁজে পেয়েছে জীবনের সঞ্জীবনী মন্ত্র। তাড়াহুড়ো নেই, কেরানিসুলভ ব্যস্ততা নেই, নির্ভেজাল ভালোমানুষ। উপলখণ্ডকে যেমন ঠেলে-ঠেলে নিয়ে যায় ঝরণার গতিবেগ, তেমনি জয়শীলার ভাবাবেগের বন্যায় যুগলপ্রেমের স্রোতে ভেসে চলেছে দুজনে। তারপর একটি বছরই গড়িয়ে গেল আপন খাতে। অনেক তারা জ্বলল, তারা নিবল, অনেক চাঁদ-ওঠা আর চাঁদ-ডোবা।

'চলো, ওঠা যাক।'

উঠে দাঁড়াল জয়শীলা। দীর্ঘায়ত, তন্বঙ্গী। অতিরিক্ত লম্বা বলে হাঁটলে একটু কুঁজো মনে হয়। কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে রাজপথে নেমে এল সে।

মাথার ওপরে রাত্রির আকাশে অজস্র নক্ষত্রের কৌতুক, বিজলীর আলোয় জ্যোৎস্না লজ্জায় পাংশু।

ট্র্যামে উঠে চুপচাপ বসে রইল সে।

বিবেকানন্দ রোড়ের মোড়ে নেমে গেল দেবপ্রিয়। আরো উজিয়ে জয়শীলা নামল বিডন স্ট্রিটে। বসন্ত কেবিনে নিত্যকার ভিড়, হেদোর আকাশ বৈকালিক পথিক পদচারনায় মুখর। স্কটিশ কলেজের পাঁচিল-ঘেরা বাড়িটা পাশে রেখে বাঁ-দিকে মোড় নিল জয়শীলা। আর একটা গলি পেরিয়ে ওদের বাড়ি।

ড্রয়িংরুমের প্রশস্ত ঘরটা এখন নির্জন। টেবিলে ঝুঁকে পড়ে বিজয়কেতু তার নতুন বইএর প্রুফ দেখছেন।

লঘুপায়ে ঘরটা পার হবে ভেবেছিল, মামার কণ্ঠস্বরে থমকে দাঁড়াতে হল।

'অমন আড়াল থেকে কে পালায়?'

'মামাবাবু আমি—' জয়শীলা ঘরে পা দিল।

'আমি ধ্বনি আর শব্দের কারবারি, আমাকে ফাঁকি দেয়া সোজা কথা নয়।' বিজয়কেতু সস্নেহে ভাগ্নির কাঁধে হাত রাখলেন: 'রোজ রোজ তোদের কলেজে টিউটরিয়াল থাকে, হ্যাঁরে? এত দেরি করিস কেন, ভাবনা হয় না?'

'শব্দ আর ধ্বনি ছাড়া তোমার কি আর অন্য ভাবনা আছে?'

'তোদের ওই এক ধারণা। এই যে তোকে রোগা-রোগা দেখাচ্ছে, খিদেও পেয়েছে মুখ দেখেই বুঝতে পারছি। বল, ঠিক কিনা?'

'ছাই। তোমার ওই বই-পড়া বিদ্যেয় কুলোবে না।'

'বই-পড়া বিদ্যের উপর তোর খুব রাগ দেখছি।' বিজয়কেতু চশমাটা খুলে টেবিলে রেখে চেয়ারে পিঠ দিয়ে বললেন: 'বিদ্যেটা তো মানুষের জন্মগত আসেনা রে, ওটা উপার্জন করতে হয় দশটা পুঁথি থেকে। এই যে তোদের রবীন্দ্রনাথ—'

'ওই আরম্ভ হল তোমার মাস্টারি। আমি তোমার ওই সুবোধ সুশীল ছাত্রের দল নই। আমার পাঠশালা সমস্ত পৃথিবী।'

'মানে তোদের কফিহাউস আর রেস্তোরাঁ—' হোহো করে হেসে উঠলেন বিজয়কেতু: 'একদিন তোদের কফিহাউসে আমি গিয়েছিলুম। ওইতো

তোদের পৃথিবী। তারচেয়ে আমার ড্রয়িংরুম কি খারাপ, কফি তো এখানেও মেলে।—আসল কথাটা কি জানিস: জীবন-দর্শন জীবন-দর্শন করে তোরা আজকের ছেলেমেয়েরা যত চিৎকার করিস, তার মধ্যে জীবনও নেই দর্শনও নেই। বাড়িতে বসে থাকলেও যেমন জীবন-দর্শন আসে না, দিন-রাত টইটই করে ঘুরে বেড়ালেও ও বস্তুটা আসে না। ওটা যে এক-একজনের মধ্যে কি করে আসে, কেউ বলতে পারে না।'

'কি কথা হচ্ছে তোমাদের?' স্নেহলতা উঠে এলেন এ ঘরে।

বিজয়কেতু হাসলেন। 'এই শীলাকে একটু জ্ঞান দিচ্ছিলুম।'

'না না মাসিমা, শুনো না মামাবাবুর কথা।' বাধা দিয়ে উঠল জয়শীলা ছদ্মরোষে: 'কেবল বাজে কথা। এযুগের সবকিছু খারাপ। আর মামাবাবুদের যুগে রাম রাজত্বি ছিল। মামাবাবু তুমি একেবারে সেকেলে হয়ে গেছ।'

'দেখছিস স্নেহ, পাগলী কেমন খেপেছে।'

'পাগল তো তুমিও কম নয় দাদা। কত রাত হয়েছে, খেয়াল আছে। চলো—টেবিলে খাবার দেওয়া হয়েছে।'

'তোর গিন্নিপনায় অস্থির, চল—'

খাওয়া দাওয়ার পর সমস্ত বাড়িটা নির্জন হয়ে এল। খাবার ঘরে আলো নিবিয়ে ঠাকুর চলে গেল নিচের ঘরে।

একই ঘরে পাশাপাশি দুজনের শয্যা। স্নেহলতার রাতজাগা অভ্যাস। ঘুমকাতুরে জয়শীলার চোখে আজ ঘুম নেই। দক্ষিণের জানালাটা খোলা, নীল পর্দাটা গুটোনো। তেলকলের চিমনির পাশ দিয়ে চাঁদ দেখা যাচ্ছে আর নীল-নীল ছেঁড়া মেঘের ঝালর। হাওয়া দিচ্ছে। বালিশে মাথা রেখে অনেকক্ষণ চুপ করে পড়ে রইল জয়শীলা। মাসি ঝুঁকে পড়েছে বিছানার শিয়রে টেবিল ল্যাম্পটার সামনে। কি বই ওটা? বিড় বিড় করে ঠোঁট নড়ছে মাসির। বাতির আধখানা আলো গৌর মুখটাকে কমনীয় করে তুলেছে। সত্যি কি বইয়ের জগতে অন্যমনা হয়ে গেছে মাসি। বাইরে কি অদ্ভুত চাঁদ উঠেছে, জ্যোৎস্নার খুশি, হাওয়ায় যুঁইফুলের গন্ধ। কোনো কিছুই কি মাসির চোখে জাগছে না, রাত্রির কোনো গন্ধই কি তাকে উতলা করে দিতে পারে না! কী ক্ষতি হয়, একদণ্ড বই বন্ধ রাখলে, চোখ আর মন দিয়ে রাত্রির সুধা আস্বাদ করে নিলে? এত চাঁদ আর আলো, এত হাওয়া আর খুশি কিসের জন্যে—যদি অবকাশের আনন্দ দিয়ে তাকে লেহন করা না যায়। (মাসিমা গো, একটু বই বন্ধই রাখোনা লক্ষ্মীটি, আলোটা নিবিয়ে

দাও, আলোতে যে আমার ঘুম আসছে না, স্বপ্ন নামছে না চোখে। আমার পাশে এসে বোসো, আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দাও। আমার মাথার মধ্যে যে কোলাহল করে উঠছে, তুমি কি শুনতে পাচ্ছো না, আমি কিছু বলতে চাই, এই চাঁদ-জাগা রাত্রি, এই দুর্লভ অবসর, মাসিমা গো, লক্ষ্মীটি—)

'কিরে শীলা, ঘুমোস নি এখনো?'

'না।' (লজ্জা—লজ্জা—লজ্জা। মাগো, মাসিমা কি কিছু আঁচ করতে পেরেছে?)

'ঘুম আসছে না?'

'না—'

'এক দুই করে ভেঁড়া গোন—'

'গুনেছি।'

'আবার গোড়া থেকে শুরু কর—'

'করেছি।'

'ঘুম আসছে না?'

'না।'

'জল খাবি?'

'না।'

'আলোটা নিবিয়ে দেবো?'

'দাও।'

অন্ধকার।

মাসিমা কি ঘুমিয়ে পড়ল! দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দ। কি ভাবছে মাসিমা? অন্ধকারটা যদি কাচের মতো স্বচ্ছ হত, তাহলে মাসিমাকে দেখা যেত, আর ভাবনাগুলিও হয়তো কাচের গায়ে প্রতিফলিত হত। বাইরে গলির মোড়ে ট্যাক্সির শব্দ, পাশের বাড়ির ভাঙা কলটা থেকে জল-পড়ার ঝরঝরানি আওয়াজ, একঘেয়ে, একটানা। একটা কুকুর প্রতিবাদের স্বরে ডেকে উঠল ঘেউঘেউ। চাঁদ দেখে কি পাগল হয়েছে কুকুরটা!

'কিরে উশখুস করছিস কেন?'

'কই না তো।' (মাসিমা ঘুমোয়নি। কি ভাবছে? মাসিমা, তুমি কেন মা হলে না!)

আবার নিঃশব্দতা।

রাত্রির প্রহর বাড়ে।

'মাসি—ও মাসিমা—' নিশ্বাস রোধ করে এক সময় ফিসফিসিয়ে উঠল জয়শীলা।

'উঁ ?'

'তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ ?'

'না।'

নিঃশব্দতা।

'মাসিমা—'

'জেগে আছি। কী বলবি বল।'

জয়শীলা চুপ। অসহ্য লজ্জার ভারে তার সবাক প্রকৃতি যেন একেবারে ভেঙে পড়েছে। কী বলবে সে? এত সহজ কথা, অথচ এত কঠিন। (মাসিমণি, তুমি কি বুঝতে পারছ না, আমি কি বলতে চাই। মাসিমা, তোমার বয়সকে আরো এগিয়ে নিয়ে এস, সেবার পূজোতে পুরীতে সমুদ্র দেখেছ, মাঝরাত্রে সমুদ্রের স্বরকে মনে হত দূর-থেকে ভেসে-আসা বৃষ্টির শব্দ! কান পেতে দাও তুমি, তোমার রক্তে কি কোনোদিন সেই বৃষ্টির নূপুর-নিক্কণ শোনোনি! মাসিমা, মাসিমা গো—)

'কই, কী বলবি বল!'

'না। তুমি ঘুমোও।'

স্নেহলতা বললেন, 'আমি জানি: তুই কি বলতে চাস। দেবপ্রিয়কে বিয়ে করবি, এই তো ?'

'মাসিমা—' (ও মাসিমা, ছি ছি, তুমি কি করে জানলে আমার মনকে, কোন চাবি দিয়ে আমার মনের দরজা তুমি খুলে দিলে! মাসিমণি, তুমি কি কোনোদিন আমি হয়েছিলে!)

'আয়, আমার কাছে আয়—'

বিস্রস্ত বসনে উঠে এল জয়শীলা। অন্ধকারে রক্তিম হয়ে উঠেছে সারা মুখ, ধকধক করে বুকের ভেতরে দুরন্ত হরিণীর মতো কি-একটা নাচছে। রক্তের মধ্যে একি অসহ্য পাগলামি।

স্নেহলতার নরম উষ্ণ হাতের আশ্রয়ে ওর হাতটা বন্দী হয়ে রইল। অন্ধকার সত্ত্বেও মাসির দিকে চোখ মেলে তাকাতে পারছে না সে। লজ্জা-লজ্জা-লজ্জা।

'বেশ ছেলেটি দেবপ্রিয়।' স্নেহলতা বললেন ওর হাতে হাত ঘসতে-ঘসতে। 'খুব ভালোবাসিস ওকে ?'

'জানি না—'

'ভালোবাসিস বলেই কি বিয়ে করতে চাস ওকে?'

'জানি না—'

'কিন্তু মানুষ সত্যি কি কাউকে ভালোবাসতে পারে রে?'

'কী বলছ মাসি?' জয়শীলার কণ্ঠে আর্তি, না বিস্ময়।

'মানুষ নিজেকে ছাড়া কাউকে ভালোবাসতে পারে না। পারা সম্ভবও নয়।'

'কী বলছ মাসি!' আবার বিস্ময় জয়শীলার।

'বেঁচে-থাকার মতো সত্য নিরাভরণ বস্তুটাকে আবেগ দিয়ে বিচার করলে চলবে কেন! আবেগ হচ্ছে জীবনের বুদ্‌বুদ্‌—আসল রঙ মেলে বুদ্‌বুদের ফেনা সরিয়ে ফেলে।'

'তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে।' অন্ধকারে হাত-পা ছুঁড়তে থাকে জয়শীলা।

'বলছি: ঘর বাঁধতে হলে সত্যের মশলা দিয়েই গেঁথে তুলতে হবে, আবেগের রঙ দিয়ে নয়। ভালোবাসার সত্যরূপ মানুষ দেখতে পায় চল্লিশ বছরের পর থেকে। তার আগের জীবনটা শুধু প্রস্তুতি আর দীক্ষার কাল।'

তীব্র হয়ে পড়ল জয়শীলার গলার স্বর: 'সেইজন্যেই কি তুমি আজো বিয়ে করনি মাসি? নাকি, বর পাওনি বলে!'

'তুই রেগেছিস। আজ ঘুমোগে। পরে আলোচনা হবে।'

'না।' তেজী ঘোড়ার মতো দৃঢ় জেদ জয়শীলার: 'আলোচনা যখন তুলেছ শেষ করার দায়িত্বও তোমার। কি বলতে চাও স্পস্ট করে বল।'

'ভালোবাসার মন তোর পাকেনি শীলা।'

'না—পাকুক। কাঁচামিঠেই না হয় রইল। জীবনের ভোজে ওটাও তো একটা স্বাদ।'

'আমার কথাটা ভেবে ছাখ। ভালোবাসার চেয়ে জীবনে বেঁচে-থাকার দাবি অনেক বড়। ভালোবাসার নেশায় জীবনের আসল প্রয়োজনের চেহারাটা ঢাকা পড়লে সংসারের ভিত শক্ত হয় না। দেবপ্রিয়ের কাছে তুই আশ্রয় চাস, আশ্রয়কে আশ্রয় বলেই চেন, অন্য নাম দিয়ে তাকে ঘোলাটে করিস নে। আর আশ্রয় মানে মাথা গোঁজার আস্তানা নয়, আপন সত্তা, ব্যক্তিত্বের প্রসার। সে-আশ্বাস কি দেবপ্রিয় দিতে পারবে?'

'পারবে বলেই তো বিশ্বাস করি।'

'সেইখানেই তোদের জোর, তোদের অস্তিত্বের সংগ্রাম। এ-বিশ্বাস যদি থাকে, আমার আশীর্বাদও রইল তোদের ওপর।'

জয়শীলা চুপ করে রইল।

বাইরে জ্যোৎস্না রুগ্ন ফ্যাকাসে হয়ে এসেছে। হাওয়ায় যুঁইফুলের গন্ধটা আর নাকে লাগে না। কি তেল মেখেছে মাসিমা, নাকি শরীরের গন্ধ, মাসি কি আজকাল জর্দা-পান ধরেছে!

স্নেহলতার কণ্ঠস্বর আবার রিনিরিনি চুড়ির মতো বেজে উঠল। 'পৃথিবীতে মানুষ এত দুঃখ পায় কেন জানিস? নিজেকে চেনে না বলে। দুঃখটা আসে তার নিজের থেকেই। আবেগের আগুনে সে কয়লার মতো পোড়ে, পোড়ায়।'

স্নেহলতার কথা থামল, কিন্তু তার গমক, রেশ যেন ছড়িয়ে গেল দিগ্‌দিগন্তে।

নিজের বিছানায় ফিরে এসে অনেকক্ষণ চেতনামগ্ন প্রাণীর মতো অসাড় পড়ে রইল জয়শীলা। সন্ধ্যাকাশে একটি-একটি করে তারা-ফোটার মতো সংজ্ঞা ফিরে আসতে লাগল। মাসিমার কথাগুলোর সত্যিই কি কোনো অর্থ আছে, নাকি বই পড়ে-পড়ে বেশি ভাবে মাসিমা? আবেগই তো জীবন, রুটির গায়ে মাখনের মতো জীবনকে স্নিগ্ধ করে। জীবনটা কি মাসির ব্যাখ্যা মতো এত শাদাসিদে, এমন নিরাভরণ। আবেগ কয়লার মতো পুড়তে পারে, পোড়াতে পারে, কিন্তু কয়লাই তো জীবনে উত্তাপ আনে! সব ভাবনার হিজিবিজি ছাড়িয়ে—ছাপিয়ে দেবপ্রিয়ের নরম-কোমল মুখই চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মামাবাবু মাঝে মাঝে ওর সম্বন্ধে রহস্য করে বলতেন: দেবানাং প্রিয়ঃ। যা কিছু ভালো, যা কিছু সুন্দর-মনোরম তারই মূর্তিমান আইডিয়া দেবপ্রিয়। মামার অন্যান্য ছাত্রদের মতো বাচাল নয়, হাল্‌কা নয়। গভীরতা বেশি বলেই তো তার উচ্ছ্বাস কম। আর ওর চরিত্রে যে বস্তুটির অভাব—জয়শীলার স্বভাবে তারই পরিপূর্ণতা।

কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল জয়শীলা। ওদিকে স্নেহলতার চোখে ঘুম নেই। কপালের দুপাশটা কেমন দব্‌দব্ করছে। না—না। অতীতের অধ্যায় স্মরণ করে কোনো লাভ নেই! অতীত অন্ধকার, ধূসর, বিবর্ণ। অতীতকে অস্বীকার করেই যদি এতগুলি বছর কেটে যেতে পারে, আরো কয়েক বছর চলে যাবে ঠিক। পুরোহিতের কয়েক টুকরো মন্ত্রের বন্ধনে রাতারাতি সেই গোড়ে মালা যদি শুকনো দড়ির মতোই গলায় পাকিয়ে যায়, তাকে বাতিল কাগজের মতোই ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে। মিথ্যাকে আরো কতগুলো

মিথ্যে দিয়ে জড়িয়ে রাখেননি স্নেহলতা। সিঁথের সিঁদুর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভিজে তোয়ালে দিয়ে মুছেছেন, ঘা দিয়ে ভেঙেছেন হাতের নোয়া।

আবেগ দিয়ে জীবনের মতো নিরাবেগ ব্যাপারটাকে চিনতে চেয়েছিলেন তিনি। তারপর সূর্য উঠল। আবেগের কুয়াশার শেষ কণিকাটুকু শোষণ করে নিল সূর্যের নিশ্বাস। অসার্থক, বিড়ম্বিত হয়ে উঠল জীবনের বোঝা। রাত গেল, কত, কত রাত, চোখের জলে বালিশ ভিজল, ভিজল চেতনা। তারপর নিজের দুর্বলতাকে দু'হাতে ঠেলে ফেলে দিলেন তিনি, মিথ্যা স্বপ্নের মতো।

ওয়েলটেয়ারের সেই স্বাস্থ্যোদ্ধারের মাসগুলি।

বসন্তের দেশে নতুন বসন্ত এসেছে। সমুদ্র তখনো একঘেয়ে হয়ে ওঠেনি। বীচ্ রোডের ওপর বাঙ্লো টাইপের বাসা। জানালা খুলে দিলে আদিগন্ত সমুদ্রের নীল, শিশুর চোখের কাজলধোয়া কালির মতো সুন্দর। উঁচু উঁচু ব্রেকারগুলো যেন অজগরের ফণা, লোভার্ত উচ্ছ্বাসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে বেলাভূমির ওপর। মাঝদরিয়ায় হলদে পাখির ডানার মতো পাল-তুলে মাছ ধরছে জেলেরা। সকাল থেকে দুপুর, দুপুর থেকে বিকেল, সমুদ্র রঙ বদলাত, আর সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে পোড়া তেলের মতো কালো হয়ে আসত সমুদ্রের জল, কেবল ফসফরাসের চোখ জ্বলত অন্ধকার রাত্রিকে বিদীর্ণ করে।

সে-এক দিন। সকালে সূর্যোদয়ের রঙ-খেলা, বেলাভূমি ধরে হেঁটে বেড়ানো, ব্রেকারের ঢেউ এসে ভাসিয়ে দিত পায়ের পাতা। আর এমনি এক ঢেউয়ের মতো এসে হঠাৎ দু'দিনেই বীরেশ্বর তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। ওর বলিষ্ঠ বাহুতে দুলে উঠল স্নেহলতার জীবনের ছন্দ, সব ওলট-পালট হয়ে গেল। বীরেশ্বর কাস্টমস্-এ বড় চাকরি করত, ওরা প্রবাসী বাঙালী। ওর মা বাবা থাকতেন রাঁচিতে। সীমাচলমের সিঁড়ি বেয়ে উঠছিলেন স্নেহলতা, বীরেশ্বর নামছিল ওপর থেকে। চোখ আটকে গেল বীরেশ্বরের, সে-চোখে বিস্ময়, না প্রশংসা, না শুধু খেলার নেশা, কে জানত! তারপরে একদিন দেখা চার্চ হীলে। ডকে সেদিন ডিউটি ছিল না বীরেশ্বরের। পাহাড়ের ওপর এক পাথরে বসে নিবিষ্টমনে সিগার খাচ্ছিল। স্নেহলতাকে দেখে সেদিন শুধু বিস্ময় নয়, প্রশংসা নয়, আনন্দ। হেসেছিল সে। হাসি চাপতে গিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন স্নেহলতা। রেহাই দেয়নি বীরেশ্বর, এগিয়ে এসে আলাপ করেছিল ঃ 'আপনি বাঙালী?'

মাথা নেড়ে জানিয়েছিলেন স্নেহলতা ঃ 'হ্যাঁ—'

'এই তেলেগুর দেশে বাঙলা কথা বলতে পেরে বাঁচলাম। কোথায় থাকেন আপনি ? আশাকরি আমার প্রশ্নে বিব্রতবোধ করছেন না ?'

আরক্তমুখে উত্তর দিয়েছিলেন স্নেহলতা : 'না না—'

বীরেশ্বর সুপুরুষ নয়, তবে পুরুষ বলতে মেয়েদের মনে বীরপূজার প্রতি যে সম্ভ্রমবোধ থাকে, তারই সার্থক উদাহরণ বীরেশ্বর। পেশল, ঋজুদেহ, নির্ভীক দৃষ্টি—যতদূর তাকায় স্পষ্ট করে তাকায়।

সমুদ্রের 'ওজোনে' তখন শরীর সেরে উঠেছে। বিজয়কেতু লম্বা ছুটিতে বোনকে মাঝে মাঝে দেখে যান, অন্য সময় মাদ্রাজী আয়া প্যারাম্মা আর তার একার সংসার। সমুদ্রের ধারে যারা বাস করেছেন তাঁরা জানেন সমুদ্র কেমন করে তার সন্তানদের প্রভাবিত করে। সমুদ্রের বিশালতা, আর উদারতা—সমাজ সংসারের বন্ধন থেকে মানুষকে অন্য এক অনাস্বাদিতপূর্ব মুক্ত জীবনলীলার মধ্যে টেনে আনে। আপনার সাধ্য কি তার প্রভাব থেকে মুক্ত হবেন।

আলাপ করতে এসে—ধীরে ধীরে তার চেতনাকে অধিকার করে বসল বীরেশ্বর। আর মেয়েরা যখন অধিকার ছাড়ে তখন সম্পূর্ণভাবে অন্য ব্যক্তিত্বে লীন হয়ে যায় তারা। তাদের ভালবাসার এইখানেই গৌরব, আর এইখানেই বোধ হয় চরম পরাজয়।

সমুদ্রের আকাশ-বান-ডাকা আবেগে ভেসে গেল দুটো প্রাণ। কোনোদিন ডলফিন্‌স নোজে, পাহাড়ের ওপর থেকে অপার অনন্ত সমুদ্রের বিস্তার—নীল, নীল, নীল। বীরেশ্বরের শক্ত হাতে কটিদেশের বেদনা সেখানে শূন্য আর ধোঁয়া হয়ে আকাশে মেঘ রচনা করে। বীরেশ্বরের চোখ যেন সমুদ্র, ডানামেলা চিলের মতো তার বুকের ওপর দিয়ে সাঁতার কাটা চলে। কোনোদিন সন্ধ্যায় লসনস্‌বে—বাঁক ঘুরে সমুদ্র এখানে শান্ত, জেলেপাড়া, যেখানে জীবনের আদিমতা রহস্যস্নাত, অকলুষ।

হৃতস্বাস্থ্যের পরিবর্তে নতুন এক স্বাস্থ্যই পেলেন না স্নেহলতা, নতুন আরামে আগাগোড়া জীবনের ধারাই গেল বদলে। আর এই পরিবর্তনের প্রধান সহায়ক ছিল বীরেশ্বর আর সামুদ্রিক চেতনা।

বীরেশ্বর যখন এসে সামনে দাঁড়াত তার পাহাড়ের আড়ালে সমস্ত পশ্চাদ্‌পটটাই যেত হারিয়ে। বীরেশ্বরের প্রত্যক্ষ অস্তিত্বই ছিল বিরাট সত্য, স্নেহলতার সাধ্য ছিল না সেই পাহাড়প্রমাণ অস্তিত্বের পাঁচিল ডিঙিয়ে পশ্চাদ্‌ভূমির সত্যকার;পরিচয় জানবার।

সেদিন সন্ধ্যা থেকেই আকাশ কালি। আলকাৎরা-কালো সমুদ্রের জল সমানে গজরাচ্ছে। উদ্দাম হাওয়ায় দানবের বাঁশি, বালির ঝড় উড়ছে, মুখেচোখে তীক্ষ্ণ শরের মতো বিঁধছে বালিকণা। মাঝসমুদ্রে নোঙর-করা জাহাজটা ঘনঘন আলোর সংকেত জানাচ্ছে। এপারে লাইট হাউস থেকে লালবাতি স্থায়ী বিপদের লাল চোখ দেখাচ্ছে।

বারান্দা থেকে হাঁফাতে-হাঁফাতে ঘরে এসে ঢুকলেন স্নেহলতা। সমস্ত বীচভূমি জনশূন্য।

ঊর্ধ্বশ্বাস জীবন যাত্রার মধ্যে বিরাম-ঘেরা নির্জন অবসর। বীরেশ্বর এই ঝড় মাথায় আজ আসবে না। আজ নিঃসঙ্গ মন নিয়ে শুধু একা-একা খেলা। একটু ভাবতে চায়, বুঝতে চায়, শুভাশুভ বিচার করতে চায়।

প্যারাম্মা এসে রাতের খাবার দিয়ে গেল। ঝড় আসবার আগে খেয়ে নেওয়া ভালো।

তারপর আরো রাত ঘন হয়েছে। শুয়ে পড়েছেন স্নেহলতা। পাশের খাবার ঘরে প্যারাম্মাও সারাদিনের খাটনির পর শুয়ে পড়েছে।

হঠাৎ ঝড়ের দুদ্দাড় শব্দে, দরজা-জানালা নড়ার আওয়াজেই বোধ হয় ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে উদ্দাম ঝড়ের গোঁ গোঁ শব্দ, আর সমুদ্রে জল আছড়ানোর আওয়াজ। লাইট হাউস কি এখনো লাল বাতি জ্বেলে চোখ রাঙা করে রয়েছে!

খট খট খট—দরজাটা ভীষণ শব্দ করছে। ভেঙে পড়বে না তো খিলটা। মাথার ওপরে টালির ছাদটার ওপর দিয়ে দ্রুতপায়ে হাওয়া হেঁটে গেল—খর্ খর্।

খট খট খট—না, দরজাটা ভীষণ নাড়া দিচ্ছে। প্যারাম্মা! প্যারাম্মা বোধহয় অঘোরে ঘুম দিচ্ছে।

হঠাৎ মনে হল একটা শব্দ, একটা ফিস ফিস আওয়াজ, নাকি মনের ভুল, না, মনের ভুল নয়! কে যেন ডাকছে। প্যারাম্মা এত রাত্রে খবর নিতে ছুটে এসেছে হয়তো।

আস্তে আস্তে অর্গলটা খুলে দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে এক রাশ ঝড় আর ঝড়ের সেই শক্তিমান পুরুষটা হা হা করে ছুটে এল তার দিকে, জড়িয়ে ধরল তার বেপথু দেহকে, আর হিস হিস করে শব্দ করে উঠল ঝড়ঃ 'পারলাম না, পারলাম না কোয়ার্টারে আটকা থাকতে—'

'তুমি!'

ঝড় তখন দরজা খুলে দিয়েছে, হাহা করে হাওয়া ঢুকছে, একবার আর্তনাদ করতে গিয়ে থমকে গেলেন স্নেহলতা। পাঁজকোলা করে হালকা পালকের মতো তার দেহটা দু-হাতে তুলে ধরেছে বীরেশ্বর, ওর চোখে বৈশ্বানরের ক্ষুধা, ভয়ে চোখ বুজলেন স্নেহলতা। ওর সংগ্রামশান্ত দেহটাকে বিছানায় ছুঁড়ে মারবার সময়ও চোখ বুজে মুখ বুজে পড়ে রইলেন তিনি, কী ক'রে চাইবেন মানুষটার দিকে, ঝড়ের রাত্রে ভয়ংকর পুরুষ হয়ে উঠেছে বীরেশ্বর।

'না, না—'

সমস্ত 'না' ডুবে গেল বীরেশ্বরের প্রখর ইচ্ছার আগুনে। হিম হিম দেহটাকে আগুনের পুলক দিয়ে যেন সজাগ করে তুলল সে, শোনিতে বেলাভূমির গান আছড়ে পড়ল, প্রাণপণ শক্তিতে স্নেহলতা আরো দৃঢ় করে আঁকড়ে ধরল শক্তি উদ্ধত পুরুষটিকে।

বীরেশ্বর প্রতারণা করেনি। পরের দিন সকালেই বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে হাজির। দাদাকে সব জানিয়ে চিঠি লিখলেন স্নেহলতা।

বিজয়কেতু এলেন না। টাকা পাঠিয়ে দিলেন, আর তার সঙ্গে দুই ছত্র: 'ভাগ্যকে নিজের হাতে গড়তে চলেছ, তা সহ্য করবার শক্তি পরমেশ্বর তোমাকে যেন দেন। শকুন্তলার বিবাহে দুর্বাসার অভিশাপটা কবি-কল্পনা হলেই সুখী হব।'

'মাসিমা—ও মাসিমা—'

জয়শীলার ডাকে সম্বিত ফিরে পেলেন স্নেহলতা। পুরানো চিন্তার মধ্যে ডুবে গিয়ে কখন যে তিনি জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন, খেয়াল ছিল না।

'ও মাসিমা—ওখানে কি করছ?'

'গরম লাগছিল কিনা তাই—'

'বই পড়ে পড়ে তোমার মাথা খারাপ হবে। শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো বলছি।' জয়শীলা ধমকে উঠল।

স্নেহলতা বিছানায় ফিরে গেলেন।

কত রাত হবে? চাঁদটা আকাশের অনেক নিচে ঝুলে পড়েছে। ভোর হতে কত বাকি?

গায়ের ওপর পাতলা চাদরটা টেনে নিলেন স্নেহলতা।

'বাড়িতে চিঠি লিখেছ?' দেখা হতেই জিজ্ঞাসা জয়শীলার।

দেবপ্রিয় বললে, 'আজকেই লিখব।'

'এখনো লেখোনি। হোপ্‌লেশ!'

দেবপ্রিয় বিশীর্ণ হাসল। ওর পক্ষে যে ব্যাপারটা সহজ মনে হয়, অন্য কারুর পক্ষে তা যে কি এক নিদারুণ সমস্যার আকার ধারণ করতে পারে, তা তার ধারণা নেই। কলকাতা থেকে বালুরঘাট কয়েকশো মাইল দূরে সেখানকার আকাশটা কলকাতার মতো এত চকচকে সুবাসিত নয়।

'জানো: আমি মাসিমাকে সব বলেছি—'

'সত্যি? কি বললেন মাসিমা?'

'রাগ করলেন। বললেন: দেবপ্রিয়ের মতো একটা অপদার্থ—'

'ঠিকই বলেছেন।'

'ঠিকই বলেছেন!' ভেঙ্‌চে উঠল জয়শীলা: 'ন্যাখো মেয়েদের মতো ন্যাকামো কোরো না। পুরুষমানুষ অভিমান করলে আমার হাড়ের ভেতর রী-রী করে ওঠে।'

জয়শীলার হাড় রী-রী করার আশংকায় কিংবা অন্য কোনো কারণে দেবপ্রিয় চুপ করে গেল।

তার চোখে তখন ভাসছে আত্রাই-এর তীরে তীরে গাঁথা ছোট্ট শহরটা—বালুরঘাট। বর্ষায় প্যাচপেচে কাদায় আর দুর্গন্ধে কাঁচা ড্রেণ আর রাস্তা যেখানে থৈ থৈ করে ভাসে। রাত আটটার মধ্যে আলো নেবে শহরের, মোক্তারপাড়া থেকে পুল পেরিয়ে খালের ধারে যেতে গা ছমছম করে। ভূতুড়ে আলোর মতো ট্রেজারির বাতিটা ড্যাবড্যাব চোখে অন্ধকারকে দূর করবার চেষ্টায় তাকিয়ে থাকে। খালপাড়ের ধারে মীরার মাঠ, সেখানে তাদের বাড়ি। কাঁচা ঘর, মাথায় টিনের ছাউনি। বর্ষাকালে সন্তর্পণে উঠোনে পাতা ইট মাড়িয়ে ঘরে উঠে-আসা। বাইরের আকাশটা এখানে একরত্তি আঙ্গিনার ফ্রেমে আটকানো। দু'একটা তারার ঝিলিক। ঘরে ঠাসাঠাসি ভিড়ে ভাই-বোনেদের দঙ্গলে গুঁড়ি মেরে শুয়ে রাত্রি উৎরানো। জীবনের ধারণা এখানে জীবন-ধারণে। সকাল থেকে রাত্রি একই ধুয়ো। শীত সেখানে শীত, গ্রীষ্ম সেখানে গ্রীষ্ম, বর্ষার দ্বিতীয় রূপ নেই। অতি-বাস্তবের লগুড়াঘাতে ঋতু-রঙ্গের কাব্য সেখানে অন্তর্হিত।

'আচ্ছা, কি ভাব এত বলো তো? মুখটা গির্জের মতো করে রাখলেই বোধহয় দার্শনিক হওয়া যায়।'

হাসল দেবপ্রিয়। উত্তর করল না।

আউটরাম ঘাটের জেটিতে একটা লঞ্চ এসে ভিড়ল। ছলাৎ ছলাৎ। দোতলায় বুফেটা পর্যন্ত কেঁপে উঠল। চাঁদ উঠেছে আকাশে, গঙ্গার জলে উচ্ছ্বাস, আলো, আলোর সাপগুলো কিলবিল করছে। দুরপাল্লার নৌকো থেকে মাঝিরা গান ধরেছে।

জেটি থেকে অদূরে নোঙর-করা জাহাজটা আলোকমালায় বিভূষিত, কালো জলের স্রোতে দীপ ভাসিয়ে দিয়েছে বুঝি কারা।

'কী সুন্দর, না?'

'কি?'

'এই আলো, আলোর দীপ···আর এই জীবনটা।'

'ভালো।' (এই অন্ধকার···আলোর নিচে যেখানে খলখল স্রোত, অন্ধকার অনন্ত, নিরবয়ব।)

'এস—আর একটু চা খাই—'

'খাও।'

চায়ের পেয়ালায় দুধ ঢালতে-ঢালতে জয়শীলা জিজ্ঞাসা করলঃ 'কোনো খবর এল?'

দেবপ্রিয় বললে, 'কিসের?'

'বলছিঃ কোনো কলেজ থেকে খবর পেলে?'

'না। তবে বিশ্বভারতীতে একজন লেকচারার চেয়েছে এনসিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রির। মনে হয় চাকরিটা পেতে পারি।'

'বাবা! একেবারে অতো দূর। কলকাতার ধারে কাছে কোথাও হবে না?'

দেবপ্রিয় হাসল। 'তোমার কলেজ হলে হত।'

'আহা!' চিমটি কাটল জয়শীলা। তারপর একটু থেমে বললে, 'আচ্ছাঃ তোমার বাবা তো পণ্ডিত মানুষ, খুব গোড়া? অজাত-কুজাতের মানে— বস্তির মেয়েকে বরদাস্ত করতে পারবেন তো?'

দেবপ্রিয় হেসে বললে, 'কি জানি, গোবর জল খাইয়ে শুদ্ধ করে নিতে পারেন।'

জয়শীলা বললে, 'ঠাট্টা নয়। আমার ভীষণ ভয় করে। হয়তো তোমাদের খাবার ঘরে আমাকে ঢুকতেই দেবেন না। আচ্ছাঃ অসুখ-বিসুখ হলেও কি উনি বামুন-ডাক্তারকে দেখান?'

দেবপ্রিয় বললে, 'কি জানি, খরব রাখিনা।'

'কেন জিজ্ঞাসা করছি জানো?' জয়শীলা হাসতে-হাসতে বললে, 'আমার মাসিমা একবার এক বামুনের বাড়িতে নেমন্তন্ন রাখতে গিয়েছিলেন, খাওয়ার পর সে-বাড়ির গিন্নি বললেন: এঁটো পাতটা তুলে দাও মা। সেই থেকে মাসিমা আর কোনোদিন বামুনের বাড়িতে যান না।'

অনেক হাসি, অনেক সময়, অনেক সন্ধ্যা—কখনো মুখর, কখন মৌন। গঙ্গার জল কাঁপছে, আলোর তরঙ্গ নাচছে। মানুষ আর জল, শব্দ, শব্দের বুদ্‌বুদ্‌।

'সত্যি, আর দেরি নয়।' জয়শীলা বললে, 'রাত্রে আমার ঘুম হয় না।'

দেবপ্রিয় বললে, 'ঘুম হয়না! কেন?'

'তোমার কথা ভেবে-ভেবে। তোমাকে তো চিনি।'

'চেনো? দেখো: ভুল হয়নি তো?'

'আপাতত তো কিছু ভুল ঠেকছে না। ভয় করা যাদের স্বভাব, আমি সে-ধরণের মেয়ে নই। যেদিন ভুল বলে মনে হবে সেদিন ভুল বলেই জানব।'

জয়শীলার শরীর ব্যেপে স্থিরপ্রত্যয়। ওর গ্রীবাভঙ্গি, চোখের নির্দোষ ব্যঞ্জনা, বাহুর ভাঁজ, ঠোঁট থেকে ভেসে আসা শব্দের বৈভব—এক লহমায় মনে হয় এ-মেয়ে নিখাদ মশলা দিয়ে তৈরি।

'চলো—'

দোতলার সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল ওরা।

নির্জন গড়ের মাঠ। রাস্তা পার হয়ে মাঠের পথ ধরল দুজনে। অন্ধকারটা গাঢ়, নিরেট, যেন ছোঁয়া যায়। আর দু'হাত বাড়িয়ে তাকে পঞ্চইন্দ্রিয়ের দরজায় অর্গলবদ্ধ করাও চলে। আকাশে একরাশ তারা, হাওয়ার খুশি, চোখের পাপড়ি কাঁপে, ঠোঁটের ধনুক বিস্ফারিত হয়।

মাঠ পেরিয়ে ওরা আবার রাস্তায় উঠল।

রাত্রির আকাশটার বুকে থ্যাবড়া হাতে কে একরাশ কালি লেপে পুঁছে দিল। অসহ্য গ্রীষ্মে সমস্ত শরীরে যেন আগুনের প্রদাহ। হাওয়ার ঠোঁটকে কে দস্যু-হাতে চেপে ধরেছে। আলো-জ্বলা ঘরের মধ্যে স্থির নিথর পাথর-খণ্ডের মতো দাঁড়িয়ে রইল জয়শীলা। সংস্কৃত কবিরা বোধহয় এই অবস্থাকেই নিবাত নিষ্কম্প বলেছেন।

সংশয় কিছুতে দূর হয় না জয়শীলার। 'সত্যি বলছ মাসিমা, মামাবাবু মত দেননি?'

স্নেহলতা মাথা নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ রে। এ নিয়ে আমার সঙ্গে সারা সন্ধ্যে ঝগড়া হয়েছে। আমার কি মনে হয় জানিস: এ নিয়ে আর বাড়াবাড়ি করিসনে।'

'বাড়াবাড়ি বলতে তুমি কি বোঝো মাসিমা? দেবপ্রিয় আমাদের চেয়ে কোনখানে অযোগ্য?'

'সে প্রশ্ন আমার নয়।' স্নেহলতা চোখের ওপর হাত রেখে বললেন, 'তবে কি জানিস: বিয়েটা তো তোদের দু'জনের ব্যাপার নয় কেবল, গুরু-জনদের যদি শুভেচ্ছা না থাকে সেখানে…'

'সেকেলে! তোমরা একেবারে বুড়িয়ে গেছ মাসি। আমাদের সঙ্গে যদি চলতে না পারো রিটায়ার করো, তোমাদের আত্মিকালের ধারণার ঠাণ্ডা জল ছুঁড়ে আমাদের যাত্রাপথকে পিছল ক'রে দিও না।'

'আমাকে ভুল বুঝিস না শীলা। এর বেশি করবার আমার কোনো উপায় নেই। তবে একথা বলে রাখি: আমাদের মতামতকে উপেক্ষা ক'রে তুই যদি বিরুদ্ধ কিছু করিস, আমি অন্তত বাধা দেবো না। আমার চোখের জল আর মঙ্গলকামনা তোদের পেছনে থাকবে।'

'থাক। তোমাদের কোনো কিছুরই আমার দরকার নেই।'

স্নেহলতা লেখার কাগজের পর আবার ঝুঁকে পড়লেন। কিন্তু, এক কলমও লেখা এগোয় না, ভাবনাগুলি সিজিল-মিজিল হয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ দমকা হাওয়ায় খোলা বইয়ের পাতা যেমন হু-হু ক'রে উড়ে যায়, তেমনি এলোমেলো, বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ছে চিন্তার জগতটা।

পাহাড়ের নিচে সমুদ্রের বাঁকে বাঁকে গড়ে ওঠা সেই ওয়েলটেয়ারের বর্ণাঢ্য দিনগুলি। সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের সোনায় রাঙানো। অনুষ্ঠানের কোনো ত্রুটি করেনি বীরেশ্বর, ওর অফিসের দু' একজন বন্ধু, আর নিজের হাতে শুভকাজ সম্পন্ন করল মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ-পুরোহিত। কী নামটা যেন? আজ আর মনে নেই। বিয়ের দিন রাত্রেই বীরেশ্বরের কোয়ার্টারে উঠে এলেন স্নেহলতা। পরমসুধায় ভরে উঠল নিঃসঙ্গ দিনগুলি। নিজের ক্যামেরায় কত কায়দায় ছবি তুলেছিল বীরেশ্বর, সে ছবির দু'একটা কি বাক্স খুঁজলে আজ চোখে পড়বে না!…স্নান করা এলোচুলের কালো বন্যায় লাল পলাশের মতো সিঁথির সিঁদুর বড় পছন্দ করত বীরেশ্বর; বলত: 'ওই সিঁথের সিঁদুর দূরকে নিকট করে, আকাশকে ঘরের আঙিনায় টেনে আনে।' আসল কথা, সব পুরুষের মনে যা থাকে, তাকে ঘরোয়া

রূপে পেতে ভালোবাসত বীরেশ্বর। সারাক্ষণ তার অস্তিত্ব দিয়ে বীরেশ্বর তাকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখত। সমুদ্রের ক্রমাগত ব্রেকারের মতো, নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে হাঁপ ছাড়বার মুহূর্তে, অদৃষ্ট নিয়তির মতো ব্রেকার আছড়ে পড়ত তার ওপর, এক নিমেষে লণ্ডভণ্ড ক'রে দিত তার আপন সত্তা। ভালো লাগত, সুখে সৌভাগ্যে—কুঁড়েমিতে হাই তুলতে তুলতে দিন কেটে যেত।...

হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেলেন স্নেহলতা। বারান্দার ওদিকে বিজয়কেতুর ঘরে কারা তর্ক করছে। এত রাত্রে ছাত্রেরা বিদায় নেয়নি নাকি!

শীলা, জয়শীলা কোথায় গেল? কখন গেল? তবে কি...তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন স্নেহলতা। হ্যাঁ। তাইতো জয়শীলারই তো গলা, বিজয়কেতুর ঘর থেকে শোনা যাচ্ছে।

পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন তিনি।

'কিন্তু আমি ওকে কথা দিয়েছি যে!' জয়শীলার গলা। 'আমাকে মিথ্যেবাদী প্রমাণ করতে চাও?'

বিজয়কেতু বললেন, 'ছোটবেলায় কিরণ ও তোমার বাবা মারা যাবার পর তোমাকে নিজের মেয়ের মতো এনে মানুষ করেছি। আজ তোমার শুভাশুভের ভার আমার ওপর। আর দশজন মেয়ের মতো তোমাকে আমি মানুষ করিনি। বিয়েটা সে সব মেয়েদের পক্ষে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হতে পারে, কিন্তু তুমি এসব অতি সাধারণ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবে আমি ভাবতেই পারিনি।...আমি চাই কেরিয়ার, আমার অবর্তমানে আমার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তুমি, আমি তোমাকে ইংলণ্ডে পাঠাব, বড়, অনেক বড় হবে তুমি।'

জয়শীলা বললে, 'তুমি ভুল করছ মামাবাবু। আমি কেরিয়ার চাইনে। আমার কেরিয়ারের চাকায় একটি নির্দোষ প্রাণ বলি যাবে, এ আমি কিছুতেই মানতে পারিনা।'

'ফুল! সীলি আইডিয়াজ! এসব চিন্তা যে কে তোমার মাথায় ঢোকাল, অবাক হয়ে যাই! কী আছে দেবপ্রিয়ের? মিডিয়োকার ছেলে! বড় জোর দেড়শো টাকা মাইনের কলেজে মাস্টারি! তোমাকে বিয়ে না করলেও ওর জীবন চলে যাবে।'

'তোমার মতো ভাবতে পারলে হয়তো সমস্যাটা সহজ হয়ে যায়। কিন্তু মানুষের মন বলে একটা জিনিস আছে তার নিয়মকানুন আলাদা।'

বিজয়কেতু বললেন, 'মনকে প্রশ্রয় দেওয়াই কি প্রগতির লক্ষণ! শিশু যদি আগুনে হাত বাড়াতে চায়, পোড়ার হাত থেকে রক্ষা করতে সে হাতকে সরিয়ে আনা দরকার।'

জয়শীলা বললে, 'আমি শিশু নই মামাবাবু, আর পোড়ার কথা বলছ, আগুনে হাত না বাড়ালেও পোড়বার যাদের সাধ তারা এমনিতেই পুড়বে।' বলেই আর দাঁড়াল না সে, ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল। বারান্দায় রেলিঙ ধরে যে মাসি দাঁড়িয়েছিল, চোখে পড়ল না তার। রাত্রির সুপ্ত নির্জন ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল সে। ফুলে ফুলে উঠছে সারা শরীর, আর একটা গুমোট যন্ত্রণা, ভূমিকম্পের আগে ধরিত্রীর যে যন্ত্রণা, দাঁতে দাঁত এঁটে অনেকক্ষণ স্থির হয়ে রইল জয়শীলা। তারপর স্তম্ভিত রক্তে যেন জাগরণ এল, হাতের মুঠো দুটো শক্ত করে কোন্ অদৃশ্য শক্তির বিরুদ্ধে জীবনপণ জানাল, ঘরময় পায়চারী করতে করতে ভাবল জয়শীলা: কখন রাত্রি শেষ হবে, ভোরের আলোকে নতুন প্রতিজ্ঞা; নতুন অধ্যায়।

স্নেহলতা কখন নিঃশব্দ চরণে ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন, কোমল হাতে ওর পিঠে হাত রেখেছেন, তবু অচল অনড়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল জয়শীলা।

পিঠের ওপর মাসিমার ঘন গরম নিশ্বাস।

রাত্রির ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থেকে চোখ ব্যথা করতে লাগল জয়শীলার। (মাসিমাগো, আমাকে ছেড়ে দাও, অতো শক্ত ক'রে আমার কাঁধ চেপে ধরো না, আমার লাগছে। মাসিমণি, শরীর ছুঁলেই কি কাছে আসা যায়? যদি না মন দিয়ে ছোঁও। আমার মনে কি ঝড় উঠেছে, বাইরে থেকে তা' কি ক'রে বুঝবে! মনকে মন দিয়ে যে ছুঁতে হয়। তোমাদের কাছে আমার মন মরেছে, ও আর জাগবেনা, কোনদিনই জাগবে না। এ রাত ভোর হবে, আমার মৃত মন ভাসতে ভাসতে যাবে অন্য কোথাও, অন্য কোনো ঘাটে, যেখানে হাত বাড়িয়ে রয়েছে দেবপ্রিয়, দেবানাং প্রিয়, আমার মৃত মন ওরই সোনার কাঠির জাদুতে জেগে উঠবে। মাসিমা, তোমার পায়ে পড়ি, তোমার বাঁধন আল্‌গা করো, আমাকে একটু একলা থাকতে দাও, আমি জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখব, দেখব কেমন ক'রে রাত্রির কালো যবনিকা সরে সরে যাচ্ছে, ভোর ধারালো ছুরি দিয়ে ফালি ফালি করছে রাত্রির গর্ভ...)

'শীলা—শুনছিস?'

'উঁ...'

'অনেক রাত হল। শুবিনে?'

'মাসিমা, তুমি শোও।' (আমি ঘুমোতে পারিনে। ঘুমোলে আমার প্রতিজ্ঞা কমজোর হয়ে যাবে। আমি হৃদয়কে উষ্ণ রাখব, সারারাত জেগে দেহমনকে প্রখর ক'রে রাখব। মাসিমা, তুমি ঘুমোও।)

'তুই না শুলে আমি কি ক'রে ঘুমোই বল্?'

(মাসিমণি, তুমি মা হলে না কেন! আমি ঘুমোতে পারিনা। মাসিমা, তুমি কি জাদু জানো? আমাকে এই মুহূর্তে পাখি করে দাও না, আমি পিঁজর ভাঙব, আমি সোনার শেকল কাটব। মাসিমণি...)

ঘরের আলো নিবিয়ে দিলেন স্নেহলতা।

অন্ধকার।

বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে রইলেন তিনি। শীলা আজ রাত্রে আর ঘুমোবে না। কিন্তু তাঁর ঘুম আসছে না কেন? হৃদয়ে কার পদশব্দ। দরজা খোল—দরজা খোল। কে তুমি? বীরেশ্বর! চলে যাও—এ দরজা আর খুলবে না। যাবার সময় নিজের হাতে বন্ধ করে দিয়ে গেছ তুমি। তারপর এই পথ দিয়ে কেউ হাঁটেনি, ঘাস গজিয়েছে, বুনো ঝোপঝাড়, ফণিমনশার বেড়া, বছরের পর বছর জলে বৃষ্টিতে মাথা সমান হয়েছে জঙ্গল, দরজা ঢেকে গেছে জঙ্গলে, এ-দরজা আর খুলবে না।

সকালে ব্রেকফাস্টের টেবিলে তিনজনে এক সঙ্গে খাওয়াই রেওয়াজ।

কিন্তু আজকের টেবিলে জয়শীলা অনুপস্থিত।

বিজয়কেতু বিরক্ত মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'শীলা কোথায়?'

স্নেহলতা বললেন, 'ঘুমোচ্ছে।'

'ঘুমোচ্ছে! সারারাত জেগেছিল নাকি।' বিজয়কেতু বললেন, 'কি যে দিনকাল পড়েছে, আজকালকার ছেলেদের মনের গতি বোঝাই ভার। আমি হলপ করে বলতে পারি স্নেহ, এসব আজকের ছেলেমেয়েদের এক ধরণের অসুখ ছাড়া কিছু নয়।'

স্নেহলতা মুখ বুজে টোস্টে মাখন মাখাতে লাগলেন।

বিজয়কেতু আরো বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কি চুপ করে আছিস কেন, বোবা হয়ে গেলি নাকি।'

স্নেহলতা ম্লান হাসল। 'কী বলব দাদা, তুমি তো সব বলছ।'

'বলব। হাজারবার বলব। মুখে বস্তুতন্ত্রের বুলি আর মনটা পড়ে রয়েছে সেই আদিরসের দিকে। জীবনটা যেদিন বাঁধা ছিল মন্দাক্রান্তা ছন্দে, মানুষের অবসর ছিল যথেষ্ট, সেদিন এই আদিরসের বাড়াবাড়ির একটা অর্থ আছে। কিন্তু আজকের যুগ হচ্ছে বিজ্ঞান আর মনীষার, এটমবম্ আর স্পুটনিকের। মুখে বলব আধুনিক যুগ আর আধুনিক মানুষ আর অন্ধের মতো আঁকড়ে থাকব মধ্যযুগের ধ্যানধারণা চিন্তা ভাবনা, এর মতো হাস্যকর আর কিছু নেই।' বিজয়কেতু শব্দ করে চায়ে দীর্ঘ চুমুক এঁকে দিলেন।

চায়ের আসরটা একা গলায় তেমন জমাতে পারলেন না অধ্যাপক।

অনেক বেলায় ঘুম ভাঙল জয়শীলার। বাইরে বারান্দায় রোদ। মাসিমা বোধ হয় ওর শিয়রের জানালাটা বন্ধ করে গিয়েছিলেন। সকালে উঠে নতুন দিনের আলোতেও মনের গুমোট ভাবটা দূর হলনা ওর। ওদিকে খাওয়ার টেবিল থেকে মামাবাবুর জোরালো কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। আর মামাবাবুর শক্ত কঠিন মুখ মনে পড়তেই তার ভেতরের সংকল্পটা আরো দৃঢ় হয়ে উঠল। মুখ বুজে তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে চলে গেল সে।

জামাকাপড় ছাড়তে, মুখে আলতো করে পাউডারের পাফ্ ঘসতে, চিরুনি দিয়ে মুখের ওপর ঝুঁকে পড়া চুলগুলোকে দুরস্ত করতে, যেটুকু সময় লাগে। তারপর জুতোটা পায়ে গলিয়ে হনহন করে বারান্দা পেরোলো সে।

স্নেহলতা পথ আটকে দাঁড়ালেন। 'একী! কোথায় চললি এত সাত-সকালে। খাবি নে?'

'না।'

'পাগল হলি নাকি! কোথায় যাচ্ছিস?'

'চুলোয়—' স্নেহলতাকে পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামল।

'কে যায়?' বিজয়কেতুর গলা।

'আমি—'

'শীলা! এখন শরীর কেমন আছে? স্নেহ বলছিল তোর রাত্তিরে ঘুম হয়নি।'

'ভালোই আছি—'

'কোথায় যাচ্ছিস?'

'কাজ আছে।'

'তাড়াতাড়ি ফিরবি আজ কলেজ থেকে, বুঝলি। ত্রৈবর্ণ কলেজে চাইনিস এক্সিবিশনে যাব।'

রাস্তায় পা দিল জয়শীলা।

মামাবাবু কি তার ব্যাপারটার কোনো গুরুত্বই দিতে চান না। ছেলেখেলা মনে করেন। নাকি রাত্রির প্রগল্‌ভতা।

বিডন স্ট্রিট থেকে বিবেকানন্দের মোড় হেঁটে গেলে পাঁচ মিনিটের পথ। দ্রুত পা চালাল জয়শীলা।

হেদোর জলের ধারে কয়েকটা কাক প্রভাতী চিৎকার জুড়েছে, দু' একজন স্বাস্থ্যকামী পুরুষের ভিড়। রেলিঙের গায়ে ফুটপাথে পশ্চিমা ছাতুওলা সারি সারি থালা আর ঘটি ছড়িয়ে দিয়েছে। বেথুন কলেজের পাঁচিলে গেঞ্জি-পরা বাচ্চা ছেলেটা পোস্টার আঁটছে।

আরো এগিয়ে গেল সে। অবশেষে বিবেকানন্দ রোড। সেণ্ট্রাল এভিনিউর দিকে মোড় ঘুরল। দোতলা মেস-বাড়ি। নিচু থেকে সিঁড়ির ধাপগুলো আজ অনেক খাড়া আর দুর্গম মনে হচ্ছে। কয়েক লাফে অতিক্রম করতে পারলে যেন শান্তি পেত জয়শীলা। এবার দীর্ঘ বারান্দা। সিঁড়ির গায়েই দেবপ্রিয়ের ঘর। হাঁপাতে হাঁপাতে দরজার কড়াটা নাড়তে গিয়ে থমকে দাঁড়াল সে। দরজায় তালা ঝুলছে। এত সকালে কোথায় বেরুল দেবপ্রিয়? নাকি ধারে কাছে কোথাও আছে। পাশের রুমে জিজ্ঞাসা করবে কি করবে না ভাবছে, মেসের চাকরটা কাপ হাতে যাচ্ছিল, তাকে দেখে দাঁড়াল। 'কাকে চান? দেবপ্রিয় বাবু তো চলে গেছেন।'

'চলে গেছেন!' কথাটার প্রকৃত অর্থ বুঝতে যেন কষ্ট হচ্ছিল জয়শীলার। চলে গেছে, কোথায় গেছে, কখন গেছে।

চাকরটা বললে, 'বাড়ি থেকে তার এসেছিল—ওনার বাবার অসুখ। ভোরের ট্রেনেই ট্যাক্সি করে চলে গেলেন।'

কাল রাত্তির থেকে জড়ো করা উত্তেজনার বাষ্পটা যেন মিইয়ে এল। অনেকক্ষণ ক্লান্ত শ্রান্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল দেয়ালে হেলান দিয়ে। অপরিসীম শূন্যতা, আর ওদিকে মামাবাবুর নিশ্চিন্ত নির্বিকার মুখ। এই দুইয়ের টানা-পোড়েনে বিবর্ণ হয়ে উঠল মুখ। একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের মুখোমুখি দাঁড়াতে না দাঁড়াতে ধপ্‌ করে বসে পড়ল সে।

দেবপ্রিয় ফিরবে অবশ্য আজ না হয় কাল। না হয় কয়েকদিন দেরি হবে। এই কদিন দম ধরে পড়ে থাকতে হবে মামার আশ্রয়ে। উপায় নেই। যদি এতগুলো বছর থাকতে পারল, আর কদিনই তো। দেবপ্রিয়ের হাত ধরে ঘাড় সোজা করেই মামার চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে আসতে

পারবে। আর সেদিন মামাবাবুর মুখের চেহারাটা কেমন হবে! ভাবতেই আনন্দ হচ্ছে। কষ্টও কি হচ্ছে না? মা মরা মেয়েকে বাপমায়ের স্নেহ দিয়েই আগলে রেখেছিলেন তিনি, কিন্তু শাবকের ডানা গজিয়েছে, একবার ডানার জোর পরখ করে দেখবে না, দেখবে না আকাশটাকে, পৃথিবীটাকে।

ভাবতে ভাবতে ফিরল বাড়িতে।

বিজয়কেতু একবার আড় চোখে দেখে বইএর মধ্যে ডুবে গেলেন।

স্নেহলতা কুটনো কুটছিলেন। মুখ তুলে বললেন, 'চা খাবি?'

জয়শীলা আনত চোখে বললে, 'খাব।'

বঁটি ছেড়ে উঠলেন স্নেহলতা। হীটারের সুইচ অন্ করে দিলেন।

ধপ করে খালি মেজেতেই মাসিমার পাশে বসে পড়ল জয়শীলা।

ওর রোদে শুকনো মুখের দিকে চেয়ে স্নেহলতা বললেন, 'কীরে, শরীর খারাপ করছে?'

'না।'

'চোখ ছলছল করছে কেন?'

'কই না তো।'

'দেবপ্রিয়ের কাছে গিয়েছিলি?'

'হুঁ...'

'কী হল?'

'ও দেশে গেছে। বাবার অসুখ।'

স্নেহলতা লীকার ঢাললেন চায়ের বাটিতে। তারপর চামচ দিয়ে নেড়ে এগিয়ে দিলেন জয়শীলার দিকে।

'ক্রীম ক্র্যাকার খা দু খানা—'

'না মাসিমা। কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না।'

'ভাবছিস কেন? দেবপ্রিয় তো ফিরে আসবে।'

'হুঁ...'

উঠল জয়শীলা।

আবার ঘর। চার দেয়াল চার জানালা আর মাথার ছাদ। সকালের আকাশটা ঝকঝকে খাঁড়ার মতো ধারালো। টেবিলের পায়ের নিচে খরগোসের শরীরের মতো রোদের টুকরোটা স্থির। শীতকালে টেবিলে পড়তে পড়তে পা নাচাতে নাচাতে ওই রোদে পা সেঁকত জয়শীলা।

টেবিলের সামনে চেয়ারাটায় মুখ গোঁজ করে অনেকক্ষণ বসে রইল

সে। টেবিলে এলোমেলো বইয়ের স্তবক ঘুমিয়ে রয়েছে, এখুনি নাড়া দিলে একযোগে সকলে ভীষণ কলরব করে উঠবে। থাক বইগুলো অমন্ই নীরব হয়ে। জয়শীলার এখন নীরবতাই চাই। কাল রাত্রি থেকে যে গুমোট উত্তেজনা বহন করে চলেছে তার একটু আরাম চাই। ছড়ানো ছিটনো মনটাকে একটু গুটোতে চায় ডানাজড়সড়ো পাখির মতো। মামাবাবুর নিশ্চিন্ত নিরুদ্‌বেগ মুখ তাকে যেন লজ্জা দিচ্ছে। সবটাই একটা বিরাট তামাশা মনে করেছেন বোধ হয় তিনি। ছেলেমানুষি! তারপর একদিন ওঁর নিশ্চিন্ত মুখের সামনে দিয়ে যখন ঝড় তুলে বেরিয়ে যাবে, সেদিন মামাবাবুর চোখে কি থাকবে, বিস্ময় না বেদনা! একেবারেই সে অবশ্য চলে যাবে না। একদিন তার সংসারী রূপটাও তাঁকে দেখিয়ে যাবে বৈকি।

বেলা বাড়ল। রোদের রঙ পাল্‌টাল। স্নান-খাওয়া সেরে বই নিয়ে কলেজে বেরিয়ে গেল জয়শীলা।

হেদোর মোড়ে ট্র্যামের জন্যে অপেক্ষা করছিল, হঠাৎ পাশ থেকে কে বলে উঠল ঃ 'আপনার মামা কেমন আছেন?'

'কে?'

হাওয়াই সার্ট গায়ে, ট্রাউজারে মোড়া, ব্যাকব্রাস চুল, যত্নে-ছাঁটা গোঁফ, হাতে স্টেথেসকোপ।

'ও আপনি!' হাসল জয়শীলা। গতমাসে মামার কলিক পেনের সময় হঠাৎ রাত্রে হালে-পাশ-করা এই ডাক্তারটিকে কল্ দিতে হয়েছিল। সেই সুবাদে দেখা হলে চিনি চিনি হাসি, শিষ্টাচার বজায় রেখে দু' একটা কথা এই মাত্র! ভদ্রলোক তাঁকে মনে রেখেছেন এই যথেষ্ট।

নির্বানীতোষ হাসল। ওর দাঁতগুলো ভারি সুন্দর। বললে, 'যে ভাবে 'কে' বলে উঠলেন দস্তুরমতো ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।'

জয়শীলা লজ্জিত হল। 'সত্যি, একটু অন্যমনস্ক ছিলাম। কিছু মনে করবেন না।'

নির্বানীতোষ বললে, 'অন্যমনস্কতা আমাদের অসুখের মধ্যে পড়ে না, নইলে প্রেসক্রাইব্ করে দিতাম...'

'ধন্যবাদ।'

'আপনি কোন্ কলেজে পড়েন? প্রেসিডেন্সিতে...?'

'না। উইমেনস্ কলেজে।'

'স্কটিশ ছেড়ে দিয়ে উইমেনস্-এ।' নির্বানীতোষ আবার সুন্দর করে হাসল : 'বিজয়কেতু বাবু খুব গোঁড়া বুঝি?'

'বলতে পারি না। আমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল মামাবাবুর বন্ধু।'

ট্র্যাম এসে পড়ল।

'চলুন। একসঙ্গেই যাওয়া যাক। আমি মেডিক্যাল কলেজে যাব।'

ট্র্যামে উঠল দুজনে।

লেডিস্ সীটে জায়গা নেই। সীট্ আঁকড়ে দাঁড়িয়ে রইল জয়শীলা। ঠিক পিঠের ওপর নির্বানীতোষ। ওর উত্তপ্ত নিশ্বাস ঘাড়ে এসে লাগছে। নির্বানীতোষের অস্তিত্বটা যেন বড় বেশি প্রখর।

স্টপেজে নামতে নামতে মুখ ফিরিয়ে একবার হাসতে হল। হাসিটা রাস্তা পার হতেই কলেজের দোরগোড়ায় উঠতে উঠতে কখন উবে গেল। মামাবাবুর নির্বিকার নিরুদ্বিগ্ন মুখ আর দেবপ্রিয়ের চেহারা সব কিছু গুলিয়ে দিচ্ছে। দেবপ্রিয় কবে ফিরবে। বালুরঘাট কতদূর।...সারা কলেজের ঘণ্টা ঘোর ঘোর আচ্ছন্নের মধ্যে কাটল জয়শীলার। লতিকাদি ফিলসফি পড়ালেন, এক বর্ণও কানে গেল না: লতিকাদির গোল গোল মুখ, পাতা কাটা চুল, ব্যঞ্জনাহীন মুখ, শাড়ির পাড়, জামার হাতা ছাড়া কোনো-কিছু চোখে পড়ল না। শেকসপীয়ার রসিক দামোদরবাবুর ইংরেজি ক্লাশও যেন জমল না।

কলেজ থেকে বেরিয়ে কেমন শূন্যতাবোধ তাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরল। ট্র্যাম ছুটছে, বাস ছুটছে। অবিরাম জনস্রোত। ওই স্রোতের সঙ্গে যদি মিশে যেতে পারত! কিন্তু সত্যি কি পারা যায়? খাঁখাঁ মনটাকে মেশাবে কোথায়?

বাড়ির দিকেই ফিরল জয়শীলা।

ক্যালেণ্ডারের একটি মাসই কেটে গেল জয়শীলার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে দিয়ে। না এল দেবপ্রিয়, না খবর। তবে কি বাড়াবাড়ির দিকেই গেছে ওর বাবার অসুখটা। হয়তো ভীষণ মুশকিলে পড়েছে দেবপ্রিয়। যেমন নির্ভেজাল ভালোমানুষ, ল্যাজেগোবরে হচ্ছে বোধহয়। অসুখটা না হয় বাড়াবাড়ি, ওর সেখানে হাজির থাকাটাও না হয় আবশ্যিক বুঝলাম, কিন্তু একটা চিঠিও তো দেয় মানুষ!

নাকি দূরে চলে গেলে আর মনে থাকেনা জয়শীলার কথা! স্বার্থপর।

ছেলেরা এমনি স্বার্থপর! তার হৃদয়মন জুড়ে রয়েছে দেবপ্রিয়, আর দেবপ্রিয়ের মনের একটি কোণেও তার জায়গা নেই। রোগশয্যায় পরিচর্যার শ্রান্ত মুহূর্তেও কি একবার জয়শীলার কথা মনে পড়েনা? সুখে-দুঃখে যদি তার সাথি না হতে পারি, তাহলে তার প্রয়োজন কি!

বাড়িতে মুখ বুজে কেবল দিনগুলি কাটানো। বই নিয়ে কলেজে যাওয়া আর আসা। আর কোনোদিন কলেজের পথে নির্বানীতোষের হঠাৎ তৈরি-করা দেখা। সেই চিনি চিনি হাসি, টুকরো টুকরো কথা। নির্বানীতোষের ধৈর্য অসীম।

সেদিন ট্র্যামে বাসে বেজায় ভিড়। পর পর কয়েকটা ট্র্যাম বাস ছেড়ে দিয়েও উঠবার কোনো সুযোগ পেল না জয়শীলা। অগত্যা হেঁটেই পথ ধরল। আর সে সময়ে প্রেসিডেন্সি ফার্মিসিতে নির্বানীতোষেরও কী-কাজ পড়ে গেল! ভদ্রলোক সঙ্গে আসতে চাইলেন, বাধা দেয় কি করে। এটাসেটা কথা, খানিকটা ঘরোয়া ভাব আনবার চেষ্টা, কিছুটা সমাজনীতি রাজনীতির হাল্‌কা আমেজ মিশানো। সবই কৌতুককর ঠেকছিল জয়শীলার, এমনকি তার নতুন উৎসাহটা পর্যন্ত। তার পরিবারগত খবরটাও অবশ্য দিতে ভুলল না নির্বানীতোষ। বিধবা মা আর নাবালক ভাই—ছোট্ট সংসার, বাহুল্যবর্জিত, তিনজনের সংসারকে চারজনও করা যায়, কিন্তু কি দরকার, খাসা আছে নির্বানীতোষ।

নির্বানীতোষের স্মার্ট হবার চেষ্টাকে মনে মনে তারিফ করত জয়শীলা। ডাক্তার যখন নিজে রুগী হন—সাধারণ চোখে মজাই লাগে।

কতবার নির্জন মুহূর্তে নির্বানীতোষের আকৃতি চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। চোখ থেকে মনে দাগ কাটতে পারেনি। সব চেয়ে অসহ্য লাগত ওর স্বভাবের এই দীন-হীন লক্ষণটা।

সেদিন কলেজশেষে মেসে গিয়ে যখন শুনল দেবপ্রিয় এসেছে, তখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল জয়শীলা। কিন্তু, সেই সকালে এসেই দুপুরে খাওয়াদাওয়া সেরে কোথায় বেরিয়েছে সে। একটু অপেক্ষা করবে নাকি! না থাক, দেবপ্রিয় নিজেই আসবে দেখা করতে। এতক্ষণ হয়তো তাদের বাড়িতে গিয়েই বসে আছে। মামাবাবু আবার কিছু না বলেন তাকে।

চিন্তায় আর খুশিতে পরিপূর্ণ বাড়ি ফিরল জয়শীলা। সন্তর্পণে বইগুলো বুকের কাছে ঠেসে ধরে সিঁড়িতে উঠতে লাগল। মামার ঘর বন্ধ। মামা

ফেরেননি এখনো। তাহলে মাসিমার সঙ্গেই নিশ্চয় গল্প করছে দেবপ্রিয়। করছে বলা ভুল, কথা তো ছাই বলতে পারে, মুখ নিচু করে মাসিমার কথায় হুঁ হাঁ করে যাচ্ছে শুধু।

জুতো খুলে রেখে এক হাতে কাপড়টাকে আলগোছে তুলে ধরে চুপি পায়ে উঠল সে।

কিন্তু, কোথায় মাসিমা, কোথায় বা দেবপ্রিয়। বিকেলের ঝিমোনো রোদে নির্জন বাড়িটা ঢুলছে।

ঠাকুর জানাল ঃ 'মাসিমা এখনো ফেরেন নি।'

বইগুলো টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে হাত পা ছড়িয়ে বিছানায় এলিয়ে পড়ল সে। যাক নিশ্চিন্ত। দেবপ্রিয় এসেছে, এই মুহূর্তে দেখা না হোক, ও যে কলকাতায় এসে পড়েছে এতেই অনেক জোর পায় জয়শীলা।

ঘরে অন্ধকার নেমে এল। বাইরে আওয়াজ। জুতোর শব্দে বোঝা যায় মামাবাবু এলেন। মাসিমাও এসে পড়বেন এখুনি। আলো জ্বালতে ইচ্ছে করছে না। চায়ের তেষ্টা পেয়েছে। মাসিমা কখন আসবে। নিজে উঠে চা করতে ইচ্ছে করছে না। ঠাকুরকে বললে যে চা বানিয়ে দেবে, মুখে দেওয়া যাবে না।

কে ডাকছে? মামাবাবু! উঠতেই হল।

'কখন এসেছিস?' বিজয়কেতু জিগ্যেস করলেন।

'অনেকক্ষণ।'

'স্নেহ কোথায়? ফেরেনি এখনো?'

'না। কিছু চাই তোমার? চা খাবে?'

'চা। তুই করবি?'

'আহা! কোনোদিন যেন চা করে খাওয়াইনি তোমাকে!'

'আচ্ছা নিয়ে আয়। শরীরটা কেমন ক্লান্ত লাগছে।'

চিন্তিত গলায় বললে জয়শীলা ঃ 'সে কি! শরীর খারাপ হয়নি তো?··· কই, গা তো গরম নয়। খালি-খালি ভয় দেখাও তুমি!'

'ভয় পাস্ তাহলে···' হা হা করে হাসলেন বিজয়কেতু। হাসি থামিয়ে বললেন, 'তোরা আছিস বলেই তো এই বুড়ো কাঠামোতে নির্ভর করতে পারি। তুই আর স্নেহ—আমার দু হাত।'

চঞ্চল চরণে চা করতে গেল জয়শীলা। আজ তার মনের যা অবস্থা তাতে শুধু চা কেন, মামাবাবু যা চাইবেন তাই দিতে পারে সে।

একতারার একটি সুরের মতোই তার হৃদয়ে একটি কথাই উচ্চারিত হচ্ছেঃ দেবপ্রিয় এসেছে—দেবপ্রিয় এসেছে। কিন্তু, দেবপ্রিয় এখনো ছুটে আসছে না কেন তার কাছে, কেন সে এত আবেগহীন, নিরুত্তাপ! এতদিনের অদর্শনের পরেও কি করে সে আজ এত দেরি করতে পারে! আজ বকবে, ভীষণ বকবে ওকে। বলবেঃ তুমি একেবারে অপদার্থ, ভীষণ, ভীষণ বাজে। এই তোমার আসার সময় হল। নাকি দর বাড়ানো হচ্ছে! আহা, বাজারে ফেললে তোমার চেয়ে আমার দরই বেশি হবে। জানো মামা আমার কেরিয়ার তৈরির সমস্ত কিছু ছক করে রেখেছেন। আমি ইংলণ্ড যাব, বড়, অনেক বড় হব আমি।...

মামাকে চা বানিয়ে দিয়ে ঘরে ফিরে এসে এবার সত্যিই অধৈর্য হয়ে পড়ল সে। প্রায় সাড়ে সাতটা বাজে। তবে কি নিজেই যাবে ওর মেসে, এতক্ষণ কি সে ফিরে এসেছে। আর কাজ সারা হলে এখানে না-এসে মেসেই বা ফিরবে কেন দেবপ্রিয়। এদিকে সে বেরিয়ে যাবে, আবার কোন্ পথে বাড়িতে এসে বসে থাকবে। হয়তো মামাবাবু এমন কিছু বলতে পারেন, আর যা শাদাসিধে গোবেচারা ঘাড় হেঁট করেই হয়তো বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে। তারচেয়ে আর-একটু অপেক্ষা করেই দেখা যাক।

আটটা বাজল, সাড়ে আটটা। টুকিটাকি স্টেশনারি কিনে ফিরলেন স্নেহলতা, এল না দেবপ্রিয়।

এবার অভিমানটা ধূমায়িত হয়ে রাগের আকার ধারণ করল। এতক্ষণে এসে পড়লেও হয়তো ক্ষমা করত ওকে, কিন্তু যত সময় কাটতে লাগল দেবপ্রিয়কে ততই ক্ষমার অযোগ্য মনে হল।

স্নেহলতা ঘরে ঢুকে জিগ্যেস করলেনঃ 'কি রে, অমন করে' বসে আছিস কেন?'

'কেন আবার? অমনি।' ঝাঁঝের সঙ্গে উত্তর করল জয়শীলা।

'মেজাজ সুবিধের নয় মনে হচ্ছে।' স্নেহলতা হাসলেন। 'খিদে পেয়েছে খুব।'

'জানি না—' বিছানায় চিত হয়ে পড়ল জয়শীলা।

'এই অবেলায় শুলি যে। যা চারদিকে ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছে, দেখিস অসুখ-বিসুখ বাধিয়ে বসিস নে।'

স্নেহলতা খাবারের জোগাড় করতে চলে গেলেন।

কতক্ষণ ওইভাবে পড়েছিল জয়শীলা, খেয়াল নেই। রাতের ঘড়িতে ঢং ঢং করে' দশটা বাজতেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসল সে। অনেক অপেক্ষা জমে-

জমে এবার পাথরের মতো শক্ত কঠিন। রাগ নয়, রাগাতীত একটা অনুভূতি, কান্না নয়, কান্নার আগের অবস্থা। এতদিন পরে, এত কাছে এসেও যে দেবপ্রিয় এখনো দেখা করল না এই অবিশ্বাস্য ঘটনাটাই তাকে ভোঁতা, অনুভূতিহীন করে তুলল।

সকাল হতে চা খেল-কি-না-খেল কোনোরকমে শাড়ি-জামা বদলে চটি পায়ে ফটফট করে' বেরিয়ে পড়ল সে।

হেদো থেকে বিবেকানন্দ রোড পর্যন্ত যেন পবন বেগে উড়ে এল সে। মেসের সিঁড়িগুলো কয়েক লাফে পার হল।

দেবপ্রিয়ের ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। জোর-ঠেলায় খুলে ফেলল দরজাটা।

দেবপ্রিয়কে ঘরে পাওয়া গেল না। তারিখ না-পালটানো ক্যালেণ্ডারের পাতাগুলো থরথর করে' হাওয়াতে দুলতে লাগল। বিছানার শিয়রে ছোট্ট টেবিলটায় বাসি চায়ের কাপ, প্লেটে আধখানা দগ্ধ সিগারেটের ভস্মাবশেষ।

ধপ্ করে' বসে পড়ল জয়শীলা ময়লা তক্তপোশটার ওপর।

আজ যত দেরি করুক দেবপ্রিয়, ওর স্পর্ধার শেষ সীমা পর্যন্ত দেখবে সে। দেখবে কত দরের লোক সে হয়েছে। নাকের পাতা রুদ্ধ আবেগে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল জয়শীলার।

জানালার বাইরে একটা নিমগাছ। কয়েকটা কাক ভীষণ দাংগা শুরু করেছে। বিরক্তিকর। ওদের কর্কশ চিৎকার যেন কানে গরম শিষে ঢেলে দিচ্ছে। পায়ের পর পা তুলে বসল জয়শীলা তক্তপোশের গায়ে কনুই রেখে, তারপর আবার পা দুটো শ্লথ করে' কাত হয়ে বসল। বিশ্বভারতী পত্রিকাটা পড়েছিল বালিশের কাছে, হাতের নাগালে কোনো কাজ না-পেয়ে ওটারই পাতা ওল্টাতে লাগল, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, বিজ্ঞাপনগুলোও বাদ দিল না। পত্রিকার সব কটা পাতাই শেষ হল, আবার গোড়া থেকে, এখানে-ওখানে, গগনেন্দ্রর ছবি, রবীন্দ্রনাথের হস্তলিপি, বিধুশেখর শাস্ত্রীর গুরু-অর্ঘ্য।

মেসের চাকরটা কাপ-ডিস নিতে ঢুকেছিল ঘরে। ফিরে যেতে-যেতে বললে, 'আপনার চা আনব?'

'না। দেবপ্রিয়বাবু কোথায় গেছেন?'

'বাবু বোধহয় ম্যানেজারবাবুর ঘরে। বসুন ডেকে দিচ্ছি।'

মিনিট কাটল। কয়েকটা মিনিট।

বারান্দায় পদশব্দ।

হ্যাঁ দেবপ্রিয়ই। হাতে ডাইংক্লিনিং-এর ধোয়া জামা-কাপড়। পরণে লুঙ্গি।

কিন্তু তাকে দেখে অমন অবাক হয়ে গেল কেন দেবপ্রিয়। এই এক-মাসেই কি ছিরি হয়েছে ওর চেহারার। কেমন ভীতু-ভীতু, আর আগের চেয়ে ময়লাও দেখাচ্ছে ওকে।

কিন্তু, জয়শীলাকে অপ্রত্যাশিত দেখে ওর চোখের তারা দুটো ঝিকিয়ে উঠল না কেন। এমন নিরাবেগ, নিরুত্তাপ হওয়ার কি অর্থ থাকতে পারে।

'তুমি।' অনেকক্ষণ পর যেন স্বভাবস্থ হল দেবপ্রিয়। টেবিলের ওপর জামা-কাপড়গুলো রেখে এগিয়ে এল। 'চা খাবে?'

'থাক। খাতির করতে হবে না।'

বিস্ময়-ভরা চোখে মানুষটার হাব-ভাব লক্ষ্য করছিল জয়শীলা। আর কোথায় একটা বেসুরো লাগছিল। ওর বাবার অসুখটা কি খুব বাড়াবাড়ি, সংসারের দায়-ঝামেলা কি ওর ঘাড়ে এসে পড়েছে। তাই কি এমন নির্বিকার আর নিস্পৃহ দেখাচ্ছে তাকে!

কিন্তু, জীবনে দুঃখ আছে, কষ্ট আছে, স্বীকার করি। কিন্তু আশা-আশ্বাস বলেও কি কিছু নেই। তবে জয়শীলা কি জন্যে আছে? এমন স্বার্থপর মানুষ জীবনে সে দেখেনি। আর তক্তপোশের এক কোণে কেমন কুঁজো হয়ে বসেছে হাখোনা। মাগো, পুরুষমানুষ ভাবতেও ঘেন্না করে। সমস্ত দুশ্চিন্তার আকাশ যেন তার মাথায় ভেঙে পড়েছে, আর মূক ভাবনা দিয়েই যেন বিশ্ব জয় করবে মানুষটা!

ঠোঁট কামড়ে অনেকক্ষণ ওর মুখের দিকে চেয়ে বসে রইল জয়শীলা। তারপর এক সময় মুখ খুলল। শান্ত গলায় জিগ্যেস করল: 'বাবা কেমন আছেন?'

'ভালো।' বললে দেবপ্রিয়।

'অসুখটা খুব বাড়াবাড়ি হয়েছিল?'

'এ্যাঁ!' যেন শুনতে পায়নি দেবপ্রিয়। হাসল একটুখানি। 'না। ভালোই আছেন?'

ভালোই আছেন! মনে মনে মুখ ভ্যাঙচাল জয়শীলা। ওইখানেই যেন কথা শেষ, আর যেন কিছু বলার নেই, জানবার নেই। এত মেপেজোঁকে জরীপ করে' কথা বলবার কি মানে হয়। নাকি, কলেজের সেক্রেটারির সামনে ইণ্টারভিউ দিচ্ছে সে।

'আমার কলেজের দেরি হচ্ছে। বেশি সময় নেই।' জয়শীলা বিরক্তির সঙ্গে বললে, 'বিকেলে কোথায় দেখা হচ্ছে?'

দেবপ্রিয় আবার কি ভাবছিল। একটু থেমে বললে, 'দেখা হবে—'

'হবে তো বুঝলাম। কোথায়? ওয়াই. এম. সিএ-র সামনে অপেক্ষা করব। পাঁচটায়?'

'আচ্ছা।'

শুধু আচ্ছা! অনেক কথা মনে আসছিল জয়শীলার, মুখেও। কিন্তু দেবপ্রিয়ের পাথর-পাথর ভাব তার ইচ্ছাগুলোকে বরফের মতো জমাট করে' দিচ্ছে। বলত: তাদের আসন্ন বিয়ের কথা, মামাবাবুর বিরুদ্ধতা। সেই বিরুদ্ধতার পাঁচিল ডিঙিয়ে কেমন অনিবার্যের মতো বেরিয়ে আসত সে। দ্বৈত জীবন, আনন্দ, উত্তেজনা, শ্রান্তিহীন, ক্লান্তিহীন। আরো বলত কৌতুকের মশলা দিয়ে ছোকরা ডাক্তার নির্বানীতোষের নতুন উৎসাহের কথা! কিন্তু, দেবপ্রিয়ের বিকারহীন ব্যবহার সমস্ত পরিস্থিতি অস্বস্তিকর করে তুলেছে। আবেগের মুখে পাথর চাপা দিয়ে প্রাণের আকুতিকে বন্ধ করতে চায় দেবপ্রিয়।

বিকেলে ওয়াই. এম. সি-এর সামনে পৌঁছোতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল জয়শীলার। ট্রাম থেকে যখন নামল পাঁচটা বেজে বিশ। দেরি করার যে কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ ছিল, এমন নয়। কলেজ থেকে ফিরে বাড়িতে শুয়ে বসে আবোলতাবোল চিন্তা করতে করতে সময়কে ইচ্ছে করেই বয়ে যেতে দিয়েছিল।

আর একটা কারণ ছিল দেবপ্রিয়কে পরীক্ষা করা! অতীতে কতদিন এইভাবে তারা নিজের-নিজের প্রেমের গভীরতা প্রমাণ করত। নির্দিষ্ট সময়ে হাজির হওয়া নয়, কে কতক্ষণ কার জন্যে ঠায় অপেক্ষা করতে পারে তারই ওপর আসল পরীক্ষা!

রাস্তাটা পার হয়ে দাঁড়াল জয়শীলা।

কিন্তু, দেবপ্রিয় কোথায়? চোখ দুটো আঁতিপাতি খুঁজতে লাগল। ভিড়। ট্রামে-বাসে, ফুটপাথে, রাজপথে। ফেরিওলা হাঁকছে, সু-সাইন প্লীজ, প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিঙের গায়ে পুরানো বইএর দোকান। কিন্তু, দেবপ্রিয় কোথায়?

আরে, ওই তো ওপারের স্ট্যাচুটার সামনে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে গল্প করে যাচ্ছে। কী আশ্চর্য, সে যে এসে পড়েছে, তাও কি দেখতে পায়নি দেবপ্রিয়।

এদিকেও কী একবার ফিরবে না সে, ফিরলেই তো চোখ পড়ত। কী এমন কথা, কী এমন জরুরি ব্যাপার যে জয়শীলার এ্যাপয়েণ্টমেণ্টকে উপেক্ষা করে অন্য ব্যাপার নিয়ে মশগুল আছে সে।

সময় কাটছে।

সন্ধ্যা নামছে কলকাতার আকাশে। এলোমেলো হাওয়া।

মিনিট দশেক আরো ঘুরে গেলে ঘড়ির কাঁটা।

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ঠোঁট কামড়াতে লাগল জয়শীলা। একবার ভাবল : পার হয়ে গিয়ে ডেকে আনি ওকে। কিন্তু, না। দাঁড়িয়ে অপেক্ষাই করবে, দেখি কতক্ষণে ওর সম্বিত ফেরে।

এবং ফিরলও একসময়। কিন্তু যতখানি ক্ষিপ্রতা আশা করা উচিত ছিল ওর স্বভাবে-চরিত্রে, তারচেয়ে অনেক ধীর পায়ে রাস্তা পার হয়ে এল দেবপ্রিয়।

বললে, 'কতক্ষণ এসেছ?'

জয়শীলা এক মিনিট চুপ থেকে বললে, 'তাড়াতাড়িই এসে পড়েছি, তাই না?'

দেবপ্রিয় চোখ নিচু করে বললে, 'সে কথা বলছিনে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম কিনা, তাই…'

'তাই বুঝি অপেক্ষা করতে করতে অপেক্ষার আসল কারণটাই হারিয়ে ফেলেছিলে?'

'রাগ করছ?'

'করব না?' জয়শীলা নাকের পাতা ফোলালো : 'আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে একটা বাজে লোকের সঙ্গে…'

'উনি আমার মামা।'

'মামা! কই কোনোদিন শুনিনি তো!'

'শোনবার মতো কোনো পরিচয় নেই ওঁর। ব্রিটিশ আমলে রাজনীতি করে সারা যৌবন ডেটিনিউ ছিলেন। এখন হয়েছেন খাদি ভাণ্ডারের সেল্‌সম্যান…'

অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। আলোচনার মোড় ঘোরাবার জন্যে নিজে থেকেই ঘুরতে হল জয়শীলাকে। 'চলো—ওয়াই. এম. সি-এ তে যাই—'

পর্দা ঠেলে ক্যাবিনে ঢুকল দুজনে।

ক্যাবিনের আড়ালে আবেগগুলো অনেক সহজ, মোলায়েম হয়ে আসে। অন্য দিনের মতো মুখোমুখি। দেবপ্রিয়ের চোখ মেনুকার্ডের ওপর।

টেবিলের কাপড়টা টান-টান করতে করতে জয়শীলাই গৃহিণীপনা করল : 'কি খাবে ?'

'চা—'

'শুধু চা ? ওমলেট খাও—'

'আচ্ছা।'

বেয়ারা অর্ডার নিয়ে চলে গেল।

মাথার ওপরে উদ্দাম পাখা ঘুরছে। দেবপ্রিয়ের দু' একটা চুল হাওয়ায় দস্যিপনা শুরু করেছে। কিন্তু, ওর মনের আবেগের একটি পাতাও কী নড়বে না !

'আচ্ছা—কী হয়েছে তোমার বলো তো ?'

'কী হবে ? কিছু না—'

'এবার দেশ থেকে ফিরে এসে কেমন-কেমন হয়ে গেছ তুমি ! এদিকে তোমার ওপরেই তো আমার ভরসা...'

দেবপ্রিয় চুপ।

'বাড়িতে বলেছ ?'

'কী ?'

'বারে মানুষটা ! তোমার কথা শুনলে মরা মানুষ পর্যন্ত কবর থেকে উঠে আসে। শোনো—আমাদের বাড়িতে মাসিমার মত আছে, মামাবাবু অবশ্য আপত্তি তুলেছেন। তবে বিয়ের পরে মামাবাবু আর রেগে থাকতে পারবেন না বলে মনে হয় ...' হাসল জয়শীলা।

দেবপ্রিয় চুপ।

'আরে, বোবা হয়ে রইলে কেন ? কথা খরচ করতে কি পয়সা লাগে ?'

'না...' হাসতে চেষ্টা করল দেবপ্রিয়, মুখটা কালো হয়ে উঠল।

'কি বললে তোমার বাড়িতে ?'

'কথা হয়নি।'

'হয়নি—' আশ্চর্য হল জয়শীলা : 'না বলোনি।'

'একই ব্যাপার। বললে কিছু হত না।'

'হত না ! মানে ?'

দেবপ্রিয় চুপ।

'কী মাথামুণ্ডু বকছ ? কী হয়েছে তোমার ?'

দেবপ্রিয় তবু চুপ।

জয়শীলা জ্বলে উঠল : 'তুমি কী বলতে চাও তোমার বাড়ির মতামতের জন্যে আমাকে অনন্তকাল বসে থাকতে হবে!'

'আমি তা বলি নে।'

'তবে, তবে কী বলতে চাও?' জয়শীলার স্বর আবেগ-উত্তপ্ত।

'অনন্তকাল মানুষ কোনো কিছুর জন্যেই বসে থাকতে পারে না।'

'তবে?'

'এরপর তবে নেই।'

'আছে। সে তবে আমার হাতে আছে।'

দেবপ্রিয় চুপ করে চায়ের পেয়ালা নাড়তে লাগল।

জয়শীলা আবার বললে, 'তুমি বাড়ির মতের বিরুদ্ধে যেতে পারবে না?'

'না।' দেবপ্রিয় মাথা নাড়ল।

'না!' আরো আশ্চর্য হল জয়শীলা।

'ভেবেছিলাম পারব, কিন্তু পারা যায় না।'

'পারা যায় না!' তীক্ষ্ণ স্বর জয়শীলার : 'আমার সঙ্গে যেদিন আলাপ হয়েছিল সেদিন তার পরিণতি ভাবোনি? সেদিন কি বাড়ির মত নিয়েছিলে?'

দেবপ্রিয় চুপ।

'তোমাকে আমি পুরুষ ভাবতাম। কিন্তু এখন দেখছি পুরুষের পোশাকে তুমি একটি কাপুরুষ মেয়ে ছাড়া কিছু নও।'

'হয়তো তোমার কথাই ঠিক।'

'ঠিক! বলতে লজ্জা করল না!'

'না আমার আর লজ্জা নেই। শোনো জয়শীলা—সত্যিই আমি আর এ-লজ্জা নিয়ে বেরুতে পারছি নে।'

'কী, কী বলতে চাও তুমি? তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? এই—এই দেবপ্রিয়?'

'শোনো জয়শীলা : আমার বাবার কোনো অসুখ করেনি। আমাকে বালুরঘাটে নিয়ে যাবার জন্যে মিথ্যা টেলিগ্রাম করেছিলেন তিনি…'

'তুমি, তুমি কী বলছ…'

'সত্যি, সব সত্যি। আমার বোন সুশীলার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছিল, আমাদেরই পাল্‌টা ঘর, আমরা গরিব জেনে শুধু হাতেই মেয়ে নিতে রাজি ছিলেন তাঁরা, কিন্তু একটি শর্তে…'

'দেবপ্রিয়, কী বলছ, কী বলতে চাচ্ছ তুমি?' জয়শীলার কণ্ঠে আর্তনাদ।

'আমাকে বলতে দাও জয়শীলা...' আবেগে থরথর করে কাঁপছে দেবপ্রিয়ের স্বর: 'ওদের একটি মাত্র শর্ত ছিল, বিয়ের যোগ্য এক মেয়ে...'

'দেবপ্রিয় তুমি কী বলছ, আমি যে কিছু বুঝতে পারছিনে। তুমি...তুমি...'

'হ্যাঁ: অমি সেই মেয়েকে বিয়ে করেছি।'

ভয়ার্ত বেদনায় চিৎকার করতে গিয়ে স্তম্ভিত পাংশু হয়ে গেল জয়শীলা। তার চোখের সামনে ক্যাবিনটা দুলছে, হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন স্তব্ধ, এক লহমায় সমস্ত আলো নিবে গিয়ে পুরু অন্ধকারের এক পর্দা দুলতে লাগল চোখের সামনে। ভয়ংকর এক নিরবয়ব শূন্যতা, ধুসর, বিবর্ণ। তেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছে, গলার ভেতরটা শুকনো কাগজের মতো খশখশে, আর দেহটা অনেক হাল্‌কা হয়ে-হয়ে বিন্দুর মতো মিলিয়ে যাচ্ছে। (আমি কি বেঁচে আছি, তবে আমি কথা কইতে পারছি নে কেন! মাসিমণি, আমায় একটু ধরো, আমি যে তলিয়ে যাচ্ছি। আমার কষ্ট হচ্ছে, আমার শবাধারের ফুলগুলো জমে-জমে পাথর, আমি নিশ্বাস নিতে পারছিনে। আলো, আলো কই, অন্ধকারকে মাড়িয়ে কারা ছুটে আসছে, কার মুখ, মামাবাবু, মামাবাবু তুমি অতো হাসছ কেন! নির্বানীতোষ, কী বলছ তুমি? না-না চলে যাও, তোমরা সবাই চলে যাও, মাসিমণি আমার দেহকে তুলে আনো খোলা ছাদে, আমি আকাশ দেখব, তারা দেখব, সবাই চলে গেলে আমি একা চোখ মেলে থাকব, আমার চোখে রাত্রির আকাশ তারা হয়ে ধরা পড়বে, আমার মণিদুটো তারাদের মতোই ঝিকমিক করবে। মাসিমণি, আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, আকাশ থেকে কবে বৃষ্টি নামবে, মাসিমণি, তুমি চলে যেওনা, আমাকে ধরো...কে? কে কথা বলছ? দেবপ্রিয়? তুমি মরে গেছ, মরা মানুষ আবার কথা কয় নাকি! তোমার গায়ে মরা মানুষের গন্ধ, তুমি সরে যাও, সরে যাও আমার সামনে থেকে, কে, মামাবাবু কি বলছ, নির্বানীতোষ অতো হাসছ কেন, মাসিমা আমি কি হাস্যকর হয়ে পড়েছি, আমার চোখের কাজল, কপালের খয়েরী টিপ কি লেপে পুঁছে গেছে, আমি কি সত্যিই কুৎসিত হয়ে পড়েছি, মাসিমা, আমার গলা যে পুড়ে যাচ্ছে, আমায় একটু জল দাও—)

'জয়শীলা—জয়শীলা—'

(কে? কে তুমি? অমন করে আমায় নাম ধরে ডেকো না।)

'শীলা—জয়শীলা...'

ঘোলাটে চোখ দুটো দেবপ্রিয়ের দিকে এক পলক নিবদ্ধ রেখে আর দাঁড়াল না সে, ভারি পায়ে ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে গেল।

মহিষের পিঠের মতো জমাট কালো রাত্রি। থমথমে, নিঃসাড়।

অন্ধকার ঘরে খাটের ওপর দুজনে মৌন।

কবরের নিঃশব্দতা।

সারাটা পথ কি করে যে ফিরল জয়শীলা, বলতে পারে না। বাড়িতে ফিরে আর দাঁড়ায়নি কোথাও, অসাড় বোধহীন দেহটাকে জড়পদার্থের মতো ছুঁড়ে দিয়েছে বিছানায়, প্রাণপণে বালিশের আড়ালে মাথাটা গুঁজে উটপাখির মতো রূঢ় বাস্তবকে অস্বীকার করতে চেয়েছে। রাত গড়িয়েছে, অনেক—অনেক রাত। মামাবাবু দু' একবার খোঁজ করেছেন, মাসিমা কয়েকবার তাগিদ করে গেছেন। ওঠেনি জয়শীলা, শরীর ভালো নেই, আজ কিছু খাবে না সে। এর পর কেউ আর ঘাঁটায়নি তাকে। রাত আরো ঘন হয়েছে, রাতের সব কাজ সেরে কিছুক্ষণ ইস্কুলের খাতা নিয়ে বসেছেন মাসিমা।

ঘুম নেই চোখে জয়শীলার। কোনো জ্বালা নেই, অস্থিরতা নয়, শোক নয়, বিরহ নয়। তার অতীত, কেমন নিঃসাড়, নির্বেদ অবস্থা। ডাক্তার এসে তার গায়ে যদি এখন ইনজেকসনের ছুঁচ ফুটিয়ে যায়, একটুও টের পাবে না সে।

কখন মাসিমা উঠে এসেছেন তার বিছানার কাছে, বসলেন, জুতোর স্ট্র্যাপ্ খুলে পা থেকে আলগা করে দিলেন, মাথায় হাত বুলোলেন, গায়ের ওপর চাদরটা দিলেন টেনে।

বললেন, 'দেবপ্রিয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

জয়শীলা বালিশে মুখ গুঁজেই উত্তর দিল: 'দেবপ্রিয় দেশ থেকে বিয়ে করে ফিরেছে—'

স্নেহলতার হৃদ্‌পিণ্ডটা ঝাঁকুনি খেয়ে দুলে উঠল যেন। মেরুদণ্ড দিয়ে কেমন একটা শীত-শীত হিম-প্রবাহ।

আর, কবরের নিঃশব্দতায় ছেয়ে গেল সারা ঘরটা।

খাটের গায়ে পাথরের মতো জয়শীলার শক্ত দেহ। স্নেহলতা অকম্প, স্থাণু।

স্নেহলতার মস্তিষ্ক কলরব করে উঠছে: বীরেশ্বর! অন্ধকারে ও কার ছায়া! আবার কি বীরেশ্বর এসেছে! ওয়েলটেম্নারের সেই স্মৃতির-মালা-গাঁথা

দিনগুলি। পাহাড় আর সমুদ্র। জেটিতে কত জাহাজ এল, গেল। বীরেশ্বর সমস্ত সত্তা দিয়ে সমুদ্রের মতো ঘিরে রেখেছিল তাকে। একঘেয়ে সমুদ্রও একদিন বিস্ময় হারিয়েছিল, কিন্তু বীরেশ্বর ছিল অজস্র বিস্ময়ের রামধনু। কিন্তু ···মেঘলা-আকাশ চিরে প্রখর সূর্যালোকে সেই রামধনু-বিস্ময়ও যে একদিন উবে যাবে, কে জানত।

মনে পড়ে···সেদিন কী এক তদন্তে বহুদূরেই জীপ্ নিয়ে বেরিয়েছিল বীরেশ্বর ভোর-ভোর থাকতেই। সকালে চা খেয়ে এটা সেটা করেও হাতে ছিল অনেক অবসর। বেতের চেয়ারটা বারান্দায় টেনে এনে দূরের পাহাড়ের গায়ে গির্জের চুড়োটার দিকেই বুঝি চেয়েছিল সে। হাতে কোনো বই ছিল কিনা, আজ মনে নেই।

বাড়ির সামনে রাস্তায় ঝটকার শব্দ। গাড়িটা থামল গেটের সামনেই। গাড়ি থেকে নামলেন প্রৌঢ় ভদ্রলোক, পেছনে ঘোমটা টানা মহিলা। ওরা দেরি করেননি গেট ঠেলে বারান্দার দিকে এগিয়ে আসতে।

বিস্ময়-ঘন চোখে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন স্নেহলতা।

'কাকে চাই ?'

'এটাই বীরেশ্বরের বাসা তো ?'

'হ্যাঁ—' আরো বিস্মিত হয়েছিলেন স্নেহলতা।

ভদ্রলোক উঠে এসেছিলেন বারান্দায়, বেতের চেয়ারটা টেনে বসেও ছিলেন ঘন হয়ে। মহিলাটি বারান্দায় দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিল স্নেহলতাকেই।

ভদ্রলোক বললেন, 'আমি বীরেশ্বরের বাবা। রাঁচি থেকে আসছি। তা তোমাকে তো চিনতে পারলাম না, মা ?'

স্নেহলতা কাছে গিয়ে প্রণাম করতে গিয়েছিলেন, পা সরিয়ে নিলেন তিনি। মুখে বললেন, 'থাক থাক।'

কেমন সন্দেহের চোখে তিনি তাকাচ্ছিলেন স্নেহলতার দিকে, অত্যন্ত ধারালো দৃষ্টিতে। আর, তাঁর দৃষ্টির সামনে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিলেন স্নেহলতা। নাকি, তাঁদের বিয়ের খবর এখনো পৌঁছোয়নি বীরেশ্বরের বাবার কাছে, তাই কি ক্রুদ্ধ হয়েছেন তিনি।

'তোমার পরিচয়টা তো দিলেনা মা ?'

'আমি—আপনার পুত্রবধূ।' ধীর গলায় জানালেন স্নেহলতা।

'হোয়াট! কী বললে ? তবে ওর সম্বন্ধে যে খবর পেয়েছিলাম, তাই। রাসকেলটা আবার বিয়ে করেছে!'

থরথর করে পায়ের তলায় মেজেটা নড়ে উঠল। দূরের পাহাড়টা যেন কাঁপতে কাঁপতে সমুদ্রের তলায় গিয়ে লুকোলো। হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গেল। একটা নিশ্চিত পতনের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে চেয়ারের পিঠটা সজোরে আঁকড়ে ধরলেন স্নেহলতা।

'আপনি, আপনি কী বলছেন ...'

'ঠিকই বলছি, মা। আমার পুত্রবধূ আমার সঙ্গেই এসেছেন।'

'এখন, এখন আমি কী করব মাসিমা ?'

স্নেহলতা নিথর, নিস্তব্ধ।

'কাল থেকে আমি মুখ দেখাব কি করে ? এই অপমান, এই লজ্জা... আমি যে অনেক নির্ভর করেছিলাম ওর ওপর।'

রাত্রির কালো ধমনীতে রক্ত জমছে ফোঁটায়-ফোঁটায়।

দূরের ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজল।

অন্ধকার ঘরটার মধ্যে আরো অন্ধকার, আরো নিঃশব্দতা।

খাটের গায়ে জয়শীলার শক্ত কঠিন দেহ। এত কঠিন যে ছুঁতে ভয় করে স্নেহলতার। তাঁর স্পর্শে কলুষতা, চোখের দৃষ্টিতে শনি, তাঁর নিশ্বাসে নিদারুণ বিষ। সান্ত্বনার কোন্ বাণী শোনাবেন জয়শীলাকে।

'মাসিমা—ও মাসিমা—কথা বলছ না কেন ?'

'একটু ঘুমোতে চেষ্টা কর—'

'ঘুম আসছে না মাসিমা—' (আমি কি করে ঘুমোব মাসিমণি, আমার চোখ জ্বালা করছে, ছটফট করছে আমার দেহটা, দেবপ্রিয় কেন এমন করল ? সেকি আমাকে ভালোবাসেনি ? আমি যে তাকে সব দিয়ে ভালোবেসেছিলাম, আজ আমি কি করে ফিরব, ফেরা যে যায়না, আমাকে, আমার ভালো-বাসাকে দলেমলে চলে গেছে সে। আমার চেয়ে বড় হল ওর সংসার, ওর পৃথিবী ! ওর জন্যে যে আমি সব ছাড়তে উদ্যত হয়েছিলাম, আমি যে নিজের জন্যে কিছুই রাখিনি, সব দিয়েছিলাম সব পাব বলে। দেবপ্রিয় কি কিছুই দেয়নি আমাকে, নিজেকে সন্তর্পণে বাঁচিয়ে রেখেই শুধু আমার হৃদয় নিয়ে খেলা করে গেল সে। দেবপ্রিয়, তুমি আমাকে হারাবে, ভেবেছ তুমি না হলে আমার জীবন মরুভূমি হয়ে যাবে ! আমি দেখাব, দেখাব তোমাকে, তোমাকে বাদ দিয়েও আমি জীবনে দাঁড়াতে পারি, সুখী হবার পথগুলি আমি জানি।...)

'ঘুমোবার চেষ্টা কর শীলা—'

'ঘুমোব—ঘুমোব মাসিমা।' (আমাকে একটু ভেবে নিতে দাও, বর্তমানকে গভীর ভাবে যাচাই করতে দাও, ভবিষ্যতের পাথেয় যেন জোগাড় করতে পারি বর্তমানের ভুলগুলিকে মূলধন করে। দেবপ্রিয় একদিন বলেছিল ঃ আমাকে চেনায় তোমার ভুল হয়নি তো। সেদিন বড় গলা করে অহংকার জানাতে পেরেছিলাম, বলেছিলাম ঃ যদি ভুল হয়, সেদিন ভুলকে ভুল বলে স্বীকার করে নিতে দ্বিধা করব না। সে ভবিষ্যদ্বাণী যে এত শীঘ্র জীবন দিয়ে পরখ করতে হবে, ভাবিনি।···দেবপ্রিয়, আমি হার স্বীকার করব না, যদি বেঁচে থাকি, থাকব জানি, পৃথিবী গোল, ঘুরতে-ঘুরতে একদিন-না-একদিন দেখা হবে। সেদিন, আমি জানি, তুমি ঘাড় সোজা করে আমাকে চিনতে পারবে না, আমি তাকাব তোমার দিকে স্পষ্ট, ঋজু। সে-চোখে শরতের মেঘের ছায়া থাকবে না, গ্রীষ্মের আকাশের মতো দীপ্ত, প্রখর। সেদিন···সেদিন—)

স্নেহলতা মৃৎপিণ্ডবৎ স্থির, নিথর। কে? বীরেশ্বর? কি চাও, কী চাও তুমি! সমুদ্রের জল নোনা, আর পাহাড়—গুটিকয়েক মরা পাথর ছাড়া কিছু নয়। ডলফিনস্ নোজের মরা পাথরের ওপর আলফোঁস সাহেবের পরিত্যক্ত করব।···বীরেশ্বর, আজ আমি অতন্দ্র—আমাকে তোমার নরম হাতে ঘুম পাড়াতে পারবে না। আমি জেগে আছি, জেগে আছি বলেই আমি কঠোর কঠিন। তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম, বিশ্বাস না করে সেদিন উপায় ছিল না আমার। তুমি যেভাবে উদ্দাম ঝড়ের মতো হু-হু করে আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলে, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বই জাগেনি। কিন্তু, কে জানত একটা প্রচণ্ড মিথ্যা তোমাকে বেষ্টন করে রেখেছে। কেন বলোনি, তুমি বিবাহিত। তোমার প্রবাসী নিঃসঙ্গতাকে ভরে রাখবার জন্যে তুমি আমাকে লীলাসঙ্গিনী করেছিলে! ডকে কাজ করতে করতে তোমার মনটাও বোধহয় নাবিকের মতো উদ্দাম হয়ে পড়েছিল।···আমি তোমার স্বরূপ দেখে তিষ্ঠোতে পারিনি। সেদিন তোমার স্ত্রীকে দেখলাম, দেখলাম তোমার বাবাকে। আর কী যোগাযোগ, তুমি সেই সময়ে বাসায় নেই। বিস্ময়ের কুয়াশা কাটতে যেটুকু সময় লেগেছিল! তারপর নিজেকে গুটিয়ে নিতে, গুছিয়ে নিতে আর দেরি হয়নি। অপেক্ষারত ঝটকাতেই আমার মালপত্তর তুলে দিলাম। তোমার বাবা সঙ্গে আসতে চেয়েছিলেন কিনা, আজ মনে নেই। স্টেশনে তখন ট্রেনের টাইম কিনা তাও জানি না। ওয়েলটেয়ার স্টেশনের উদ্দেশে

গাড়ি ছুটে চলল। পিছনে সরল সমুদ্র, পাহাড়, বীচ্‌রোড, মেনরোডে পড়লাম। সরে-সরে গেল আমার অতীত, আমার ভালোবাসা।···

ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল জয়শীলা।

স্বপ্ন দেখল: অনেক—অনেক বড় হয়ে গেছে সে। তার শরীরটা দৈর্ঘে-প্রস্থে যেন আকাশ ছুঁয়েছে, সেখান থেকে পাইন গাছের মাথা দেখতে পাচ্ছে, সূর্যের রশ্মি তীক্ষ্ণ বর্ষার মতো বিদ্ধ করছে পাইনের মাথা; আর সেই উর্ধ্বলোকে শরীরে কোনো অবসাদ নেই, গ্লানি নেই। দীর্ঘকাল পীড়া ভোগের পর যেন সম্পূর্ণ সুস্থ অন্য মানুষ হয়ে নতুন করে জন্ম নিল জয়শীলা।

সময় মতো চা খেল, স্নান করল, খেয়ে-দেয়ে কলেজে বই নিয়ে বেরিয়ে গেল। গোল গোল বিকারহীন লতিকাদির মুখ—ফিলসফি পড়ালেন। দামোদর-বাবুর জুলিয়াস সীজার। অফ-পিরিয়ডে টেবিল-টেনিস নিয়ে কয়েক হাত খেলা। আসন্ন পরীক্ষার প্রস্তুতি।

দিন কাটল।

আকাশটা দুপুর থেকে মুখ ভার করেছিল।

ট্র্যাম থেকে নেমে কয়েক পা এগিয়েছে জয়শীলা, তড়বড় করে বৃষ্টি বড় বড় ফোঁটায়, প্রথমে ছড়ানো ছিটনো, তারপর বিন্দুমাত্র সময় না দিয়ে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল—ঝমঝম।

ধারে-কাছে একটা রিকশা নয়, না ট্যাক্সি।

দ্রুত পায়ে ফুটপাথ পেরিয়ে দোকানের ভেতরে উঠে পড়ল সে। আর দোকানের ভেতর থেকে কার গলার আওয়াজে চমকে তাকাল জয়শীলা।

নির্বানীতোষ! নির্বানীতোষেরই চেম্বার এটা, কে জানত।

জার্নালটা চোখ থেকে নামিয়ে তাকেই ডাকছিল সে।

'বৃষ্টিটা বেজায় বেরসিক। বসুন।'

'না। বসব না।'

'আরে, বসুন বসুন। আপনি তো আমার পেসেণ্ট নন, ভয় কেন।'

হাসল জয়শীলা।

'একেবারে ভিজে গেছেন।'

ওর ভিজে শরীরের দিকে ছোকরা-ডাক্তারের দৃষ্টিটা কিন্তু ভিজে-ভিজে ঠেকল না। অস্বস্তিতে আরো জড়সড়ো হয়ে বসল জয়শীলা।

'মার্কেটিং-এ বেরিয়েছিলেন বুঝি ?'

'হ্যাঁ ঃ একটু—'

'আপনার পরীক্ষার রেজাণ্ট তো বেরিয়েছে। খাওয়াচ্ছেন কবে ?'

'আমার রেজাণ্ট আপনি জানলেন কি করে ?'

'কেন অসুবিধে কি ? আপনার রেজাণ্টটা তো প্রাইভেট ব্যাপার নয়।' হাসিটা চালাক-চালাক দেখাল নির্বানীতোষের।

জয়শীলা উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে ঘোলাটে আকাশের দিকে তাকাল। বৃষ্টির বেগ যেন আরো জোরে শুরু হয়েছে।

'আপনার শরীর কিন্তু আগের চেয়ে কাহিল দেখাচ্ছে—'

ওর শরীরের দিকে ডাক্তারের তাকানোর কায়দাটা এবারও চিকিৎসা-বিশারদের মতো দেখাল না। বললে, 'না। ভালোই আছি।'

নির্বানীতোষ বললে, 'ভালো থাকলেই ভালো। জানেন তো শ্লোকটা, কী যেন—শরীরমাস্তং খলু…খলু—'

'ধর্ম সাধনম্—' শেষ করল জয়শীলা।

হা হা করে হাসল ডাক্তার। 'সেই কবে পড়েছিলাম, মনে থাকে কি ছাই। ভালো কথা ঃ আপনার মামাবাবু কেমন আছেন ?'

'ভালো।'

'যাব একদিন।'

'মামার শরীর তো এখন ভালোই আছে—'

'কী আশ্চর্য ! ডাক্তার বলে কি আমরা মানুষ নই জয়শীলা দেবী। সামাজিকতা বলেও কি কিছু থাকতে নেই আমাদের। এই যে আপনি বসেছেন আমার এখানে—এটা কি ডাক্তার রুগীর সম্পর্ক।'

ডাক্তারের কথার পেছনে কী ইংগিত ছিল। লজ্জিত হতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল জয়শীলা।

বৃষ্টি কি শেষ হবে না। আকাশে ধারাপাতের বিরাম নেই।

বাইরে বৃষ্টিরও বিরাম ছিল না। ঘরে নির্বানীতোষের কথারও। ওর কথার ভারে কিংবা বৃষ্টির অন্যমনস্কতায় নীরবে শুনছিল ডাক্তারের কথা-গুলো। ঘরোয়া কথা। অতি সাধারণ। দার্শনিকতা বা পাণ্ডিত্যের তিলমাত্র জেল্লা নেই। আর, ওর কথার আয়নায় ভেতরের মানুষটা মুকুরিত হয়ে ওঠে। কতটুকু ক্ষমতা, কতটুকু চাইবার সীমা—লোভ আর বাসনায় জড়িয়ে সমগ্র মানুষটাকে চিনতে ভুল করে না জয়শীলা। হাত বাড়িয়ে দিলেই

হয়তো এই মানুষটাকে পাওয়া যায়, কিন্তু হাতও বাড়াল, অথচ পেলনা এমন মানুষের পরিচয়ও তো তার জীবনে মিলেছে।···

নির্বানীতোষের ডাকে ভাবনা জাল ছিঁড়ে গেল জয়শীলার।

'আপনি ভীষণ মুডি—' ডাক্তার হাসল: 'আমাদের শাস্ত্রে বলে: মানুষের জীবনে এ্যাকশন কমে গেলে মুড্ বাড়ে।

'তাই নাকি? জানা থাকল। আচ্ছা: যাদের কেবল এ্যাকশন আছে, মুড নেই—তাদের কি বলবেন?'

'তারা হল নির্বানীতোষ।' বলেই হো হো করে হেসে উঠল ডাক্তার। হাসি থামিয়ে গম্ভীর হবার ভান করে বললে, 'অবাক হচ্ছেন? মেডিক্যাল কলেজে এত বছর না থাকলে আমিও হয়তো আপনাদের মতো বিশ্বাস করতাম। কোনো লোক দুঃখ পেলে কাঁদে, চোখে জল গড়িয়ে পড়ে। কিন্তু যদি একবার জেনে ফেলেন চোখে জল আসবার আসল কারণটা কি, তাহলে ওই আবেগ-টাবেগ নেহাতই মিছে মনে হবে।'

'আপনার কাছে এলে জ্ঞান হয়।' উঠতে উঠতে বললে জয়শীলা।

'ঠাট্টা করছেন, বুঝতে পারছি।'

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে তখনো। রাস্তায় জল দাঁড়িয়েছে।

'একটা রিকশা ডেকে দেবো?'

'না। থাক। এইটুকু তো পথ। চলি—নমস্কার—'

রাস্তায় বেরিয়ে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল জয়শীলা।

আকাশটা তখন হালকা হয়ে এসেছে। হাওয়ায় ভিজে গন্ধ। শীত-শীত। পথে আটকা-পড়া মানুষগুলো এখন সামনে ঝুঁকে পড়ে ছুটছে।

আবার রাত্রি।

কিন্তু, আজকের বৃষ্টি-ভেজা রাত্রিতে কেন যে ঘুম আসছে না জয়শীলার কে জানে।

কলেজের পড়াশোনার চাপ ছিল, পরীক্ষার জরুরি তাগিদ ছিল—লেখা-পড়ার গভীরে তলিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরীক্ষার ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর থেকে দিনগুলি নির্ঝঞ্ঝাট, অবকাশও বেড়ে গেছে। সারাদিনে এটা-ওটা কাজে-অকাজে নিজেকে নিযুক্ত রেখে সময় কেটে যায়, আর রাত্রি ঘন হলে গভীর ক্লান্তিতে বিছানায় এলিয়ে পড়ে।

কিন্তু, আজকে এই বৃষ্টিমেশাভরা রাত্রে চোখের পাতায় কিছুতেই ঘুম আসতে চায় না। অথচ মন উত্তেজিত হয়নি, শরীরেও কোন প্রদাহ নেই।

শরীর আর মনকে অন্যদিনের চেয়ে কিছু বাড়তি বোঝা মনে হচ্ছে না। কোথাও কোন বিরক্তি নেই, অবসাদ নেই। হঠাৎ মনে হল জয়শীলার: মরে যাবে না তো! জীবনে এইভাবে আসক্তি হারিয়ে নির্বিকল্প হতে-হতে এমনি করে বুঝি মৃত্যুর হিমশীতল কোলে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে মানুষ। আর, এখন এই মুহূর্তে মৃত্যুর অনুভূতিকে কিছুমাত্র কষ্টকর মনে হল না। এত সহজ, নিরাবরণ, সন্ধ্যার অন্ধকারে জানালায় পর্দা টেনে দেয়ার মতোই, শুধু বাইরের হাওয়ার ধুকপুক বন্ধ হয়ে যাওয়া। তবে কি সত্যিই সে মরে যাচ্ছে। এই ঘর, এই ছাদ, টেবিলে মাসিমার অবয়ব—কিছুই তো অস্পষ্ট হয়ে আসছে না। এইতো সে হাত ছুঁতে পারছে, কপাল তো নিরুত্তাপ ঠাণ্ডা নয়। তবে—তবে উঠতে পারছে না কেন। মাসিমাকে ডাকবো? না থাক।

কিন্তু, সত্যাই ঘুম আসছে না। কী চাচ্ছে মনটা। শ্লুস্ বোর্ডের চাবিটা ধরে কে ভীষণ নাড়াচাড়া করছে, কখন এক সময় খুলে যাবে গেট, আর হু-হু করে বন্যার তোড়ে থৈ-থৈ করবে মস্তিষ্কটা।

কে? দেবপ্রিয়? দেবপ্রিয়কেই কেন মনে পড়ছে! সে তো মৃত তার জীবন থেকে, তার সমস্ত অনুভূতি থেকে। কিন্তু স্মৃতি! স্মৃতির জোনাকিগুলি কেন মিটি মিটি করে জ্বলে। ছেঁড়া ছেঁড়া খণ্ড খণ্ড কোনো ঘটনা, খুচরো কথা, হাসি, আর অভিমান। দেবপ্রিয়ের আস্ত শরীরটা যেন ভেঙে খণ্ডখণ্ড টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। ওর সম্পূর্ণ কোনো মূর্তি চোখে ভাসে না। কখনো ওর মুষ্টিবদ্ধ হাত, আঙুলের ব্যঞ্জনা, কখনো চোখের হাসি, ঠোঁট নাড়ার কায়দা।

অথচ—একদিন এত পরিচয় দেবপ্রিয়ের সঙ্গে। ওর শরীরের ডৌল, লম্বা আঙুল, কথা, হাসি, লজ্জা জড়িয়ে সমস্ত মানুষটার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা। আজ কিছুতেই মনে করতে পারছে না ওর গোটা চেহারাটাকে। কেবল কতগুলো ভঙ্গি আর কিছু ঘটনার মধ্যে বেঁচে রয়েছে সে।

আশ্চর্য! কেন এমন হয়। কেন এমন হল! ভুলতে চেয়েছিল বলেই কি এত তাড়াতাড়ি ওকে ভুলতে পারল জয়শীলা। কিন্তু এত শীঘ্র তো সে ভুলতে চায়নি। তবে কি এতদিন মনে রাখার মধ্যেই কোথাও ফাঁক ছিল, ফাঁকি ছিল। নাকি, তিলমাত্র চিনতে পারেনি দেবপ্রিয়কে, ওর স্বরূপকে। যত আবেগ জোরালো ছিল, সত্যের ডাঙা ছিল না এতটুকু। তবে এতদিন কাকে ভালোবাসল সে। কার সঙ্গে জীবন যোগ করতে যাচ্ছিল। সে দেবপ্রিয় নয়! নয়? তবে কাকে ভালোবাসল? কে সে? কে সে?

না না। কী আবোল-তাবোল ভাবছে জয়শীলা। ঘুম আসছে না বলেই প্রগল্‌ভ হয়ে উঠছে মস্তিষ্কটা। দেবপ্রিয় না হলে তাঁর ভালোবাসা আশ্রয় করত কাকে!

তবু দেবপ্রিয়কে আগের মতো তেমন করে মনে পড়ছে না কেন! ও যে কেমন দেখতে ছিল সেইটেই পরিষ্কার করে ভাসছে না চোখের পাতায়। ট্র্যামে বাসে রাস্তায় এত মানুষ দেখি, কারুর মুখের আদলের মধ্যে দেবপ্রিয়কে আবিষ্কার করা যায় না।

না। ঘুম আসছে না। সারা শরীর জুড়ে অসোয়াস্তি। গ্রীষ্মকালের ত্বপুরে পূর্ণিয়ায় থাকতে ঠিক এই রকম মনে হত। বাইরে লু বইছে, ঘরের ভেতরে দরজা-জানালা বন্ধ করে মেজেয় জল ঢেলে শীতলপাটি বিছিয়ে শুয়েও কেমন জ্বালা দুর হত না। ঘাম নয়, তবু সারা শরীর জ্বলত।

অনেকক্ষণ ধূসর দৃষ্টিতে রাত্রির অন্ধকারের দিকে চেয়ে নিথর পড়ে রইল জয়শীলা।

গ্রীষ্মের ছুটি ফুরোবার সপ্তাহখানেক আগেই জয়শীলারা ফিরল ভুবনেশ্বর থেকে। ভুবনেশ্বরের জলে বিজয়কেতু কিছুটা তাজা হয়ে ফিরেছেন। মনের দগদগে ঘাটাও নতুন জায়গার নতুন পরিবেশে আরাম হবার প্রশ্রয় পেয়েছিল জয়শীলার। কলকাতায় পা দিয়ে কয়েকদিন শূন্য মস্তিষ্কটা হাল্‌কা ঠেকছিল। দেশবিদেশের টাটকা নভেল পড়ে রয়ে-বসে দিনগুলি কাটিয়ে দিতে লাগল। বৈচিত্র্যের লোভে স্নেহলতার সঙ্গে প্রায়ই এটাসেটা মার্কেটিঙে, নিজের হাতে কোনোদিন পুডিঙ কেক স্যাণ্ডউইচ!

কিন্তু কতোদিন! ত্ব' মাস যেতে না যেতে মামাবাবুর ভাঙা শরীর আবার ভাঙতে লাগল। জয়শীলার মনের শুকনো ঘাও আবার দগদগে হতে লাগল।

য়ুনিভার্সিটির নতুন জীবনের মধ্যে আশ্রয় পাবার আকুল চেষ্টায় নিজেকে গভীরভাবে নিযুক্ত রাখল জয়শীলা। এমন মনোযোগ দিয়ে আর দর্শনের ক্লাশ কোনোদিন শোনেনি সে। অবসর সময়টুকু লাইব্রেরি ওয়ার্ক।

আর রাত্রির নির্জন বিছানায় ফিরে এসে হাই তুলতে তুলতে মনে হত: মামাবাবুর কেরিয়ার তৈরি করার বিরুদ্ধে আপত্তি জানাতে গিয়ে নিজেই কেমন মামাবাবুর আইডিয়ারই পুতুল হয়ে পড়েছে সে।

এইভাবে একদিন এম. এ. পাশ করবে, সরকারী বৃত্তি পায় ভালো,

নাহলে মামাবাবু নিজেই তাকে ইউরোপে পাঠাবেন। তারপর পাশ করে ফিরে এসে মোটা বেতনের সরকারী চাকরী। জয়শীলা মজুমদার বলে একটি মেয়ের কথা আর কেউ মনে রাখবে না। জে. মজুমদারের নামের পিছনে বাহনের মতো কতগুলো খেতাব ঝুলবে। আর খেতাবের তলায় তার মন চিরদিনের জন্যে সুপ্ত হয়ে থাকবে। বয়েস বাড়বে, চোখে পুরু পাওয়ারের চশমা, পাতলা হয়ে আসা চুলে ছোপ, শ্লথ হবে গায়ের চামড়া, চোখের কোলে পাখির পায়ের অসংখ্য আঁকিজুকি, শরীরে মেদ। নাম, সম্মান, খেতাব, আর মোটা মাইনে।

এই জীবন, এইভাবে বেঁচে-থাকা। মানুষ নয়, যন্ত্র।

কিন্তু, এই জীবন তো চায়নি জয়শীলা। সে চেয়েছিল সহানুভূতি, প্রীতি আর বন্ধুত্ব। মানুষ বেঁচে থাকে তার হৃদয়ে। সেও তো চেয়েছিল হৃদয় দিতে। কিন্তু, হৃদয় দিলেও তো হৃদয় পাওয়া যায় না। একটা সূক্ষ্ম অদৃষ্টের জালে যেন জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের জীবন বাঁধা। ইচ্ছে থাকলেও জাল ভেদ করে বেরিয়ে আসা যায়না বুঝি। হৃদয় শুধু রক্ত তুলে মরে, নিজের ইচ্ছা দেহের মধ্যেই মাথা খুঁড়ে দাংগা করে।

দেবপ্রিয় এমন করল কেন? নাকি, সেও অদৃষ্টের জালে-বাঁধা দুর্বল মানুষ। সাহস ছিল না, জোর ছিল না ইচ্ছার। একা মানুষ নিঃসঙ্গ অসহায়, কিন্তু সে তো হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, দুজনে মিলে উভয়ের দুর্বলতা কাপুরুষতাকে তো তারা চূর্ণ করতে পারত। তবে? তবে একথাই কি সত্যি : দেবপ্রিয়ের মধ্যে ভালোবাসার ঐশ্বর্য ছিল না।

সেদিন বাড়িতে ফিরতে দেরি হয়েছে জয়শীলার। ভেতরে পা দিয়েই সমস্ত বাড়িটা কেমন থমথমে মনে হল।

মামাবাবু আজ ঘরে একলা নন্। ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে আধা অন্ধকার ঘরে নিঝুম বসে। তাঁর সামনে, মুখোমুখি চেয়ারে আর একজন ভদ্রলোক। অপরিচিত অজানা।

'মামাবাবু, আজ কেমন আছ?' চৌকাঠ থেকে প্রশ্নটা ছুঁড়ে মারল জয়শীলা।

বিজয়কেতু বললেন, 'ভালো। আয়—কাছে আয়।'

মামাবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে এবার আগন্তুককে স্পষ্ট করে দেখা গেল।

চল্লিশোর্ধে বয়েস। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। বলিষ্ঠ পেশল দেহ। উন্নত নাসিকার উপরে একজোড়া চোখের দৃষ্টি মেদুর। পরনে সাহেবি পোশাক।

'এঁর সঙ্গে আলাপ করে দিই। ইনি শ্রীবীরেশ্বর দাশগুপ্ত, বড় চাকুরে। রাঁচি থেকে এসেছেন। আর বীরেশ্বর, এটি আমার ভাগ্‌নী জয়শীলা। ফিলজফিতে এম. এ. পড়ছে।'

বীরেশ্বর চোখ তুলে বললে, 'ও…'

বিজয়কেতু বললেন, 'ত্যাখ দেখি স্নেহ কি করছে?'

জয়শীলা বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

'মাসিমা—ও মাসিমণি—'

এ ঘর সে ঘর। মাসি কোথায়? বাথরুমে। না নেই। শোবার ঘর অন্ধকার।

'ও মাসিমা কোথায় গেলে?'

অন্ধকার বারান্দার কোণে ও কার ছায়া। স্থাণু, নিশ্চল।

'মাসিমা—'

স্নেহলতা নিঃশব্দ।

গায়ে ঠেলা দিল জয়শীলা। মাসিমার দেহটাকে কেমন হিম-হিম মনে হল।

'ও মাসিমা—এখানে দাঁড়িয়ে কী করছ?'

'উঁ?'

'মামাবাবু ডাকছেন তোমাকে।'

'হুঁ…'

'মাসিমা, তোমার শরীর খারাপ?'

'না—'

'মাসিমণি, কি হয়েছে তোমার?'

'কিছু হয়নি রে। চল—চা খাবি চল—'

জামাকাপড় ছাড়তে চলে গেল জয়শীলা।

আরো কিছুক্ষণ অন্ধকার বারান্দায় পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন স্নেহলতা। অন্ধকার। এই অন্ধকার সমুদ্র ঠেলে আবার এল কেন বীরেশ্বর। এই দীর্ঘ কয়েক বছর পরে বীরেশ্বর কোন্ মুখে, কোন্ সম্পর্কের জোরে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। নিজের হাতে শাঁখা গুঁড়িয়েছেন স্নেহলতা, ভিজে তোয়ালে ঘসে সিঁথের সিঁদুরের দাগ তুলেছেন। বাইরের চিহ্ন যেমন নিশ্চিহ্ন করেছেন, তেমনি তিলে তিলে নিজের মন থেকে রবার ঘসে বীরেশ্বরের সম্পূর্ণ চিত্র মুছে ফেলেছেন। আজকের এই দুর্ভেদ্য মন তৈরি করতে সময় লেগেছে, যুদ্ধ করতে হয়েছে নিজের সঙ্গে, অনেক

হাহাকার, অনেক নির্জন কান্না জমে জমে মেঘ হয়েছে, শক্ত ইটের মতো মেঘ—নিশ্ছিদ্র, নির্মক্ষিক। পুরানো সম্বন্ধের জের টেনে আজ মিথ্যাই এসেছে বীরেশ্বর। কী চায়, কী চায় সে।

ড্রয়িংরুম থেকে চটির শব্দ।

'স্নেহ—ও স্নেহ—'

বারান্দা বরাবর এগিয়ে এলেন বিজয়কেতু।

'একি। এখানে কি করছিস তুই! বীরেশ্বর কতক্ষণ বসে রয়েছে তোর জন্যে।'

স্নেহলতা স্তব্ধ গলায় বললেন, 'আমি কি করতে পারি। ওকে তো আমি বসতে বলিনি।'

'দেখা করবিনে তুই?'

'সব জেনে তুমিও আমাকে এইভাবে বলবে দাদা।'

বিজয়কেতুকে চিন্তিত দেখাল। একটু থেমে বললেন, 'তবু দেখা করতে এসেছে। করতে দোষ কী।'

স্নেহলতা ভিজে গলায় বললেন, 'কী হবে দেখা করে? কী চায় সে। এতদিন পরে, উঃ এতদিন পরে, কী কথা বলব তার সঙ্গে…'

'সুদূর রাঁচি থেকে এতদিন পরেও যে লোক দেখা করতে এসেছে তাকে ফেরানো কি উচিত, স্নেহ? যা ভাই, দেখা কর ওর সঙ্গে।'

'তুমি…তুমি বলছ দাদা?'

'হ্যাঁ বলছি। তোর সঙ্গে দেখা না-করে ওতো উঠবে বলে মনে হচ্ছে না।'

'বেশ। আমি যাব।'

ধীরপায়ে বিদায় নিলেন বিজয়কেতু। তাঁর চটির শব্দ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে অবশেষে একসময়ে মিলিয়ে গেল।

রেলিঙের ধার থেকে ফিরে দাঁড়ালেন স্নেহলতা। অনেক ঋজু, আর দীর্ঘ দেখাল ওঁর দেহলতা। চুলগুলি উড়ছে এলোমেলো হাওয়ায়, কাঁধ থেকে বসন স্খলিত হয়ে পড়েছে। ক্লান্ত পায়ে ঘরে এলেন স্নেহলতা, আলো জ্বাললেন। এগিয়ে গেলেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো ড্রেসিং টেবিলের সামনে। দীর্ঘ প্রতিবিম্ব পড়েছে কাচের গায়ে। চিরুনি দিয়ে সামনের চুলগুলোকে একটু সুবিন্যস্ত করে নিতে ভুললেন না, ঘোর ঘোর অবস্থায় পাউডারের পাফটা বুলিয়ে নিলেন মুখের ওপর। আলনা থেকে ধোপার বাড়ির সদ্যভাঙা শাড়িটা গায়ে জড়িয়ে নিলেন।

বেরোতে গিয়ে আয়নার সামনে আর একবার হোঁচট খেয়ে থমকে দাঁড়ালেন : চোখের কোলে কালির দাগটা সত্যিই কি গভীর দেখাচ্ছে!

শক্ত পায়েই এগিয়ে ছিলেন স্নেহলতা, কিন্তু ড্রয়িংরুমের দরজার পিছনে দাঁড়িয়ে দম-ফুরানো কলের মতোই কেমন পায়ের জোর কমে গেল। খোলা দরজার পর্দা উড়ছে বাতাসে। ভেতরে পুরানো ফ্যানটা ঘুরতে-ঘুরতে শব্দ করছে।

হঠাৎ নাসারন্ধ্রে কেমন তেজালো গন্ধ। আর গন্ধটা যেন অনেক স্মৃতিবহ। শুধু নাকে নয়, তার জামাকাপড়ে, সারা দেহে যেন ধূপের ধোঁয়ার মতো জড়িয়ে ধরল গন্ধটা।

ঝিমঝিম করতে লাগল সমস্ত শরীর, রক্তের মধ্যে কেমন যেন এক দুর্নিবার লোভ। কপালের দুপাশের শিরা দুটো দব্‌দব্‌ করছে, ঝাঁঝা করছে চোখ।

চৌকাঠের গায়ে অনেকক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগলেন স্নেহলতা।

পর্দার ফাঁক দিয়ে পিছন থেকে বীরেশ্বরকে দেখা যাচ্ছে। তার মাথার সামনে চক্রাকারে উড়ছে হাভেনা সিগারের ভারি ধোঁয়া।

পায়ে পায়ে ঘরের ভেতরে ঢুকলেন স্নেহলতা।

নির্জন ঘরটায় যেন এখুনি কার ফাঁসি হবে—তেমনি শ্বাসবন্ধ, ঠোঁট-চাপা।

পায়ের শব্দে মাথা তুলল বীরেশ্বর। আর এক পলকে দু' জোড়া চোখ মিলিত হল।

একটা মহা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর দুই শিবিরের দুজন যোদ্ধা মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে!

বীরেশ্বর নিষ্পলকে চেয়ে রইল স্নেহলতার দিকে।

স্নেহলতা ডানদিকের চেয়ারে ভর দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন।

নিস্তব্ধতা।

কয়েকটা মুহূর্ত।

বীরেশ্বর সিগারটা ছাইদানিতে গুঁজতে গুঁজতে বললে, 'বোসো।'

স্নেহলতা তেমনি দাঁড়িয়ে রইলেন।

'বসবে না? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী কথা হয়?' বীরেশ্বরের কণ্ঠস্বর ক্লান্ত।

'আপনি বলুন। আমি শুনছি।' কথাগুলো বলতে যত কষ্ট হবে ভেবেছিলেন স্নেহলতা, তার কিছুই হল না। অনেক সহজে, স্বাভাবিক ভাবেই বেরিয়ে এল মুখ থেকে।

স্নেহলতার মুখের দিকে অপলকে চেয়ে রইল বীরেশ্বর। আর যদি লক্ষ্য করা যেত তাহলে দেখা যেত ওর মুখ বিবর্ণ পাণ্ডুর হয়ে উঠেছে, থরথর করে কাঁপছে ঠোঁট।

নীরবতা।

'মনে হচ্ছে আমি আসায় খুশি হওনি তুমি?' বীরেশ্বর চুপ থেকে আবার বললে।

একথার জবাব মৌন থেকেই বোঝাতে চাইলেন স্নেহলতা।

'মনে হচ্ছে'—বীরেশ্বর চেয়ারে সোজা হয়ে বসে বললে : 'আমাদের পূর্ব পরিচয়ের কিছুই তুমি স্বীকার করতে চাও না?'

স্নেহলতা বললেন, 'সে পরিচয়ের কথা তুলে আজ কোনো লাভ নেই আপনার যা বলবার সংক্ষেপে বলুন।'

'খুব ব্যস্ত বোধ করি?'

'হ্যাঁ। এই সংসার দেখাশোনার ভার আমার।'

'সংসার!' থেমে-থেমে উচ্চারণ করল বীরেশ্বর : 'তোমার সংসার!' হাসির অভিনয় করে বললে সে : 'বিবাহিতা মেয়েদের সংসার বলতে লোকের অন্য রকম ধারণা।'

স্নেহলতার চোখ দুটো একবার ধক্ করে জ্বলে উঠল। 'আপনি ভুলে যাচ্ছেন আমি বিবাহিতা নই।'

'নও? তবে কুমারী?' একটা গোপন বিদ্রূপ ধারালো হয়ে উঠল বীরেশ্বরের মুখে।

স্নেহলতা বললেন, 'না। আমি বিধবা।'

শক্তিশেলবিদ্ধ লক্ষ্মণও বোধকরি এমন চমকে উঠত না। চেয়ারে শিথিল ভঙ্গিতে বসে থাকা বীরেশ্বরকে মনে হল মেরুদণ্ডহীন স্পঞ্জজাতীয় কোনো জীব।

স্নেহলতা উত্তেজিত হবেন না মনে করেছিলেন। কিন্তু, এখন মনে হল সত্যিকারের ভেতরকার দুর্বলতা কাটাতে উত্তেজনার বাড়াবাড়ি দরকার। কী আশ্চর্য, সুমুখের চেয়ারে বসা ক্লান্ত মানুষটিকে দেখে সহানুভূতি তো দূরের কথা, কোনো অনুভূতিই জাগছে না। এর চেয়ে যদি না-আসত বীরেশ্বর, কোনদিনই দেখা না-করত তার সঙ্গে, তাহলেও হয়তো শ্রদ্ধা থাকত ওর সম্পর্কে। বীরেশ্বরের উপস্থিতি যেন তারই অন্ধতার, মূঢ়তার স্বাক্ষর। কিন্তু, কী চায় সে? এই দীর্ঘ বছর পরে হঠাৎ তার এই নাটকীয় আবির্ভাব কেন।

বীরেশ্বর অনেকক্ষণ পরে মুখ খুলল : 'আজ তুমি ভীষণ উত্তেজিত মনে

হচ্ছে। আজ আর কোনো কথা বলে কাজ হবে না। এখানে আমি তিনচার দিন আছি। আপাতত হোটেলে উঠেছি। আমি কাল আবার আসব।'

স্নেহলতা বললেন, 'না।'

'কি না?'

'কাল আমি বাড়িতে থাকব না।'

'পরশু?'

'না—'

'তরশু?'

'না—'

'বেশ তো। তবে তুমিই বলো: কবে আসব?'

'আমার পক্ষে কোনো তারিখ দেওয়া সম্ভব হবে না।'

'সম্ভব হবে না!'

'না।'

'তাহলে আবার বসতেই হয়।'

আবার নীরবতা।

রাতের ঘড়ি টক টক শব্দ করে' চলেছে।

বাইরে উচ্ছৃংখল হাওয়ার লুটোপুটি। বার্মাশেলের ক্যালেণ্ডারটা দেয়ালে লেগে ঠক ঠক শব্দ তুলছে। জানালা-দরজার পর্দা নড়ছে। বাইরে হাজারো নক্ষত্রের আলোক-সজ্জা। চাঁদ বোধহয় আজ বিলম্বে উঠবে।

বীরেশ্বর শান্ত গলায় বললে, 'মানুষ শয়তানও নয় ভগবানও নয়। তোমার কাছে যদি অপরাধ করে' থাকি তার মার্জনা মিলবে ওই একটিমাত্র তত্ত্বের ওপর।'

স্নেহলতা মৌন।

বীবেশ্বর বললে, 'আমার বক্তব্য না শুনে একপক্ষের রায় জারি হবে, এটা কি সঙ্গত? তোমাকে বিয়ে করার সময় আমি বিবাহিত ছিলাম, এটা সমাজের চোখে অপরাধ এবং তোমার চোখেও।'

স্নেহলতা তবুও মৌন।

'কিন্তু···তোমার নিজের মনে প্রশ্ন করো: তোমাকে কি আমি এতটুকু বঞ্চিত করেছি? অথচ—' বীরেশ্বর শেষ করল: 'তোমাকে ঠকাতে পারতাম।'

স্নেহলতার ভেতরটা অকস্মাৎ শীত-শীত করে' উঠল। নাকের ডগা ঘামছে, কপালের পাউডারের পালিশ কি গলতে শুরু করেছে।

কি চায়। এত দীর্ঘ বিরতির পরে রাহুর মতো হঠাৎ মানুষটার উদয় হল

কেন! ধ্বংস-পর্বের পরে আবার কি সৃষ্টি-পর্ব সম্ভব। দেয়াল ভাঙলে গড়ে' তোলা যায়, কিন্তু মন, মন কি জোড়া দেওয়া যায়।

বীরেশ্বর আবার আরম্ভ করল: 'এতদিন পরে হঠাৎ ভুল সংশোধন করতে এলাম কেন! কথাটা স্বার্থপরের মতো শোনাবে: কণকধারা, আমার স্ত্রী গত বছরে মারা গেছেন।'

'তাই, তাই বুঝি…'

'আমার কথা শেষ হয়নি—' বীরেশ্বরের কণ্ঠস্বর গম্ভীর, ভারি। 'আগেই বলেছি আমার প্রস্তাবটা আজ স্বার্থপরের মতোই শোনাবে। কিন্তু ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি: কণকধারার চিতায় জল ঢেলে দিয়েই আমি তোমার কাছে ছুটে আসিনি। আমাকে ভাবতে হয়েছে, গভীরভাবে সমস্ত ঘটনা বিচার করতে হয়েছে পুরো একটি বছর ধরে।' পুরানো ভাবনাগুলো স্মৃতি থেকে উদ্ধার করতেই বোধহয় ধ্যানমগ্ন দেখাল বীরেশ্বরকে।

কোমরটাকে শ্লথ করে চেয়ারে ঝুঁকে বসেছে বীরেশ্বর, মুখ আনত। ওর এলোমেলো পাক-ধরা চুলে হাওয়া দিচ্ছে। মনে হল: বেশ রোগা হয়েছে এই কয়েক বছরে, গালে বাড়তি মাংসের চিহ্ন নেই। জোড়বদ্ধ কব্জি অনেক রুগ্ন, হাতের আঙুলগুলিও আগেকার মতো পুষ্ট নয়।

এই মুহূর্তে নিথর অকম্প মানুষটার প্রতি যেন দয়া হয়। কিন্তু, দয়া দেখিয়ে তো জীবনের আসল সমস্যা মেটে না। ভালোবাসায় যদি গৌরব না থাকে, দীনতায় তার সমাধি। আজ থেকে বছর উনিশ কুড়ি আগে এই মানুষটিকেই ভালোবেসেছিল। কিন্তু জীবনের খাতা থেকে বছর উনিশ কুড়ি অনেক দীর্ঘ সময়। সে-মানুষ নেই, সে-মন নেই। সে-বয়সও নেই বোধ করি।

নিস্তব্ধতা ভঙ করে বীরেশ্বর বললে, 'জীবন থেকে যে বছরগুলো ব্যর্থ হয়ে গেছে সে আর ফিরবে না। কিন্তু যে কটা বছর বেঁচে আছি, তাকে আর নষ্ট হতে দিয়ে লাভ কি, স্নেহ? চলো—ফিরে চলো—' শেষের কথাগুলো ভাঙা-ভাঙা শোনাল বীরেশ্বরের।

নিঃশব্দতা।

ঘড়িটা টক টক করে সময়ের প্রবাহ ঠেলে চলেছে।

জানালার ফাঁকে আকাশে এক রাশ তারার আলিম্পন। তারাদের চোখে কি কৌতুক! হাওয়া কি বন্ধ হয়ে গেল! কই, নাতো, জানালার পর্দাগুলো চপল শিশুর মতো দুরন্তপনা করছে, ক্যালেণ্ডারের পাতা ঠক ঠক শব্দ তুলছে দেয়ালে।

পৃথিবী কি ঘুরছে এখনো !

দাদা, এতক্ষণ কোথায় আছেন ? তাদের কথা বলবার সুযোগ দেবার জন্যেই তিনি সরে পড়েছেন নিশ্চয়ই। কিন্তু, শীলা, সেও আসে না কেন। নাকি, দাদা তাকে আটকেছেন ! কেউ যদি এখন এসে পড়ত। অন্তত ঠাকুরটাও, রান্নার কথা জিগ্যেস করতে !

কিন্তু, কেউ আসবে না। দাদা নয়, শীলা নয়, ঠাকুরও নয়।

নিঃশব্দতা। সমস্ত ঘরটা বোবা-ধরা গুমোট। দম বন্ধ হয়ে আসছে, দৈত্যের মতো গুঁড়ি মেরে যেন নিস্তব্ধতা এগিয়ে আসছে। সারা শরীরে ঘামের নদী, জামাটা লেপ্‌টে গেছে গায়ের সঙ্গে, শীত-শীত। মাথাটা কেমন ধরে গেল, চোখ ঝাঁঝাঁ করছে। পিপাসা। জল। এক গ্লাস জলও যদি কেউ এনে দিত !

কত রাত হল ? বীরেশ্বর কি তার হোটেলে ফিরবে না ! সংসারের কত কাজ পড়ে আছে। দাদার অসুখ, সন্ধ্যের দিকেই খেয়ে নেবার কথা। তারপর ওঁর ফুটবাথের জোগাড় করতে হবে। শীলা বোধহয় এখনো চা খায়নি। নাকি খেয়েছে ! দাদার খাবারের জোগাড় কি সে করছে !

'অনেক রাত হল।' অনেকক্ষণ পর অনেক চেষ্টায় উচ্চারণ করলেন স্নেহলতা।

'এ্যাঁ !' যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠল বীরেশ্বর। বললে, 'আমাকে যেতে বলছ ? আমার প্রস্তাবের কি এই জবাব স্নেহলতা ?'

স্নেহলতা নিরুত্তর।

বীরেশ্বর একটু থেমে বললে, 'বুঝতে পারছি ঃ এতদিন পরে আমার এই প্রস্তাব তোমার কাছে আকস্মিক ঠেকছে। তোমাকে ভেবে দেখবার সময় আমি অবশ্যই দেবো। যদি বলো ঃ কাল না হয় পরশু, কিংবা যে কোনোদিন বলবে, আমি তোমার অপেক্ষা করব। আজ উঠি। সত্যিই অনেক রাত হয়েছে। বিজয়কেতুবাবুর সঙ্গে দেখা হল না। সিঁড়ি এই দিকেই তো ? আচ্ছা—'

সিঁড়িতে ভারি জুতোর শব্দ। ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর।

সত্যিই কি চলে গেল মানুষটা। আবার কি ফিরে আসবে ? কোথা থেকে একটা দামাল লোভ তাঁর সমস্ত মনকে যেন বেআব্রু করে দিতে চাচ্ছে। দুর্বলতাকে ঝেড়ে ফেলতে গিয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল স্নেহলতার। আর ঠিক ঘরে ঢোকবার আগে যে উত্তেজক ঝাঁঝালো গন্ধটা সমস্ত স্নায়ুকেন্দ্রকে

আবিষ্ট করে দিচ্ছিল; সেই গন্ধটাই যেন পাক খেয়ে-খেয়ে অন্ধ পাখির ছানার মতো ঘুরতে লাগল রক্তের মধ্যে। সিগারটা কি ছাইদানিতে ফেলে গেছে বীরেশ্বর। এতক্ষণ ধরে কি বলতে চাইল, কী বোঝাতে চাইল সে। কনকধারা মারা গেছে! কী হয়েছিল তার! এক বছর ধরে কি ভাবল বীরেশ্বর। 'চলো—ফিরে চলো।' প্রস্তাব নিয়ে এসেছে সে। কিন্তু, কোথা থেকে এসেছেন স্নেহলতা, ফিরবেন কোথায়? ফেরা কি যায়!…যেদিন চলে এসেছেন বীরেশ্বরকে ছেড়ে, সেদিন থেকে সমস্ত অস্তিত্ব, চেতনাকে ফিরিয়েছেন ওর দিক থেকে। শুধু দেহ ফেরেনি, মনও ফিরেছে। আর এই সুদীর্ঘ বছর ফেরার সাধনাই করেছেন, ইস্কুলের চাপে অতীত চাপা পড়েছে, মন মরেছে। আজকের স্নেহলতার পরিচয় বেলতলা গার্ল ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী ছাড়া কিছু নয়। স্নেহলতা দাশগুপ্তা নন, স্নেহলতা সেন।

কিন্তু…হঠাৎ একফোঁটা জল তার হাতে ঝরে পড়ল কি করে। আকাশে কি মেঘ দেখা দিয়েছে। না। পাথরের মতো চোখদুটো ফেটে জল গড়িয়ে পড়ল। লোনা-লোনা, সমুদ্রের শব্দ, ওয়েলটেয়ার, ডলফিন্‌স নোজ, লসনস্ বে, চার্চহিল, সীমাচলম্।

'মাসিমা ও মাসিমা—'

কে?

অসীম শূন্যতা। শূন্যতার পটে অস্পষ্ট আঁকিবুকি। দূরের থেকে পাহাড় আর আকাশকে যেমন ধোঁয়াটে লাগে।

'মাসিমণি—ও মাসিমণি—'

কেন এমন হল! এতদিনের তৈরি করা পাঁচিলের মতো শক্ত মন সেখানে কি চিড় ধরেছে। বন্যার জল কি পাঁচিল ভাঙবে, ভাসাবে জনপদ, লোকালয়, নীড়, আশ্রয়।

'মাসিমণি, কী হয়েছে তোমার?'

'কই কিছু না তো। মাথাটা হঠাৎ ঘুরে গেল।'

'তোমার চোখে জল। তুমি কাঁদছ মাসিমণি…'

স্নেহলতা হাসতে চেষ্টা করলেন। 'চোখে কি পড়ল কিনা!'

উঠলেন স্নেহলতা। 'চল—অনেক রাত হয়েছে। খাবি চল।'

জয়শীলাকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করবার সুযোগ না দিয়ে বেরিয়ে গেলেন স্নেহলতা।

সিঁধেল চোরের মতো গুঁড়ি মেরে এল রাত্রি।

জয়শীলার চোখে মাসিমা যেন এক নতুন আবিষ্কার। ঘড়ির কাঁটার মতো নিয়মিত নির্ভুল মাসিমণি, মিতভাষী, সংযত। কিন্তু তাঁর চোখেও যে কোনোদিন জল দেখা দিতে পারে, কে ভেবেছিল। শুধু ইস্কুলে যাওয়া-আসা, ছাত্রী পড়ানো আর খাতা দেখা এই নীরস কর্তব্যের আড়ালে আর একটা নরম কোমল ভাবকাতর মানুষ যে লুকিয়ে থাকতে পারে, কল্পনা করা যায় নি। মাসিমণির চোখে জল! কী এমন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটতে পারে যা মাসিমার মতো শক্ত মেয়েমানুষকে কাঁদাতে পারে। (মাসিমণি, তোমার কি দুঃখ! আমার দুঃখ দিয়ে তোমার দুঃখকে স্পর্শ করতে চাই। নিজেকে বুজিয়ে রেখেছ কেন, দল মেলে দাও তোমার মনের পাপড়ির। আমি তোমার দুঃখকে দেখব, চিনব তার স্বরূপকে)

স্নেহলতা টেবিল ল্যাম্পের আলোর নিচে বই খুলে চেয়ারে ঝুঁকে পড়েছেন। বইএর কালো কালো অক্ষরের জটাজাল ভেদ করে কোনো বক্তব্যই কি হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে তাঁর। ওটা বই না হয়ে অন্য জিনিস হলেও তাকিয়ে থাকতেন তিনি। স্নেহলতা ভাবছেন। গ্রীক ভাস্করের স্ট্যাচুর মতো মনে হচ্ছে তাঁকে। নিথর, নিস্পন্দ।

ঘুম আসছে না জয়শীলার। বালিশে উপুড় হয়ে মাসিমার মূর্তির দিকে চেয়ে রয়েছে নিষ্পলকে। মাসিমার ঠোঁট দুটো কি কাঁপছে; না মনে মনে উচ্চারণ করে পড়ছেন বইএর অক্ষর।

‘মাসিমা—’

‘উঁ?’

‘শোবে না?’

‘তুই শুয়ে পড়। আমার দেরি হবে।’

‘মাসিমণি, অনেক রাত হয়েছে…’

‘ঘুমো।’

স্নেহলতা বাতিটা আরো একটু এগিয়ে নিয়ে এলেন। গৌরমুখে আলো আছড়ে-পড়ল। চোখের পাতা বোঁজা-বোঁজা, কপালের চুল লতিয়ে পড়েছে কাঁধ বেয়ে। দুই করতলের ফাঁকে চিবুক ন্যস্ত।

শিথিল দেহপাশকে বিছানা থেকে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল জয়শীলা। অবিন্যস্ত শাড়িটাকে কোনো মতে জড়িয়ে নিল গায়ে। নিঃশব্দ পায়ে মাসিমার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। ঝুলে-পড়া চুলগুলো নিয়ে বিনুনি পাকাতে-পাকাতে আদুরে গলায় ডাকল জয়শীলা।

'কি বই পড়ছ মাসিমণি ?'

'সাইকলজি অব এডুকেশন !'

'ছাই বই ! এখন আর পড়তে হবে না। মাসি—'

'উঁ ?'

'কি ভাবছ তুমি ?'

'কে বললে ভাবছি—' বিশীর্ণ হাসলেন স্নেহলতা।

'মাসিমণি—'

'বল—'

'তুমি কাঁদলে কেন মাসিমণি ?'

'বড্ড মাথা ধরেছিল কিনা !'

'মাসিমণি—'

'কি বল ?'

'বীরেশ্বরবাবু তোমার কে হন্ ?'

স্নেহলতা নিস্পন্দ পুতুলের মতো শক্ত হয়ে বসে রইলেন।

পিছন থেকে জয়শীলা গলা জড়িয়ে ধরেছে, স্নেহলতার কাঁধে ওর মুখ।

'মাসিমণি—'

'উঁ ?'

'উনি তোমার কে হন ?'

বুক চেপে শ্বাস রোধ করে ফিশফিশ গলায় বললেন স্নেহলতা : 'তোর মেসোমশায়…'

জয়শীলার হাত দুটো স্নেহলতার গলায় হঠাৎ সজীবতা হারিয়ে স্থির হয়ে রইল। স্নেহলতার মনে হল যেন দম বন্ধ হয়ে যাবে।

'ছাড় ছাড়—দম বন্ধ করে মারবি নাকি।'

'মাসিমা তোমার বিয়ে হয়েছে !' জয়শীলা শান্ত, নির্বেদ।

'হয়েছিল। কিন্তু…অনেক রাত হয়েছে। লক্ষ্মীটি ঘুমোতে যা।'

'মাসিমণি, তুমি আমাকে এতদিন বলোনি কেন ?'

স্নেহলতা বললেন, 'কি করে বলব রে ? যা আমি নিজে বিশ্বাস করিনে, স্বীকার করিনে…' দেওদার পাতার মতো কাঁপল তাঁর গলার স্বর।

'মাসিমা, চলো শোবে চলো—শুয়ে-শুয়ে তোমার কথা শুনব।'

রাত্রি। রাত্রির কী কোনো অবয়ব আছে, ভাষা আছে। সুষুপ্ত রাত্রি আকাশে তারার রুদ্রাক্ষ মালায় মন্ত্র জপছে।

আর পাশাপাশি দুজনে একই বিছানায় শুয়ে যেন রাত্রির ওই ধ্যানী-মূর্তির গাম্ভীর্য উপলব্ধি করছে। একজন বক্তা অন্যজন মৌন শ্রোতা।

গলির মোড়ে কোথায় একটা ট্যাক্সি ব্রেক কষে বিকট আওয়াজে থামল। লোহাপট্টির কালোয়াররা ঘুমছাড়া গলায় কোরাস সংগীত ধরেছে।

স্নেহলতার কণ্ঠস্বর অনেক—অনেক কান্নার সমুদ্র পার-হয়ে-আসা। ঢেউ, ঢেউ-এর পরে ঢেউ। লোনা-লোনা।

জয়শীলার সমগ্র সত্তা আহত পাঙাশে। ব্যথাটাকে ছোঁবার জন্যে ওর আঙুলগুলো কখনো স্নেহলতার নরম চুলে, কাঁধে, বাহুমূলে। (মাসিমণি, তোমার শরীরের কোথায় এতদিন এই ব্যথা গোপন করে রেখেছিলে। এই তো তোমার চুল ছুঁচ্ছি, তোমার কাঁধ, তোমার গলা, চিবুক—এদেরই অন্তরালে কি কোথাও অব্যক্ত হয়ে ঘুমিয়েছিল তোমার ব্যথা। নিবোনো দীপের মতো, তারপর কাঠি দিয়ে কে উসকে দিল বাতি। সেই আলোতে তোমার মনের পুরী ঝলমল করে উঠল। দেখলাম তোমাকে, তোমার আপনকে : এত আগুন তোমার মধ্যে কি করে এতদিন প্রশ্রয় পেল! এত পুড়েছ-ঝুড়েছ তুমি! বাইরে থেকে কোনো আঁচড় লাগেনি তোমার গায়ে।···না-তোমার মুখে চোখে না অন্য কোথাও, বাইরে থেকে কোনো কিছুই ধরবার উপায় নেই!···মাসিমণি, জীবন কি শুধু দুঃখ, সুখের মুহূর্তগুলি বুঝি কেবল আলেয়ার মতো চোখ ধাঁধায়। জীবনকে চিনতে হলে দুঃখকে বুঝতে হবে, যুঝতে হবে। তারপর—কবে, কোন্‌দিন দুঃখের সঙ্গে যুঝতে-যুঝতে আমরা চিরকালের মতো সুখী হব! মাসিমণি, আমরা সেই দুঃখের দৈত্যকে গলা টিপে মারব···)

একরাশ আলোর উদ্ভাসে মহানগরীর বুকে সন্ধ্যা নেমেছে। পথিক কণ্ঠের চিৎকার, ফেরিওলার ব্যস্ত হাঁকডাক। যন্ত্র আর জীবনের উর্ধ্বশ্বাস প্রতিযোগিতা।

ট্রাম স্টপে হতাশ হয়ে অপেক্ষা করছিল জয়শীলা। আপিস ফেরত কেরানিকুলের কল্যাণে ট্রাম-বাসে পা দেবার জায়গা নেই।

ওয়াই. এম. সি এর সামনে দাঁড়িয়ে মন কেমন উদাস হবার প্রেরণা

পায়। ওয়াই. এম. সিএ তেমনি আছে, তেমনি কলেজ স্ট্রিটের জন কোলাহল, কিন্তু সেদিনের মন আর নেই। নিবিড় জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে কেমন নিঃসঙ্গ আর ভীত মনে হল জয়শীলার। বি. এ. পরীক্ষার হলে প্রথম দিনের শক্ত প্রশ্ন পেয়েও এত ভয়-ভয় লাগেনি। আজ এই সন্ধ্যার আকাশের তলায় নতুন করে মনে হল জয়শীলারঃ জীবন বস্তুটি অত্যন্ত গুরুভার। একটানা, একঘেয়ে পথ। সে পথ নির্জন, দুঃসহ। কিন্তু, কেন হঠাৎ এমন মনে হল! স্পোর্টসে প্রাইজ পাওয়া মেয়ে, নির্ভয়, তেজী। তবে কি, তবে কি স্বাধীনতাবোধ, নিজের উপর প্রত্যয়ই হারিয়ে ফেলেছে।

হাহা করা হাওয়াতেও ঘাম জমে কপালে।

যত সহজে দেবপ্রিয়কে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছিল, বাস্তব ক্ষেত্রে সেটা যে কত কষ্টকর, আজ বুঝতে পারল জয়শীলা। কিন্তু···কই, দেবপ্রিয়ের গোটা চেহারাটা তো কিছুতেই মনে আনতে পারছে না। দেবপ্রিয় যেন একটা অনুভব, অনুভূতির মধ্যে তার বাসা। ভালোলাগা আর বেদনার স্মৃতি। আকাশে মেঘবৃষ্টিরোদের খেলা।

স্বপ্নজাল ছিঁড়ে গেল।

পাশে দাঁড়িয়ে সহাস্য নির্বানীতোষ।

'এখানে দাঁড়িয়ে কি করছেন?'

সম্বিত ফিরে পেল জয়শীলা। বোধকরি ভরসাও।

বললে, 'ট্র্যাম-বাসের স্ট্যাটিকটিকস্ নিচ্ছি। দেখুন না কী অবস্থা।'

'এখন ট্র্যাম-বাসে উঠতে পারবেন ভরসা কম।' নির্বানীতোষ হাসল।

'কি করি বলুন তো?' ভ্যানিটি ব্যাগের স্ট্র্যাপটা টান টান করতে করতে বললে জয়শীলা।

'অপেক্ষা করুন।'

'এ যে শবরীর অপেক্ষা!' কৌতুক করবার লোভ সামলাতে পারল না জয়শীলা।

নির্বানীতোষ জিগ্যেস করলঃ 'শবরীটা কে?'

জয়শীলা বললে, 'পেসেণ্ট হয়ে আপনার চেম্বারে সে কোনোদিন যাবে না। অতএব দরকার নেই শবরীর খোঁজে।'

নির্বানীতোষ হাসল। 'দরকারটা যে কখন কোথা থেকে লাফ দিয়ে পড়ে কেউ জানে না জয়শীলা।'

ওর গাঢ়স্বরে বিস্মিত হয়ে জবাব দিল জয়শীলাঃ 'তাই নাকি?'

নির্বানীতোষ বললে, 'মিরাকলে আপনি বিশ্বাস করেন না, আমি করি। এই দেখুন না কদিন থেকে ভাবছিলাম আপনার সঙ্গে দেখা হলে মন্দ হত না। কে জানত : আজকে এই সময়ে অভাবিত ভাবে দেখা হয়ে যাবে।'

জয়শীলা বললে, 'হঠাৎ আমার সঙ্গে কি দরকার পড়ল আপনার? আর দরকারটা গুরুতর হলে আমাদের বাড়িতেই তো যেতে পারতেন।'

নির্বানীতোষ হেসে বললে, 'আপনার নিমন্ত্রণ মনে রাখব। কিন্তু, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলার অসুবিধে অনেক। যদি আপত্তি না থাকে—চলুন না দু'কাপ চা খাওয়া যাক।'

নির্বানীতোষের প্রস্তাবটা আপত্তিকর কিনা, ভাবতে সময় নিল জয়শীলার। শাশ্বত নারীর চোখে পুরুষের অন্তরাত্মা দর্পণের মতো প্রতিফলিত হয়, আর সে আয়নায় পাশের মানুষটির স্বরূপকে চিনে নিতে ভুল হল না তার। নির্বানীতোষের লোভ আছে, লোভের স্পর্ধার সীমাও জয়শীলার জানা। কেন জানি, নির্বানীতোষের এই উৎসাহের প্রতি তারও গোপন প্রশ্রয় ছিল।

মুখে বললে, 'চায়ের প্রস্তাবটা উপলক্ষ্য, না সত্যিই কিছু দরকার আছে আপনার?'

নির্বানীতোষ হাসল। 'চা খাওয়াটাও তো একটা প্রয়োজন। চলুন—'

ওয়াই এম সি-এর পাবলিক রেস্টুরেণ্টের উঁচু সিঁড়িতে উঠতে উঠতে জয়শীলাও হাসল। বললে, 'এ আপনার বানানো প্রয়োজন।'

ক্যাবিনের পর্দাটা টেনে দিতে-দিতে নির্বানীতোষ বুদ্ধিমানের গলায় বললে, 'আমাদের বেশির ভাগ প্রয়োজনই তো বানানো, জয়শীলা।'

টেবিলে দুজনে মুখোমুখি। মাথার ওপরে ফ্যানটা ছেড়ে দিয়ে গেল ওয়েটার। বায়ুর প্রাবল্যে পর্দাটা সমুদ্রের ফেনার মতো ফুলে-ফুলে উঠতে লাগল।

অর্ডার নিয়ে ওয়েটার চলে গেল।

নির্বানীতোষ প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে জিভ দিয়ে সেটাকে ভিজিয়ে নিয়ে ঠোঁটে লাগিয়ে অগ্নিসংযোগ করল। কিছুক্ষণ সিগারেটের প্রতি তার মনোযোগটা ঘন হয়ে রইল।

মনের ভেতরটা আবার কেমন অন্যমনস্ক হয়ে ওঠে জয়শীলার। সেই রেস্টুরেণ্ট, সেই ক্যাবিন, সেই উর্দি-পরা বেয়ারা, কিন্তু সেদিনের সেই মন আর নেই। এমনি এই পর্দা-টানা ক্যাবিনের স্নিগ্ধ আলোর তলায় কতদিন পাশাপাশি, মুখোমুখি বসেছে দুজনে। শুধু হাত দিয়ে খাবার গেলেনি,

অষ্টাঙ্গ দিয়ে সন্ধ্যাগুলোকে কাজে লাগিয়েছে। দেবপ্রিয় আর জয়শীলা। দেবপ্রিয়ের আনত মুখ, ঝুলে পড়া চুলে বাতাসের দুষ্টুমি, মাঝে মাঝে নিটোল চোখ দুটো তুলে-ধরা, যেখানে দুপুরের বটগাছের শান্ত নিশ্চুপ ছায়ার প্রতিবিম্ব। কথা, কথা, আর কথা। কথাগুলি দিনে-কানা বাদুড়ের মতো কেবল গাছের ডালেডালেই লুফোলুফি করত, সারা ক্যাবিনটা ভরে থাকত কথার সৌরভে। (দেবপ্রিয়, তুমি এখন কী ভাবছ ?)

বেয়ারা ডিম আর টোস্ট টেবিলে রাখতে চমক ফিরল জয়শীলার। নির্বানীতোষের উপর চোখ পড়তে লজ্জারুণ হয়ে উঠল মুখ। আর লজ্জাটা কাটাবার জন্যেই বেশি করে ঝুঁকে পড়ল টেবিলের সামনে।

নির্বানীতোষ হাসল। বললে, 'কি ভাবছেন ?'

জয়শীলাও হাসল। 'কই, না তো।'

'এতক্ষণ দেখছিলাম আপনার ভাবুক চেহারাটা। আপনি কবিতা লেখেন ?'

'এত বড় দুর্নাম আমার নেই।'

'তবে লিখুন।'

'কেন ? আপনি পাবলিশার হবেন ?' হাসল জয়শীলা।

নির্বানীতোষ টোস্টের গায়ে ডিম মাখাতে-মাখাতে বললে, 'আগেই তো বলেছি আপনাকে, আমি মিরাকলে বিশ্বাসী।'

'যদি কোনোদিন কবিতা লিখি আপনাকে মনে করব।'

'যে-কোনো অজুহাতে, মনে করলেই আমি খুশি হব।' নির্বানীতোষের গলার স্বর আবার গাঢ় হয়ে এল।

'কী বললেন ?' নির্বানীতোষের কণ্ঠস্বর কেমন খট করে বাজল জয়শীলার কানে। একটু সামলে নিয়ে ফের বললে, 'আপনি তো সেদিন বলেছেন : লাশ-কাটা ঘরে মরা ঘেঁটেও মানুষের মন বলে বস্তুটি কোথায় থাকে আবিষ্কার করতে পারেন নি !'

নির্বানীতোষ টোস্টটা মুখ থেকে নামিয়ে উত্তর দিল : 'ব্যাপারটা কি জানেন, মানুষকে ওইভাবে যাচাই করা আমাদের প্রফেশান, ব্যবসাও বলতে পারেন। কিন্তু…'

'কিন্তু কি ?' জয়শীলার কৌতুক-ঘন চোখ।

নির্বানীতোষ চিন্তিত গলায় বললে, 'একথাও তো ঠিক মন বস্তুটি থাক-বা-না-থাক, শারীরধর্মকে অস্বীকার করবার উপায় নেই।'

ওর কথার ভেতরে কী একটা মোচড় ছিল, তাকে সহজ করবার জন্যে

জয়শীলা তাড়াতাড়ি উত্তর দিল: 'কি জানি, এনাটমিতে আমার জ্ঞান কম।...' তারপর কাঁধের কাছে ঝুলেপড়া বেনীটা পিঠের দিকে সরিয়ে বললে, 'আচ্ছা: আপনি সন্ধ্যের দিকে চেম্বারে কটায় বসেন?'

নির্বানীতোষ নতুন সিগারেটটা ঠোঁটে চেপে চায়ের কাপটা টেনে নিল। বললে, 'কথা যখন উঠেছে শেষ করাই ভালো। দেখুন নেহাতই মধ্যবিত্ত মানুষ, উচ্চাকাংখা হয়তো আছে, সেটা বেশি রোজকারের। ভালোভাবে বাস করা আর কি। আরো একটা ইচ্ছা আছে—জানিনা সেটা আপনাকে বলা শোভন হবে কিনা!' দুচোখে একরাশ তৃষ্ণা জ্বালিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল জয়শীলার মুখের দিকে।

জয়শীলা চোখ নামাল। শান্ত গলায় বললে, 'যদি অশোভন মনে করেন নাইবা বললেন।'

'কিন্তু...বলা যে আমার চাই-ই জয়শীলা।'

উশখুশ করতে লাগল জয়শীলা। মাথার উপরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ফ্যান ঘুরছে, ঢেউয়ের মতে পর্দাটা ফুলছে। ওয়েটার দেরি করছে কেন বিল আনতে। কটা বাজল? ট্র্যামে-বাসে কি এখনো ভিড়! নির্বানীতোষ অমন করে চেয়ে আছে কেন তার দিকে—এত স্পষ্ট, এত নির্দ্বিধ! কী বলতে চায় সে। কিন্তু, না-বললেই বা কী ক্ষতি হয় এমন। বলবার জন্যে আয়োজন চাই, প্রস্তুতি চাই। নইলে, গম্ভীর কথাও প্রস্তুতির অভাবে কী-অসম্ভব ঠাট্টার মতো কানে বাজে, সে জ্ঞান কি নেই নির্বানীতোষের! যেন সিনেমার টিকিট কেটে নিয়ে এসে বলছে: চলো সিনেমায় যাই।

না। নির্বানীতোষকে বড় বেশি প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেছে সে। বোধহয় চায়ের নিমন্ত্রণ গ্রহণ না-করলেই ভালো হত।

ওয়েটার পর্দা ঠেলে ঢুকল।

'দিদিমণি, আর কিছু দেবো? পুডিঙ—?'

'না। বিল নিয়ে এস।'

নির্বানীতোষ সিগারেটের ছাই এ্যাশট্রেতে ঝাড়তে ঝাড়তে বললে, 'অবশ্য আমি যা বলতে চাচ্ছি আপনি নিশ্চয়ই বুঝেছেন...'

জয়শীলা বললে, 'না...'

'তাহলে স্পষ্ট করেই বলি—আমাকে বিয়ে করতে তোমার আপত্তি আছে কী?'

জয়শীলা একমুহূর্তে পাথরের মতো স্থির বসে রইল। কিন্তু, কী আশ্চর্য,

ওর প্রস্তাবে যতটা আঘাত পাবার কথা, তার কিছুই পেল না তো! নির্বানীতোষ স্পষ্ট করে না-বললেও ওর ইঙ্গিত কী আর আগে বোঝেনি সে! ক্যাবিনে ঢোকবার পূর্ব মুহূর্তেও ওর চোখমুখ দেখে বুঝতে বাকি ছিল না জয়শীলার ঃ কী বলতে পারে, কতদূর যেতে পারে সে। তবু···এত জেনেও, মেনে নিয়েও সে কেন চায়ের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করল! নির্বানীতোষ তো তার হাত ধরে টেনে আনেনি, নাকি নিজের মনেই কোথাও ঝড়েওড়া বটগাছের বীজের মতো দুর্বলতা বাসা বেঁধেছিল। ছি ছি ছি! আরো দশটা মেয়ের সঙ্গে তাহলে তার তফাৎ কোথায়।

ওয়েটারের বিল চুকিয়ে দিতেই জয়শীলা ঘোর-ঘোর আচ্ছন্নতা থেকে বলে উঠল ঃ 'চলুন। উঠি।'

'আমার উত্তর?'

নির্বানীতোষের হাতের চাপে ঘামে আর লজ্জায় ভিজছিল জয়শীলার হাত। হঠাৎ প্রাণপণ শক্তিতে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। আর নির্বানীতোষকে কিছু বলতে দেবার আগেই চেষ্টা করে ধীর পায়ে বেরিয়ে এল ক্যাবিন থেকে।

নির্বানীতোষ এর পর কখন বেরিয়ে এসেছে, কখন নিঃশব্দে পাশে দাঁড়িয়েছে, খেয়াল নেই। ট্র্যামে কোনো কথা নয়। হেদোর মোড়ে নেমে দ্রুত পায়ে বাড়ির দিকে। আর নির্বানীতোষ বোধহয় তার চেম্বারে গিয়ে ঢুকল।

বাড়ি ফিরে বাথরুমে ঢুকে ঘটির পর ঘটি জল ঢেলেও দেহের জ্বলুনি যেন কিছুতেই কমে না। সাবান ঘসে ঘসেও তার হাতের উপরে লেগে-থাকা নির্বানীতোষের স্পর্শের গন্ধটা যেন দূর হতে চায় না। অনেকক্ষণ শাওয়ার বাথের ঝরঝরানির নিচে শরীর ভিজিয়ে দাঁড়িয়ে রইল জয়শীলা। চুল ভিজোবে না ভেবেও চুল ভিজল, সর্বাংগে জলের দৌরাত্ম্য। দেয়ালে ঝুলোনো আয়নায় প্রতিবিম্বিত শরীরের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে কিছু খুঁজে পাবার চেষ্টা করল সে। এই মুহূর্তে আয়নায় প্রতিফলিত মূর্তিটা তার নিজের মনে হল না। এ যেন শরীরসচেতন অন্য কোনো নারী।

নির্বানীতোষ বলে ঃ শারীরধর্ম! এই তো অপলকে তাকিয়ে রয়েছে শরীরের দিকে। কী ধর্ম এই শরীরের! নির্বানীতোষ ছুরি নিয়ে যদি ফালি-ফালি করে কাটে ঃ কী মিলবে খণ্ড বিছিন্ন শরীরের মধ্যে। কিছু হাড় আর মাংস, জমাট রক্ত, শিরা প্রশিরা।

নির্বানীতোষের প্রস্তাব এখনো কানে বাজছে। 'আমাকে বিয়ে করতে

তোমার আপত্তি আছে!' বিয়ের মতো বস্তুটা কি কেবল আপত্তি নিরাপত্তির দোলায় নিষ্পন্ন! শুধু হাঁ আর না! এত স্থূলভাবে অন্যের হাতে নিজের জীবনকে তুলে দেবার কথা ভাবতে পারেনা জয়শীলা। নির্বানীতোষের কি ধারণা হাতে চাপ দিলেই মনে চাপ দেওয়া হয়!

কিন্তু···এমন প্রস্তাব করল কেন নির্বানীতোষ? কি দেখেছে, কি পেয়েছে তার মধ্যে। শরীর! শরীরের ভেলা বেঁধে কি সংসার সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া যায়। যদি না মন মনকে ছোঁয়! শরীর নিত্য ব্যবহারে পুরানো, মন নিত্য ব্যবহারে চির নবীন।

আরো কতক্ষণ অমনভাবে ভেবে চলত জয়শীলা, বলা যায় না। স্নেহলতার তাড়ায় চমক ফিরল। শরীরের লজ্জা ঢাকতে তাড়াতাড়ি তোয়ালে দিয়ে গা মুছল, শাড়ি জামা পরে বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে।

স্নেহলতা বললেন, 'আজকে তোকে বেশ ফ্রেস দেখাচ্ছে।'

অকারণ লজ্জায় ঝংকার দিয়ে উঠল জয়শীলা: 'যাও—'

তারপর পড়ার টেবিলে বই খুলে বসল। কতক্ষণ নিমগ্ন হয়ে রইল বইএর সমুদ্রে। আবার পড়ার ফাঁকে মন উধাও। দেবপ্রিয়, দেবপ্রিয় কী করছে এখন? স্মৃতি, স্মৃতির টুকরো, স্মরণের সমুদ্রে অন্যমনে ঝিনুক কুড়োনো। কিন্তু কই, তেমন করে' দেবপ্রিয়ের স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরতে পারছে না তো! অন্য কার মুখ ভাসছে? নির্বানীতোষ! ব্যাকব্রাস চুল, যত্নেছাঁটা গোঁফ আর স্মার্ট হবার কী দুর্মর প্রচেষ্টা। তার হাতের ওপর ওর হাতের স্পর্শের মুদ্রণ। নিবানীতোষের হাত আর মুখ এক কথা বলে। 'বিয়ে করতে আপত্তি আছে কি!'

না। আর ভাববে না জয়শীলা।

কিছুতেই না।

রাত্রি আসে অনেক সমস্যার জাহাজ বোঝাই করে।

সে মাল খালাশ করতে সারাদিনের কাজের পর গাজোড়া ক্লান্তি নামে স্নেহলতার। আজকাল ক্লান্তিটা যেন বেশি করে লাগছে। প্রায় মাথা ধরে, চোখ টনটন করে, আর দোতলার সিঁড়ি ডিঙোতে হাঁপও ধরে।

বয়েস বাড়ছে। আর পিছন ফিরে জীবনকে মনে হচ্ছে শীতের বালিঢালা

শীর্ণ নদী। ধু ধু বালিচর। বকের পাখায় গোধুলি নামে, মন্থর স্রোতে নদীর জলে মুমূর্ষু কাতরানি।

বয়েস হলে কি ঘুমও কমে আসে। বিছানায় শুয়ে ছটফট করেন স্নেহলতা। কপালের অস্পষ্ট নীল শিরার মতো চিন্তাগুলি কিলবিল করে ওঠে মস্তিষ্কে।

বীরেশ্বর আজো এসেছিল দেখা করতে। একই কথা, একই প্রস্তাব। বীরেশ্বর আজ কথা বলেছে কম, অপেক্ষা করেছে বেশি। কিন্তু, অপেক্ষা ব্যর্থ হয়েছে, সমস্যা এক বিন্দুও মীমাংসার দিকে এগোয়নি। স্পষ্টই বলেছেন স্নেহলতা: যা হয়না, হতে পারে না, তা নিয়ে মিছে তোলপাড় করার কোনো মানে নেই বীরেশ্বরের। আরো বছর কয়েক আগে এলেও হয়তো প্রস্তাবটা গভীরভাবে বিচার করে দেখতে পারতেন স্নেহলতা। আজ না-জীবনকে, না-মনকে পিছু হাঁটিয়ে ফিরিয়ে নেওয়া যায়। বীরেশ্বর একদিন তার স্বামী ছিল, কিন্তু আজ আর সে তার কাছে কোনো ব্যক্তিপুরুষ নয়, একটা অভিজ্ঞতা। যৌবনের তালকানা উচ্ছ্বাসের পরিনাম আর পরিণতি। যৌবনের একটা প্রশ্নের জবাব উত্তরযৌবনে খোঁজার মতো হাস্যকর আর কিছু নেই। বয়েস থেমে থাকেনি, অভিজ্ঞতা এক পায়ে ঠায় দাঁড়িয়ে নেই, জটিলতা বেড়েছে বয়েসের, অভিজ্ঞতার। পরিনীতা তরুণীর স্তর থেকে শিক্ষয়িত্রীর উত্তরণের ইতিহাস একদিনের নয়, অনেক—অনেক দীর্ঘশ্বাস আর ব্যর্থ কান্নার উৎপীড়ন। দেহ মনের স্বভাব-ধর্মকে ভেঙেচুরে নতুন মন, নতুন দেহবোধ গড়ে তুলতে হয়েছে। আর এই সাধনায় তিলে তিলে ক্ষয় হয়েছে বীরেশ্বরের অস্তিত্ব। তারপর একযুগ পরে মৃত সম্পর্কের দাবি নিয়ে দখল জানাতে এসেছে বীরেশ্বর। অংক কষে মেয়েদের মনকে চেনবার চেষ্টা বাতুলতা।

বীরেশ্বর চলে গেছে। মুখ কালো করে, ওর দীর্ঘ শরীরটা বেরোবার সময় কেমন কুঁজো দেখাচ্ছিল। কোনোদিন আর আসবে না, এই জীবনে আর দেখা হবে কিনা, কে জানে। যদিও দেখা না হলেই ভালো হয়। শুধু সে যেন ভালো থাকে, সুখে থাকে। আর মাঝে মাঝে খবরটা পেতেও খুব খারাপ লাগবে না।

কিন্তু···

আবার মনটা কেমন চুপসে যায়। পেছনের জীবনটা দীর্ঘ, সামনের পথটাও কম দীর্ঘ নয়। এই দীর্ঘ পথপরিক্রমায় আর কোনোদিনও কী

বীরেশ্বরের সঙ্গে দেখা হবে না! যেদিন শনের নুড়ির মতো শাদা চুলগুলো মাথায় এঁটে বসবে, চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ, বুক ধড়ফড়, আর শ্বাসটানতে কষ্ট হবে সেদিন—সেদিন কে দেখবে তাকে, বুড়ো বয়েসে কার ওপর নির্ভর করবে, কোথায় মিলবে আশ্রয়!

মাথার ভেতরটায় আবার গোলমাল হয়ে যায়। একটা শীতার্ত শূন্যতা হঠাৎ পাক দিয়ে যেন জড়িয়ে ধরে।

আশ্রয় আশ্রয় আশ্রয়। মেয়েদের কি এমন একটা বয়েস আসে যখন তাদের আশ্রয় দরকার।

বীরেশ্বর আর ফিরবে না। আর কোনোদিন দেখা হবে না!

এক দলা মাংসপিণ্ডের মতো কী-একটা বুক ঠেলে উঠতে চাইল।

বেলতলা গার্ল ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রীর চোখে আজ অনেকদিন পরে জল এল।

বাইরে থেকে এলোমেলো ধুলোবালির ঝড় এড়াবার জন্যে উটপাখির মতো পালকের তলায় আশ্রয় নিতে চেষ্টা করল জয়শীলা। কয়েকটা হপ্তা বই নিয়ে মশগুল রইল, য়ুনিভার্সিটি গেল মানিকতলা দিয়ে ঘুরে।

বাইরের ঝড় থেকে পরিত্রাণ মিলল। কিন্তু ভেতরের ঝড়, সে তো সময় আর অবকাশ বুঝে ঠেলে-ঠেলে উঠতে চায় চেতনার রাজ্যে।

বিয়েটা তার কাছে অবশ্য কোনো সমস্যা নয়। কিন্তু, ওর ভেতরে যেন মুক্তির নিশ্বাস আছে। মামার ছকে-ফেলা জীবনের বন্ধনী থেকে বেরিয়ে-আসা, কেরিয়ার তৈরি-করবার যান্ত্রিক অভিলাষ থেকে পলায়ন। মামাবাবুর সংকল্পকে প্রতিবাদ করতে গিয়ে দিন দিন তাঁরই প্রদর্শিত পথের সে নিরীহ শিকার হয়ে পড়ছে। মামাবাবুর তার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত নিরুদ্‌বিগ্ন মুখ তাকে যেন দ্বিগুণ লজ্জা দেয়। সমস্ত ব্যাপারটাকেই তিনি ভেবেছেন ছেলেমানুষি, যৌবনের তরলতা। যৌবন সম্পর্কে বার্ধক্যের এই চিরাচরিত ধারণা বারবার যৌবনকেই ধিকৃকৃত করেছে। দেবপ্রিয়ের সাহায্যে মামার ধারণার বিরুদ্ধে মূর্তিমতী প্রতিবাদ হতে পারত সে। কিন্তু···দেবপ্রিয়ের দুর্বলতা, কাপুরুষতা তাকে সংকল্পচ্যুত করল। দেবপ্রিয় কি সত্যি পারত না তার পারিবারিক অনুশাসন ভাঙতে, শুধু কি সংসারকে বাঁচাবার জন্যেই অমন করেছিল সে। নাকি, নিজেও বাঁচতে চেয়েছিল, বাঁচতে চেয়েছিল জয়শীলার হাত থেকে। প্রেমের দুচক্ষু দেবতা, এক চোখে তার আকর্ষণ, অন্য চোখে বিকর্ষণ। আজ

যেন সন্দেহ হচ্ছেঃ দেবপ্রিয় কি সত্যি ভালোবাসত! যাকে উচ্ছ্বাসবিহীন গভীরতা বোধ হত তা কি নিস্পৃহ ঔদাসীন্য মাত্র নয়! প্রেমের ঐশ্বর্য কি সত্যিই ছিল দেবপ্রিয়ের অন্তরে?

যত ভাববে না বলে মনে করে ভাবনাগুলি একই বৃত্তে ঘুরতে থাকে। আর ভাবতে-ভাবতে সব কিছুই কেমন তালগোল পাকিয়ে যায়। দেবপ্রিয় সরে গিয়ে নির্বানীতোষের তৃষ্ণার্ত মুখ ঝলমল করতে থাকে। কী যেন প্রস্তাবটা? বিয়ে করতে আপত্তি আছে কী! পুরানো উপমাটাই আবার মনে পড়লঃ যেন টিকিট কেটে নিয়ে এসে বলছে নির্বানীতোষঃ চলো— সিনেমায় যাবে কি? রাগতে গিয়ে হাসি পায় জয়শীলার। করুণামিশ্রিত অনুকম্পা। আর, কোথায় যেন একটা জোরও পায় সে। বদ্ধঘরে দমকা হাওয়ার মতো এক টুকরো আশ্বাস, আর স্বস্তি। রাগ আর করুণা সবকিছু মিলেমিশে গিয়ে এদের অতীত মেয়েদের মনের যে স্বার্থপর প্রত্যন্তপ্রদেশ সেখানে যেন অকারণ পুলক জাগে। শুধু পুলক নয় বিষয়বুদ্ধির লোভানিও সেখানে রয়েছে। আর গর্বও, যে কোনো পুরুষ তাকে আজো কাংখিত মনে করে।

ভাবনাগুলি পরিষ্কার করে যাচাই করতে গিয়ে নিজের প্রতিফলিত স্বরূপে এবার দস্তুরমতো রাঙিয়ে ওঠে জয়শীলা। ছি ছি ছি। কী ভাবছে সে? আরও দশজন মেয়েদের থেকে আলাদা হতে গিয়ে তাদেরই ভাবনার খাতে যে চিন্তাগুলি প্রবাহিত হচ্ছে। দেবপ্রিয় নয়, নির্বানীতোষ নয়, সেখানে তারই মনের বিচিত্রবর্ণ ছায়া। আর সে ছায়া যেমন স্বার্থপর তেমনি বৈষয়িক। দেবপ্রিয়ের জন্যে নয়, এখন বেশি করে নিজের জন্যেই যেন দুঃখ হচ্ছে। এতদিন উচ্ছ্বাস আর আবেগের ফেনা সরিয়ে নিজের মনের সত্যকার পরিচয় নিতে পারেনি।

না। আর প্রশ্রয় দেবে না নিজেকে। যা হয় হোক, মামাবাবুর দেখানো পথেই নির্বিবাদে পা চালিয়ে দেবে।

কিন্তু, মানুষ ভাবে এক, হয় অন্য।

জয়শীলার জীবনে আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটল। সে-দুর্ঘটনার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার শেষ পুঁজিটুকুও খুইয়ে বসল সে।

সেদিন য়ুনিভার্সিটি থেকে বাড়িতে ফিরতেই বিজয়কেতু ডাকলেন।

'শীলা তোর চিঠি—'

চিঠি! চিঠি আসাটা অবশ্য আশ্চর্যজনক নয়, কিন্তু তার এই নিঃসঙ্গ নির্বান্ধব জীবনে চিঠি আসাটা আকস্মিক বৈকি।

ঘরে ফিরে টেবিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল জয়শীলা। খামখানা অনেকক্ষণ বাতির আলোকের সামনে ধরে রাখল। কী আশ্চর্য, হাতের লেখাও অপরিচিত মনে হয় না। কিন্তু, সে কি সম্ভব! এতদিন পরে সমস্ত সম্পর্ক খারিজ করে দেবপ্রিয় কি চিঠি লিখতে পারে! আর লিখলেও কী সে লিখতে পারে! এতদিন নীরবতার পরে আজ এই মুখরতার কি প্রয়োজন! হয়তো মামুলি চিঠি। কিন্তু, মামুলি সম্পর্কের রেশও তো আজ অবশিষ্ট নেই।

দেবপ্রিয় কি লিখতে পারে! কেন সে চিঠি লিখল!

চিঠি খুলবে কী, তার আগেই অসম্ভাব্য ভাবনার উর্ণনাভে জড়িয়ে পড়ল জয়শীলা।

একবার মনে করল: না-পড়েই ছিঁড়ে ফেলে চিঠিটা। জীবন থেকে যে অধ্যায়ের পাঠ চুকেবুকে গেছে তাকে পুনরায় উস্‌কে দিয়ে লাভ নেই। কিন্তু, কৌতূহল জ্বলতে লাগল মস্তিষ্কে। নিজের মনকে চোখ ঠেরে জিগ্যেস করল: ক্ষতি কী, কী লিখেছে দেখাই যাক-না। উত্তর না-দিলেই হল। তাছাড়া, কেমন আছে সে, কত সুখে আছে, নতুন স্ত্রী নিয়ে কেমন আনন্দে কাটাচ্ছে মানুষটা! মনের আঁখি ছলছল করে উঠল, বেলাশেষের রোদের সোনা ঝিলের বুকে চকচক করছে। বিষণ্ণ সুন্দর।

উত্তেজিত হবে না মনে করেও ধুকপুক বুকে খাম ছিঁড়ল জয়শীলা। শাদা কাগজের দু' পৃষ্ঠায় কয়েক ছত্র কালো-কালো অক্ষর। শুরু হয়েছে: কল্যাণীয়াসু (দেবপ্রিয় তাকে পরম-প্রীতিভাজনাসু লিখত!) প্রীতিহীন কল্যাণে তার কাজ কী! আর দেবপ্রিয়ের কল্যাণ-কামনায় জয়শীলার লাভ! মানুষটার স্পর্ধা দেখে গা রী-রী করে ওঠে আরো। যেন ঠাকুর্দার মতো হিমালয়ের চুড়োয় বসে উপদেশ দিচ্ছেন উনি! চিঠির এক পৃষ্ঠার এক বর্ণও মগজে প্রবেশ করল না জয়শীলার। কেবল চিঠির বাঁদিকে ওর ছাপানো নাম আর খেতাবের হরফগুলির উপর অনেকক্ষণ জয়শীলার দৃষ্টি আটকে রইল। দেবপ্রিয় সিদ্ধান্ত॥ অধ্যাপক॥ শান্তিনিকেতন॥ অধ্যাপক এবং শান্তি-নিকেতন এই দুটো খবরই তার জানা। কেবল সে যে চীনা সরকারের বৃত্তি পেয়ে চীনে যাচ্ছে রিসার্চ করতে—এই খবরটাই যা নতুন। কিন্তু, এ-খবরেরও তো কোনো প্রয়োজন নেই জয়শীলার। খবর-কাগজে রোজই তো এমন

খবর বেরোয়। চিঠির দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় এসে থমকে দাঁড়াল সে। ট্র্যামে উঠতে গিয়ে হঠাৎ কোনো পুরুষের নির্লজ্জ বর্বরতায় যেমন মুখ লাল হয়ে ওঠে তেমনি অস্বাভাবিক রক্তবর্ণ হয়ে উঠল তার মুখ, নিশ্বাস বইতে লাগল দ্রুত, বুকটা উত্তেজনায় ঠেলে-ঠেলে উঠতে লাগল। ঠোঁট কামড়ে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরক ক্রোধকে রোধ করতে গিয়ে তাকে আরো মরিয়া দেখাল। হাতের আঙুলগুলো থেঁতলানো ব্যথায় টনটন করতে লাগল।

চিঠিখানা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সশব্দে চেয়ার সরিয়ে ঘরময় পায়চারী করতে লাগল সে। এখনি, এই মুহূর্তে একটা ভীষণ কিছু করতে ইচ্ছে জাগল। তার ওই চেহারা দেখে যে কেউ ভাবতে পারত একটা ক্রুদ্ধ মার্জার শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত।

আবার এগিয়ে গেল টেবিলের সামনে। থাবা মেরে চিঠিখানা মুঠোয় তুলে নিল। যেন আগুনের লেলিহান শিখা। হাত পুড়ে যায়, মন পুড়ে যায়, সারা দেহে প্রদাহ।

আবার মেলে ধরল চিঠিখানা চোখের সামনে। অক্ষরগুলি যেন কুৎসিত দাঁত বার করে ফ্যাফ্যা করে হাসছে। নোঙরা অশুচিতায় গা ঘিনঘিন করে ওঠে জয়শীলার।

আবার পড়ল উচ্চারণ করে লাইনগুলি। 'আমি জানি গভীর রিক্ততায় অপরিসীম শূন্যতায় তোমার জীবনকে আমি ব্যর্থ করে দিয়েছি। (এত কেতাবী নবেলী কথা শান্তিনিকেতনে গিয়েই কি রপ্ত করছে দেবপ্রিয়!) তোমার জীবনের যে ক্ষতি করেছি, তার জন্যে আমার অনুশোচনার শেষ নেই (আহা, আমি ধন্য হলাম!)

না আর পড়বে না জয়শীলা। বিষের মতো উগ্রতায় ছটফট করতে লাগল। নিষ্ফল আক্রোশে জ্বলতে লাগল তার চোখ। ভণ্ড, কাপুরুষ, মিথ্যাবাদী! কী স্পর্ধা দেবপ্রিয়ের! জয়শীলার জীবনের উপর তার যেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত! যেন কী অখণ্ড প্রভাব তার জয়শীলার হৃদয়ের সাম্রাজ্যে! একটা মানুষের অবর্তমানে তার জীবন যেন মরুভূমি হয়ে গেছে! জয়শীলা ব্যর্থ হয়ে গেছে! জীবন বস্তুটি বোধহয় এত খেলো, ঠুনকো। তার মনের ঐশ্বর্যের কাছে দরিদ্র নিবীর্য দেবপ্রিয়ের এক ফার্দিং-ও মূল্য নেই। বাড়িতে একটা বেড়াল মারা গেলেও যে বেদনা জাগে, দেবপ্রিয়ের পলায়নে তার বিন্দুমাত্রও জাগেনি। ফাঁকা হাওয়ায় মূর্খের স্বর্গ রচনা করে আকাশ-কুসুম স্বপ্ন এঁকেছে দেবপ্রিয়। শূন্যের উপর ডন্ কুইকসোটের মতো লড়াই।

নিজের শক্তি সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র সম্ভ্রমজনক চেতনা থাকলে, এমন ইতরের মতো চিঠি লিখতে পারত না সে। হ্যাঁ ঃ ইতর। লক্ষ লক্ষ বার চিৎকার করে বলবে জয়শীলা ঃ কাপুরুষের চামড়ায় ঢাকা দেবপ্রিয় একটা ইতর।

সারা সন্ধ্যা থেকে রাত্রি পর্যন্ত চিঠির লাইনগুলো যেন প্রেতের মতো তাড়া করে বেড়াতে লাগল। রিক্ততা…শূন্যতা…আর অনুশোচনা। দেবানাং প্রিয় ঃ, দেবপ্রিয় কি সত্যি ওর কথাগুলির অর্থ জানে। বর্ষার মেঘ জল ঢেলেও কি রিক্ত হয়, শূন্য হয়! যে ধনী খরচ করলেও তার ঐশ্বর্যের ক্ষয় নেই! খরচ করতে তারই ভয় যার কানাকড়ি সম্বল।

দেবপ্রিয়ের চ্যালেঞ্জের জবাব নিজের জীবন দিয়েই দিতে হবে। দেখাতে হবে ওকে ছাড়াও জয়শীলা সুখী হতে পারে। দেবপ্রিয় কি ধারণা করেছে জীবন থেকে বিতাড়িত হয়ে সে অবশেষে বইএর নিশ্চিন্ত দুর্গে আশ্রয় নিয়েছে।

প্রেমের খেলায় হেরে গিয়ে কেরিয়ার তৈরির যজ্ঞে সমর্পিতপ্রাণ!

এই ভুল ধারণার অবসান ঘটানো চাই। দেবপ্রিয় ছাড়া অন্য যে কোনো পুরুষকে সঙ্গী করে সেও যে জীবনে সুখী হতে পারে, এই দৃষ্টান্ত সে তুলে ধরবে দেবপ্রিয়ের চোখের সামনে। কেরিয়ার নয়, সে সংসার রচনা করবে, পাখির বাসার মতো ছোট্ট একটি নীড়, ভালোবাসার মতো সুন্দর স্বামী, আর শিশুদেবতার হাসিভরা মুখ। সহজ, সাধারণ। কৃত্রিমতা নয়, ভণ্ডামি নয়। আর হৃদয়ের বর্ণরাগ দিয়ে রঙিন করে তুলবে ছোটো সুখ, ছোটো আশা, আর সার্থকতা!

দেবপ্রিয়ের এই চিঠি না এলে জীবনের পটভূমি থেকে সত্যই বুঝি নির্বাসিত হত সে। পিছন থেকে ধাক্কা মেরে তাকে সজ্ঞান করে তুলল দেবপ্রিয়।

সারা রাত ঘুমোতে পারল না জয়শীলা।

সকাল দুপুর বিকেল, উত্তেজনাকে সরিয়ে চিন্তাগুলি থিতোবার অবকাশ পেল না। যত গভীর ভাবে ব্যাপারটা বুঝতে চাইল জয়শীলা ততই প্রচণ্ড ক্রোধ তার মস্তিষ্ককে উত্তপ্ত করে রাখল। দেবপ্রিয়ের অপমানের বিষ তার সারা দেহে জ্বালা ধরিয়ে দিল।

চেম্বারে পা দিতেই প্রেসক্রিপশন লিখতে লিখতে মুখ তুলে নির্বাণীতোষ ইংগিতে বসতে বললে।

ধপ করে চেয়ারটায় বসে পড়ল জয়শীলা। বসতে দেরি হলে মনে হয় মাথা ঘুরে পড়ে যেত সে। দব্‌দব্‌ করছে কপালের দুপ্রান্তে শিরাদুটো, চোখ জাগরক্লান্ত। চেয়ারে হেলান দিয়ে অর্ধনিমীলিত চোখে কতক্ষণ ওভাবে বসে থাকত, বলা যায় না। ডাক্তারের আহ্বানে চেতনা ফিরে এল জয়শীলার। ধড়মড় করে অকারণেই চেয়ারে সোজা হয়ে উঠে বসল। চেম্বার খালি। যে দু'একটা রোগী ছিল, নির্বানীতোষ ওষুধ লিখে দিয়ে বিদায় করেছে। বিদায় করে কতক্ষণ যে সিগারেট ধরিয়ে জয়শীলার উদ্‌ভ্রান্ত বিশুষ্ক মুখের দিকে তাকিয়েছিল, জয়শীলা জানে না।

নির্বানীতোষই কথা বললে, 'হঠাৎ···এই সময়ে ?'

জয়শীলা বললে, 'হুঁ···আপনার এখানে আর কতক্ষণ দেরি হবে।'

বিস্মিত গলায় নির্বানীতোষ বললে, 'এখন ওঠা যায়।'

'তাহলে উঠুন। আপনার সঙ্গে কথা আছে।'

আনত মুখে কথাগুলো বললেও জয়শীলা ঠাহর করতে পারল নির্বানী-তোষের বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখের দৃষ্টি তার মুখের ওপর আটকে রয়েছে। নির্বানীতোষের কুতূহলী মনোযোগের তীব্রতার আলোকে সর্বাঙ্গ ঝিমঝিম করে উঠল জয়শীলার। এতক্ষণ পর মনে হল অত্যন্ত দুঃসাহসিক অভিযান করে বসেছে সে। যদি শক্তি থাকত তাহলে এই মুহূর্তে ছুটে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করত জয়শীলা। কিন্তু, না। পা দুটো যেন ভারি আর পেরেক দিয়ে আটকে গেছে ঘরের ফ্লোরের সঙ্গে। আর হৃদয়টাও অত্যন্ত গুরুভার মনে হল।

নির্বানীতোষের সঙ্গে রাস্তায় নেমে এল জয়শীলা। আকাশে অজস্র তারা আর হাওয়ার গন্ধ।

চলন্ত ট্যাক্সিটা দাঁড় করাল নির্বানীতোষ। আর তাকে কিছু ভেবে উঠবার সুযোগ না দিয়েই হাত ধরে গাড়িতে তুলে দিয়ে নির্বানীতোষ উঠে দরজা বন্ধ করে দিল।

গাড়ি ছুটল বিডন স্ট্রিট। চিত্তরঞ্জন এভিন্যু। সোজা এসপ্লানেডের দিকে।

ঘামছে জয়শীলা। জামার তলায় বডিসটা বোধহয় ভিজে জবজবে হয়ে গেছে। মাতালের মতো গাড়ির ঝাঁকুনিতে দুলছে শরীর, দুলছে সমস্ত জীবন, অস্তিত্ব। পাশে নির্বানীতোষের শরীরের উপস্থিতি। সিগারেট আর ঘামের গন্ধ। আরো একটু দূরে বসতে পারে না নির্বানীতোষ। আরো একটু কম লোভী যদি হত সে!

'কী কথা ছিল বললে না তো?' নির্বানীতোষ নীরবতা ভঙ্গ করে জানতে চাইল।

যে কথা বলবার জন্যে ছুটে এসেছিল জয়শীলা, চেম্বারে পা দিয়ে তারপর ট্যাক্সিতে উঠে যেন সেই কথাটা আটকে গেল গলার ভেতরে। কিন্তু, জয়শীলা জানেঃ কথাটা না বলতে পারলে আরো অস্বস্তি, আরো লজ্জা।

কয়েকটা মিনিট দৌড়ে গেল।

অবশেষে কণ্ঠনালীর মধ্যে সমস্ত শক্তি জড় করে আশ্চর্য শান্তগলায় বললে জয়শীলাঃ 'আপনার সেদিনকার প্রস্তাবে আমার অসম্মতি নেই...'

নির্বানীতোষ কোনো উত্তর দিল না। না বিস্ময়, না আনন্দ। কেবল তার সারা শরীর হঠাৎ যেন বাঙ্‌ময় হয়ে উঠল। জয়শীলার কোলে ওর বাঁহাত, ডানহাতটা ওর পিঠ ঘুরে বাহুমূলে মৃদু চাপড় দিতে লাগল।

ওর দেহের নিকট উপস্থিতিটুকু খারাপ লাগবার মতো অনুভূতিও মরে গেছে জয়শীলার। নির্বানীতোষ ওর মাথাটা টেনে নিয়েছে কাঁধের ওপর, চূর্ণকুন্তল সুড়সুড়ি দিচ্ছে গলায়। জয়শীলার মুখের অতি কাছে দলিত ভুজঙ্গের মতো নির্বানীতোষের মুখটা দুলছে, সাপের চোখের মতো আধা অন্ধকারে চকচক করছে ওর চোখ, কেয়ারী করা গোঁফ, গোঁফের নিচে পুরু এক জোড়া ঠোঁট।

নির্বানীতোষ মৃদুগলায় বললে, 'আমি জানতাম, জানতাম জয়শীলা।'

সীটের গায়ে ঝুলে পড়েছে মাথা, কোমরটা শিথিল করে ক্লান্ত ভঙ্গিতে বসেছে জয়শীলা। চোখের দৃষ্টি দূরদিগন্তে যেখানে একটি কি দুটি তারা খদ্যোতের দীপ্তিতে জ্বলছে।

অনেকক্ষণ ঘুমঘুম আচ্ছন্নতার মধ্যে থেকে হঠাৎ সহজ হয়ে এল জয়শীলা। মৃদুস্বরে বললে, 'আমার কিন্তু এখনি ফিরতে হবে—'

'হ্যাঁ চলো।'

গাড়ি রেড রোডের বুকে চক্কর দিতে দিতে এবার ঘুরল। আবার চিত্তরঞ্জন এভিন্যু। বৌবাজার, হ্যারিসন রোড, বিডন স্ট্রিট।

নির্বানীতোষের ঘন আশ্লেষ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল জয়শীলা।

হেদোর মোড়ে গাড়ি ছেড়ে দিল ওরা।

নামল দু'জনে।

'কালকে?'

'হুঁ..'

'কখন—?'

'সন্ধ্যায়—'

নির্বানীতোষ সিগারেট ধরাল। রাত্রির বাতাসে ধোঁয়া কাঁপতে লাগল, গন্ধ ছড়িয়ে ছত্রখান।

জয়শীলা একটু দ্রুত হেঁটে বাড়ি ফিরল।

সিঁড়িতে পা দিতেই স্নেহলতা আলুথালু বেশে ছুটে এলেন। 'এতক্ষণ কোথায় ছিলি?'

'এ্যাঁ।' যেন কোন কথা শুনতে পেলনা জয়শীলা।

'কী হয়েছে তোর? চোখমুখ অমন দেখাচ্ছে কেন?···দাদা যে কতক্ষণ তোকে খুঁজছেন।'

'কেন?'

'দাদার আবার অসুখ বেড়েছে। য়ুনিভার্সিটির ল্যাভেটরিতে পড়ে গিয়ে আঘাত পেয়েছেন।'

আঘাত পেয়েছেন! মানুষ আঘাত পায় কেন! নির্বানীতোষ···দেবপ্রিয়··· মামাবাবু আঘাত পেয়েছেন! আঘাত যার পাওয়ার কথা সে তো পেল না! একজনের কৃতকর্মের ফল কি অন্যজনের উপর এসে পড়ে।

জয়শীলা জিগ্যেস করল: 'ডাক্তার ডাকোনি?'

স্নেহলতা বললেন, 'হ্যাঁ, নির্বানীতোষকে প্রথমে কল্ দিয়েছিলাম, ওকে চেম্বারে না পেয়ে ডক্টর ভড়কে ডেকে পাঠাই।'

নির্বানীতোষের উল্লেখে চমকে উঠল জয়শীলা। মামাবাবুর অসুখের সময় এবং নির্বানীতোষ আর তার সান্ধ্যঅভিসার কী নেহাতই আকস্মিক অথবা বিধি-নিযুক্ত!

'কি বললেন ডাক্তার···'

'মাথায় চোট পেয়েছেন খুব। এই বয়সে আঘাত সামলে ওঠা···ভাগ্যিস তুই এসে পড়েছিস, আমার যে কি ভয় করছিল।'

ভয়! না আর ভয় করবে না জয়শীলা। জীবনে এত ভয় পাবার আছে!

কিন্তু, মামাবাবুকে দেখে ভয় পেতেই হল। অসাড় নিস্পন্দের মতো বিছানায় পড়ে রয়েছেন বিজয়কেতু। চোখ অস্বাভাবিক লাল আর বিড় বিড় করে কি বকছেন আপন মনে। জয়শীলাকে দেখে চিনতে পারলেন বলে মনে হল না।

'আমার কিন্তু কেমন মনে হচ্ছে মাসিমা। আমি নির্বানীতোষকে ডেকে আনি। উনি মামাবাবুর ধাত জানেন।'

সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত পায়ে নেমে গেল জয়শীলা। নির্বানীতোষকে এখনো হয়তো চেম্বারে পাওয়া যেতে পারে।

নির্বানীতোষকে চেম্বারে দেখে আশ্বস্ত হল।

'শীগগির। তোমাকে একবার আসতে হবে। মামাবাবু পড়ে গিয়ে আঘাত পেয়েছেন।'

রোগীকে ভালো ভাবে পরীক্ষা করে' চিন্তিত দেখাল ডাক্তারের মুখ। কিন্তু হাল ছাড়বার পাত্র নয় নির্বানীতোষ। ডাক্তারিশাস্ত্রের বাছাই-করা ওষুধপ্রয়োগে দিনরাত চেষ্টা করে গেল সে। উপদেশ নিল মেডিক্যাল কলেজের সিনিয়ার অফিসারদের। তার মনের সন্দেহটা দূর করবার জন্যে তার অতিপরিচিত প্রফেসার ক্যাপটেন দত্তকেও একদিন ডেকে নিয়ে এল। ক্যাপটেন দত্তের মতে এটা সেরিব্রাল হেমারেজের কেস্ নয়। তবে… পিঠের দিকে যে এ্যাবসেসটা ফর্ম করেছে, ঈশ্বর না করুন, ওটা গ্রাণ্ডু-লার টি. বি-র লক্ষণ হতে পারে!

বিজয়কেতুর অসুখকে উপলক্ষ্য করে এক-একদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত জয়শীলাদের বাড়িতে আটকা পড়তে হয় নির্বানীতোষকে।

সেবাশুশ্রূষার ক্লান্ত মুহূর্তে নির্বানীতোষের অভয়চোখ অনেক আশ্বাস দেয় জয়শীলাকে। বিজয়কেতু ঘুমিয়ে পড়লে রাত্রি যখন নিশ্চুপ পায়ে পৃথিবীর বুকে নেমে আসে, দুজনে বেরিয়ে আসে খোলা বারান্দায়—যেখানে আকাশ মহান যোগিপুরুষের মতো ধ্যান-গম্ভীর। জয়শীলার কাঁধে নির্বানীতোষের হাত, আঙুলে-আঙুলে জড়িয়ে কখনো রাত্রির স্তব্ধতাকে উপভোগ করা। মনের বিষণ্নতা কমনীয় হয়ে আসে। দুঃখের মধ্যে দিয়ে, বেদনার মধ্যে দিয়ে উভয়ে যেন অনেক নিকট হয়ে আসে।

নির্বানীতোষের কাঁধে মাথা রেখে জয়শীলা বলেঃ 'মামাবাবু ছাড়া এ-সংসারে আমার কেউ নেই।'

নির্বানীতোষ হেসে বলে : 'স্বার্থপর। আমার অস্তিত্বটা বোধহয় কিছু নয়।'

জয়শীলা নির্বানীতোষের আঙুল মটকাতে-মটকাতে বলে : 'মা-বাবার স্নেহ কি জিনিস আমি জানি না। তুমি তো আর মামাবাবু হতে পারবে না!'

স্নেহলতার এ কদিন যেন কী হয়েছে। মুখ বুজে সময় মতো দরকারী কাজগুলো করে যান। বিজয়কেতুর আইসব্যাগ কি গরম জলের ব্যবস্থা ঘড়ি ধরেই করেন। কিন্তু, কোনো কথা নেই। শরীর ভেঙেছে, চোখে কালি, আর সারা মুখে কেমন বিষণ্ণ পাণ্ডুরাভা। বিজয়কেতুর অসুখে রাত-জাগা আছে, শরীরের ধকল হয়, সবই ঠিক। কিন্তু, মনের ভেতরে যেন নিজস্ব একটা দুঃখ জমে-জমে থাক করছে স্নেহলতাকে। দাদার অসুখের বেদনার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে দুঃখটা। বর্তমান ছাড়িয়ে চোখের সামনে বিস্তৃত ভবিষ্যতের দিনগুলিও চোখের পরদায় ঝিলিক দিয়ে ওঠে। দাদার অসুখের সময় আরো বেশি করে মনে হচ্ছে এই কথাটাই : যেদিন সত্যিই দাদা আর থাকবেন না! সেদিন—সেদিন কোথায় পাবেন আশ্রয়, নির্ভরতা। হঠাৎ কিছুদিন থেকে আশ্রয়ের কথাটাই কেন বেশি করে মনে পড়ছে, বুঝতে পারেন না স্নেহলতা। জীবনের এতগুলি বছর পার করে দিয়ে আজ আর আশ্রয়েরই বা কি দরকার!

এক মাস যমের সঙ্গে যুদ্ধ করে যখন বিজয়কেতুর অসুখ ভালোর দিকে এগিয়েছে, ডাক্তার বাড়ির লোকেদের মুখে স্বস্তির নিশ্বাস পড়েছে, বহুদিন না-ঘুমের পরে রোগীর ঘরেই তক্তপোশে বোধকরি দুজনে ঘুমিয়ে পড়েছিল পাগলের মতো, হঠাৎ শেষরাত্রের দিকে বিজয়কেতু একবার কাশলেন, দরদর ঘামের নদী বইছে সারা শরীরে, হঠাৎ ঘরের মধ্যে হাওয়াটা যেন রুদ্ধ হয়ে এল, বুক থেকে গলা পর্যন্ত কে যেন চেপে ধরেছে, ঘোলাটে চোখের তারা কড়িকাঠে কী অন্বেষণ করল, হাত তুলে ঘন্টিটা বাজাবার চেষ্টায় ব্যর্থ হলেন বিজয়কেতু, চোখে ঝাপসা দেখছেন, ক্রমে অস্পষ্ট, আরো অস্পষ্ট, কণ্ঠনালী শুকিয়ে আসছে, দলা-পাকানো শক্ত খশখশে মতো কী-একটা ঠেলে উঠছে গলার মধ্যে থেকে, মনে হল···কী মনে হল মনে করবারও সময় পেলেন না বিজয়কেতু। হাতের আঙুলগুলো কেমন থরথর করে কাঁপতে লাগল, সারা শরীরটা হঠাৎ সংকুচিত হয়ে এল, তারপর বালিশ থেকে মাথাটা গড়িয়ে পড়ল বিছানার ওপর।

বিজয়কেতুর মৃত্যুর পর বাড়ির চেহারাটা বদলে গেল।

স্নেহলতা আরো বুড়ো হয়ে গেছেন। চুলে পাক ধরেছে, চোখের দৃষ্টিও সময়-সময় ঝাপসা লাগে, বুক ধড়ফড়ানি তো আছেই। তাঁর সমগ্র চরিত্রের চারিদিকে একটা অদ্ভুত নির্জন নিঃশব্দতা নেমে এসেছে। এত নির্জন যে ভয় করে, অটুট নৈঃশব্দ্য দিয়ে পাঁচিল ঘিরে যেন নিজেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছেন তিনি। দেহের মধ্যে যে ভাঙনের বীজটুকু এতদিন প্রোথিত ছিল, আজ সুযোগ বুঝে ডালপালা ছড়িয়ে বসেছে।

জয়শীলার মানসিক অবস্থা আরো সঙ্গীন। মামাবাবুর আকস্মিক মৃত্যুর কারণ তার কাছে ধাঁধা সৃষ্টি করে। এক-এক সময় সন্দেহ জাগেঃ মামাবাবুর মৃত্যুটা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কিনা। যে রোগী ভালো হয়ে উঠছিল তার মৃত্যু হওয়াটা রহস্যজনক। নাকি, মামাবাবুর মৃত্যুর কারণ জয়শীলা নিজে! মামাবাবু বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর আদর্শের উত্তরাধিকার জয়শীলার মধ্যে রূপায়িত হবে না। তাই অভিমান ভরে নিঃশব্দে লুপ্ত করে নিয়ে গেলেন তাঁর ব্যর্থ অস্তিত্বকে।

কিন্তু, মামাবাবু একি করলেন! যদি বেঁচেই না থাকলেন তবে কার সঙ্গে যুদ্ধ করবে জয়শীলা। মৃত মানুষের সঙ্গে তো আর যুদ্ধ হয় না।

এখন নির্বানীতোষকে বিয়ে করা না করা সমান।

কিন্তু···দেবপ্রিয়! ওর চিঠির ভাষা মনে পড়লে আবার বুকের ভেতরটায় দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। মামাবাবু নেই। কিন্তু তাঁর চেয়েও বড় প্রতিপক্ষ রয়ে গেছে দেবপ্রিয়। কী বলে সে? ওর অবর্তমানে জয়শীলার জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে! মেয়েমানুষের হৃদয়কে কতটুকু চেনে দেবপ্রিয়! পৃথিবীতে সব কিছু বদলায়, হৃদয় বদলাবে না কেন! যে হৃদয় একদিন দেবপ্রিয়ের জন্যে জায়গা করে দিয়েছিল, সেই হৃদয়ই আজ নির্বানীতোষকে স্থান দেবে।

সজ্ঞান মন দিয়ে যত জোরে দেবপ্রিয়কে অস্বীকার করবে ভাবে, নির্জ্ঞান মনে বাস্তবিকপক্ষে অত জোর পায়না। আর জোর পায়না বলেই আরো উচ্চকণ্ঠে অস্বীকার করতে চায়। দেবপ্রিয়! না আর নাম করবে না ওর। কিন্তু···কেন এমন করল সে। যদি জয়শীলার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে বলেই সে জানত, তাহলে অমন কাজ সে করল কেন। আর তাদের ভালোবাসার চেয়ে যখন সাংসারিক কর্তব্যকেই বড় বলে জানল তখন চিঠি লিখে এ ইনিয়ে কান্না কেন। কেন মিথ্যা সমবেদনা, শুধু

পুরানো ক্ষতকে উস্‌কে দেবার জন্তে! না। আর ভাববে না দেবপ্রিয়ের কথা। কিছুতেই না।

বিজয়কেতুর অবর্তমানে ভাঙা সংসারকে গুছিয়ে নিতে সময় লাগল। একদিন এটর্নি এসে মামাবাবুর উইলের কথা জানিয়ে গেলেন। কলকাতার বাড়ি পাবেন স্নেহলতা। জয়শীলা যদি উচ্চশিক্ষার জন্তে বিদেশে যায় তবে হাজার কুড়ি টাকা রেখে গেছেন বিজয়কেতু। আর যদি পড়াশোনা করতে না চায়, তবে সে টাকা পাবেন স্নেহলতা। এ ছাড়া বাদ-বাকি অস্থাবর সম্পত্তি—গ্রন্থের রয়্যাল্‌টি ইত্যাদি বাবদ আয়ের টাকা তিনি বিশ্ববিস্থালয়কে দান করে গেছেন।

আরো কয়েক মাস গড়িয়ে গেল আপন খাতে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে ফিরে জয়শীলা বললে, 'মাসিমা, তোমাকে একটা কথা বলব।'

স্নেহলতা বললেন, 'বোস। বড্ড রোগা হয়েছিস এ কদিনে। সত্যিই কী, তুই আর পড়াশোনা করবি নে শীলা?'

জয়শীলা বললে, 'না মাসিমা। ওসব আমার ভালো লাগে না।'

'আমাকে উলটো বোঝালে কী হবে রে। লেখাপড়া যদি তোর ভালোই না লাগবে অনার্সে ফার্স্টক্লাশ পেলি কী করে?'

'না মাসিমা। লেখাপড়া করতে আমাকে বোলো না…'

স্নেহলতা বললেন, 'দাদার উইল দেখে রাগ হয়েছে তোর, আমি বুঝতে পারি।'

জয়শীলা বললে, 'না মাসিমা। বিশ্বাস করো আমি তাতে একটুও দুঃখিত হইনি।'

'তবে? পড়বি নে কেন? আমি যাতে টাকাটা পাই তাই কি তুই পড়া ছেড়ে দিচ্ছিস?'

'না, না মাসিমণি।'

'তবে?'

'আমি নির্বানীতোষকে কথা দিয়েছি—'

স্নেহলতা চমকালেন না, স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। অন্য সময় হলে অনেক কথা বলতেন, বোঝাতেন জয়শীলাকে। কিন্তু আজ আর কিছুই

বলতে ইচ্ছে করল না। জয়শীলার আবেগকে চেনেন তিনি, নির্বানীতোষের উপর যখন একবার ঝোঁক পড়েছে ওকে ফেরাতে চেষ্টা করা বৃথা। জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে একথাটা স্পষ্ট করে বুঝেছেন স্নেহলতা : বাইরে থেকে বাঁধ দিয়ে মানুষের আবেগের বন্যাকে বেঁধে রাখা যায় না। নিজের অন্তরের ভাবনাকে পাথরের নুড়ির মতো ঠেলতে-ঠেলতে একগুঁয়ে মানুষ এগিয়ে চলে। বাইরের বাধায় তার অন্যদিকে গতি ফিরতে পারে, চলার ক্ষান্তি নেই। আর তাছাড়া, জয়শীলা তাঁর কাছে মতামত নিতে আসেনি, মত পাকা করেই এসেছে তাঁকে শুধু একবার জানাতে। ভালো-মন্দ যাচাই করবার মতো মনের স্থৈর্য নেই স্নেহলতার। জীবনে কোনটা ভালো কোনটা মন্দ, কে বলতে পারে; হয়তো এই পথেই সুখী হবে জয়শীলা। কিন্তু, মনে মনে সত্যিই বিস্ময় বোধ না-করে পারেন না বোনঝিকে দেখে। দেবপ্রিয়ের প্রত্যাখানে যে-মেয়ে আঘাত খেয়ে পাথর হয়ে গিয়েছিল, সেই উৎসমুখ বিদীর্ণ হয়ে ঝরনার মতো উৎসারিত হয়ে পড়ল নির্বানীতোষের উপর। একই মেয়ে, তার দুটি রূপ। দেবপ্রিয়কে ভুলতে চেয়েই কি নির্বানীতোষকে সে বেছে নিল।

'কথা বলছ না কেন মাসিমা?' জয়শীলা জিগ্যেস করল।

'বেশ তো।' স্নেহলতা হাসলেন।

জয়শীলার চলে যাওয়া পথের দিকে অনিমিষে চেয়ে রইলেন স্নেহলতা। সে-চোখ অনাবৃষ্টির আকাশের মতোই ধুসর শাদা। সবাই চলে গেল; দাদা, বীরেশ্বর। জয়শীলাও যাবে। একা শূন্য ঘর আগলাতে পড়ে থাকবেন তিনি। জয়শীলার কি একবারও ওর দুর্ভাগা মাসির কথা মনে পড়ল না। অবলম্বন হারিয়ে কেমন করে কাল কাটাবেন স্নেহলতা। ইছামতীর বন্যায় পাড়-ক্ষয়ে-যাওয়া অশ্বত্থ গাছের হুমড়ি-খাওয়া চিত্রটি অনেকদিন পড়ে চোখের সামনে দুলে উঠল স্নেহলতার। শেকড় বেরিয়ে পড়েছে, কবে নদীর জলে সলিলসমাধি হবে, তবু প্রাণপণে শেকড়শুদ্ধ আঁকড়ে ধরে রয়েছে ক্ষয়ে-যাওয়া মাটিকে। স্নেহলতা সর্বস্ব খুইয়ে সেই অসহায় অশ্বত্থের মতোই শেকড় বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরতে চাচ্ছেন যে কোনো অবলম্বনকে। এমনি করে আকুল টানে আঁকড়ে ধরার মতো অবস্থা যে মেয়েদের জীবনে আসতে পারে, স্নেহলতা আগে বোঝেননি। বীরেশ্বর চলে গেছে! ও কি আর আসবে না? যদি আসে—আজই, এখুনি—তবে হয়তো আর ফিরিয়ে দিতে পারবেন না তিনি। ঘুঁঘুটে অন্ধকারের চেয়ে মিটমিটে আলোও ভালো। কিন্তু···বীরেশ্বর আর কি আসবে কোনোদিন; যদি না আহ্বান

জানান স্নেহলতা। আর আহ্বান জানানো কি এতই সোজা! তার আগে যে মনকে নিজের হাতে টুঁটি টিপে মেরেছেন, সেই মনকেই আবার শুশ্রূষা করে সারিয়ে তোলা চাই। মৃত বস্তু কী ফেরে, কে জানে! চল্লিশ বছরকে পিছু হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে হবে অতীতে, বেলতলা গার্ল ইস্কুলের কড়া শিক্ষয়িত্রীর পোশাক ছাড়তে হবে, সিঁথের সিঁদুর আর নোয়া আবার দেহে চড়াতে হবে। না। সে বড় দুঃসাধ্য ব্যাপার। চল্লিশ বছর বয়েসটা একেবারে পেকে গেছে, তার ছাঁচ আঁকা হয়ে গেছে! নিরাপত্তার লোভে বীরেশ্বরের কুলায় ভীরু কপোতীর মতো ডানাগুঁজে আশ্রয় চাওয়ার কথা ভাবতেই সারা মন নারাজ হয়ে ওঠে। তা হয়না—তা হয়না। বীরেশ্বর তুমি যাও, যাও আমার সুমুখ থেকে। আমাকে একলা থাকতে দাও। তোমার পায়ে পড়ি—বাঁচতে দাও আমাকে।

বিবাহটা মেয়েদের জীবনে শুধু ঘর পরিবর্তন নয়, নতুন অভিজ্ঞতার দ্বারোদ্‌ঘাটনও বটে!

ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের আপিস থেকে ট্যাক্সি করে সোজা নির্বানীতোষের বাড়ির দিকে রওনা হওয়ার সময় জয়শীলার মুখে লজ্জা আর বুকে দুরদুর ভাব ছিল বৈকি। স্নেহলতা সাক্ষী দিতে আপিসে হাজির ছিলেন, নির্বানীতোষের মা আসেননি, এসেছে ছোটোভাই শিবতোষ, আর চার-পাঁচজন বন্ধু নির্বানীতোষের। স্নেহলতা আর জয়শীলার শ্বশুরবাড়ি পর্যন্ত যেতে চাইলেন না, তাঁকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে গাড়ি ছুটল আবার। মাসিমা যতক্ষণ ছিলেন তবু ভরসা ছিল। অজানা উত্তেজনায় এবার সত্যিই লজ্জায় রঙিন মুখটা ঘেমে নেয়ে উঠল জয়শীলার।

গাড়ি ছুটতেই শিবতোষ বৌদির কোল ঘেঁসে মুখ বাড়িয়ে দিল রাস্তার দিকে। ওর চোখে হাজারো কুতূহল, আর সহস্র জিজ্ঞাসা।

জয়শীলা যা পারেনি কয়েক মুহূর্তে শিবতোষ আপনার করে নিয়েছে বৌদিকে। বৌদি বলো না ওটা কি? ঐ যে লাল আলোটা কেমন দৌড়ো-দৌড়ি করছে। কি করে দৌড়োয়? হ্যাঁ বৌদি, ওদের পা আছে, না চাকা? দ্যাখো দ্যাখো—কেতলি থেকে চা পড়ছে, কী মজা। জানো বৌদি: এই পার্কটায় একদিন এসেছিলাম—এত টুকু টুকু ছেলে সাঁতার কাটছে। বৌদি আমাকে সাঁতার শেখাবে?

জয়শীলার বিপর্যস্ত অবস্থায় কৌতুক বোধ করে নির্বানীতোষ। কোনো কথা বলে না। নীরবে সিগারেট টানে। আর ফাজিল হাতটা সীটের পেছন দিক দিয়ে সকলের অজানতে ঘুরে এসে জয়শীলার জামার হাতায় দুষ্টুমি শুরু করে।

গাড়ি থামল সাহিত্য-পরিষদ স্ট্রিটে। দোতলা বাড়িটির গায়ে।

একে-একে গাড়ি থেকে নামল বন্ধুরা। নির্বানীতোষ। শিবতোষও নামল। কিন্তু, নামতে গিয়ে হঠাৎ যেন নিশ্চল হয়ে পড়ে জয়শীলা। আর অকস্মাৎ মনে হল এখন, এই মুহূর্তে ড্রাইভার যদি গাড়ি চালিয়ে তাকে নিয়ে উধাও হয়! কিন্তু অসম্ভব চিন্তাটা তার সারা মুখে যেন লজ্জার আবীর মাখিয়ে দিল।

নির্বানীতোষ দরজা খুলে না-ডাকলে তাড়াতাড়ি বোধহয় নামতে পারত না জয়শীলা। পায়ে-পায়ে জড়তা, সংকোচ।

শদর দরজার পেছনে শাদা কাপড়ে-ঢাকা বোধহয় নির্বানীতোষের মা।

'এসো মা—' সুহাসিনী বললেন।

জয়শীলা নিচু হয়ে পায়ের ধুলো নিল।

সুহাসিনী হাতধরে বধূকে ঘরে নিয়ে এসে বসালেন। মেঝেয় পুরানো দিনের সৌভাগ্যের চিহ্নস্বরূপ কার্পেট বিছানো। এক কোণে সেকেলে ডেসিং টেবিল, দক্ষিণে খাট, খাটের বুকে ধবধবে বিছানা। সেকেলে ডিজাইনের এক জোড়া অনন্ত দিয়ে জয়শীলাকে আশীর্বাদ করলেন সুহাসিনী। মায়ের আদেশে ওর সীমন্তে সিঁদুর লেপল নির্বানীতোষ, নোয়া পরাল হাতে।

নতমুখে কতক্ষণ বসে রইল জয়শীলা। সময় কাটল। ঘরের ভিড় পাতলা। বন্ধুরা মিষ্টিমুখ করে উপহারের উপঢৌকন সাজিয়ে নমস্কার করে বিদায় হল। রাত বাড়ল। বৌদিকে একলা পেয়ে অনেকক্ষণ তার জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে-দিয়ে ক্লান্ত শিবতোষও ঘুমিয়ে পড়ল কার্পেটের ওপর।

এবার কিছুক্ষণ একা জয়শীলা। শ্রান্ত চোখে আবার ঘরটা দেখে নিল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। জানালা, আকাশ। এই চার দেয়ালের মধ্যে তার চিরস্থায়ী সুখকে খুঁজে নিতে হবে। দেবপ্রিয়কে যদি তার জীবনের এই পরমক্ষণে নিমন্ত্রণ করতে পারত! কী ধারণা ওর? জয়শীলার জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে! ব্যর্থতার মানে জানে দেবপ্রিয়! বড় কথা বড় করে বললেই তা সত্য হয়না। কী চেয়েছিল জয়শীলা, কী পায়নি? নির্বানীতোষ বড় কথা জানে না, ও সহজ সুরের সহজ গন্ধের মানুষ। তাই তো ওকে বিশ্বাস করা যায়, নির্ভর করা যায়!

'বউমা—ও বউমা—'

'এঁ্যা!' চমকে মাথার ঘোমটা তুলতে যাচ্ছিল জয়শীলা, সুহাসিনী হাসলেন: 'থাক মা—অতো আর কনেবউ সাজতে হবে না। আমার বাইরেটা যত সেকেলে, আমি আসলে তত সেকেলে নই। এখন চলো চাট্টি মুখে দাও, মুখ শুকিয়ে গেছে একেবারে।'

খাওয়ার ইচ্ছা ছিল না জয়শীলার। তবু উঠতে হল।

খাবারের থালার সামনে বসে হঠাৎ মাসিমার কথা মনে পড়ল এতক্ষণে। একলা বাড়িতে মাসিমণি কী করছেন এখন। হয়তো আজ আর কিছুই খাবেন না! মন খারাপ হয়ে যায়।

আরো রাত ঘনিয়ে এল।

খাটের ওপর স্থির হয়ে বসে জয়শীলা। নির্বানীতোষ বোধহয় মার ঘরে। আস্তে আস্তে সারা বাড়িটা নিশ্চুপ হয়ে আসে। আলো নেবে, দরজা বন্ধের শব্দ।

নির্বানীতোষ ঘরে ঢুকল। শাদা বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে স্তিমিত নীল আলোটা জ্বালিয়ে দিল। জানালার বাইরে নক্ষত্র-ছিটনো নীল আকাশ। ঘরে-বাইরে নীল, নীলের সমুদ্র।

নির্বানীতোষ সিগারেট ধরিয়ে হাস্যমুখে এগিয়ে এল জয়শীলার কাছে।

'কী ভাবছ?'

হাসল জয়শীলা। 'কই, কি ভাবব?'

'মন খারাপ করছে?'

'যদি করেই কী করবে? তোমাদের ডাক্তারি-শাস্ত্রে কুলোবে না।'

নির্বানীতোষ ওর পিঠে হাত রাখল।

বললে, 'কেমন লাগল আমার মাকে?'

জয়শীলা বললে, 'কী জবাব পেলে খুশি হবে?'

'চাইনে জবাব। শিবতোষ তো তোমার ভীষণ ভক্ত হয়ে পড়েছে...'

জয়শীলা হাসল। ঘুমে ক্লান্তিতে চোখ জড়িয়ে আসছে ওর।

সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নির্বানীতোষ উঠে এল খাটে। বালিশে মাথা দিয়ে ছড়িয়ে শুল সে।

জয়শীলা আরো কিছুক্ষণ বসে বসে ঢুলতে লাগল। তারপর সেও খাটের এক ধারে পাশ ফিরে শুল।

শ্রান্তি আর অবসাদে মোমের মতো গলে গলে পড়ছিল যেন দেহটা।

নির্বানীতোষ ওর আঙুলগুলো তার আঙুলে বন্দী করতে লাগল: (ঘুম, ঘুম আসছে জয়শীলার), দেহটা টেনে এনেছে নির্বানীতোষ তার দেহের সান্নিধ্যে (ঘুম পাচ্ছে), উষ্ণ নিশ্বাস, দ্রুত বক্ষস্পন্দন, দম বন্ধ হয়ে আসছে জয়শীলার, অক্টোপাসের মতো শক্ত কঠিন আলিঙ্গন নির্বানী-তোষের, (তবু ঘুম আসছে, গলে-গলে পড়ছে জয়শীলা, বিন্দু বিন্দু হয়ে, দূরের দিগন্তে বিলীয়মান চিলের মতো তার সমগ্র অস্তিত্ব যেন বিরাট আকাশের বুকে শূন্য হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। একটা কষ্ট, বেদনা, বেদনার অতীত অনুবোধ, ভেঙে-পড়ার, গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে যাওয়ার, তলিয়ে যাওয়ার! মগ্ন চেতনা, হাওয়ায় কাঁপছে পদ্মের বৃন্তের মতো—থর থর থর থর। নির্বানীতোষের গোটা শরীর মুখর, সেতারের তারের মতো বাজিয়ে যাচ্ছে দ্রুতলয়ে, সেই ঝংকারে কোলাহল করে উঠছে জয়শীলার রক্ত, অস্থি, মজ্জা, মাংসপেশী। (নির্বানীতোষ আজ থাক, আমি কাঁপছি, ঘুম আসছে আমার) পাগল করে দিচ্ছে মানুষটা, প্রগল্‌ভ হয়ে উঠছে সর্বশরীর, অসহ্য বকুনি। হঠাৎ কালবোশেখী ঝড়ের মতো কিম্ভূত চেহারার একটা ভয় পাকে-পাকে জড়িয়ে ধরল তাকে, পালাতে গিয়ে হোঁচট খেল, শ্যাওলার দলে জড়িয়ে গেল আরো, কয়েকবার হাত পা ছুঁড়ল, প্রাণপণে নিশ্বাস নিল, কিন্তু শরীর অবশ হয়ে আসছে, ডুবছে জয়শীলা, থৈথৈ জল, নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে, গলা, কোমর, চোখ মাথা—সর্বশরীর ডুবে গেল তার, হারিয়ে যাওয়ার, বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার বেদনায় পাংশু বিবর্ণ মুখ, (নির্বানীতোষ, তোমার পায়ে পড়ি, ছেড়ে দাও। আমার ঘুম পাচ্ছে), চিরতরে ডুবে যাবার আগে দেহমূল বিক্ষোভে অস্থির হয়ে উঠল, তারপর হিমশীতল মৃত্যু···

চলন্ত গাড়িটা হঠাৎ যেমন ট্রাফিক কাণ্ট্রোলে ঝাঁকুনি খেয়ে থমকে পড়ে তেমনি সারা শরীর চূড়ান্ত ঝাঁকুনি পেয়ে স্থির হয়ে গেল জয়শীলার। আর কী আশ্চর্য, মনের একটি পাতাও নড়ল না, নিবাত, নিষ্কম্প। শরীর যখন কথা বলে তখন মন কি চুপ থাকে। হয়তো অতো প্রমত্তবেগে তার কুমারীর শান্ত অভিজ্ঞতার রাজ্যে অমন করে আঘাত না করলে বোধ হয় মন জাগত। প্রথম উষা থেকে দুরন্ত দুপুর যেমন নির্দিষ্ট স্তর অতিক্রম করে ধীর লয়ে নামে, আর কমলিনী আঁখি মেলে, ঘুমঘুম বিস্ময়, আনন্দ, নরম অভিজ্ঞতা থেকে তীব্র কড়া রোদের আস্বাদ, তেমনি করে যদি তিলে তিলে অভিজ্ঞতার চূড়াগ্রে পৌঁছে দিতে পারত নির্বানীতোষ!

দিন গড়িয়ে চলল।

কোনো নতুন পরিস্থিতির মধ্যে প্রথম এসে পড়ে সেটা বুঝতেই কিছু সময় কেটে যায়। তখন বাইরের চাপ এত প্রবল থাকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে ভালো-মন্দ ভাববার অবকাশ কম। অনেকটা স্রোতের আবেগে ভেসে যাওয়ার মতো। তারপর বাইরের চাপ কমে, স্রোতের আবেগও থিতিয়ে আসে তখন শুধু নিজেকে জড়িয়ে নিয়ে ভাবনার পালা।

নির্বানীতোষের ছোট্ট সংসারে এসে নিজেকে একদিনের জন্যেও বাড়তি বলে মনে হয়নি জয়শীলার। ছেলের পছন্দ-করা বউ সম্পর্কে সুহাসিনীর মনে যে কোনো বিরোধের মেঘ জমে ওঠেনি তার কারণ হয়তো এই পুত্রের ভালো লাগার প্রতি তাঁর সস্নেহ অনুমোদন ছিল আর ছিল নিজের ওপর সম্ভ্রমবোধ। শিবতোষ তো প্রথম দিন থেকেই জয়শীলার অনুগত।

প্রতিদিনের ব্যবহারে নির্বানীতোষও পুরানো হয়েছে। আর এত তাড়াতাড়ি পুরানো হয়ে গেছে সে যে ভয় করে জয়শীলার। এই কদিনেই বুঝতে পেরেছে জয়শীলা : তার মধ্যে নিত্য নতুন প্রতিভার স্ফুরণ নেই, রোজকার ব্যবহারে নিজেকে নতুন করে নিতে জানে না সে। আর সেখানেই বোধ হয় হার নির্বানীতোষের। ও যদি জয়শীলার মনকে বুঝত, বুঝত মেয়েদের মন, বৈচিত্র্য আর নতুনত্ব অভিলাষী মনটাকে! গৃহাঙ্গনের সীমাস্বর্গের মধ্যে স্বামীকে তারা এমনভাবে দেখতে চায়, জানতে চায়, চিনতে চায়—নিত্য নতুন রূপকথার গন্ধভরা থলি নিয়ে যেন হয় তার অভিসার—রোজকার দল-মেলার সঙ্গে যেন প্রত্যহের নতুন বিস্ময় আর আঘ্রাণ জড়িয়ে থাকে!

এ বাড়িতে যে ব্যক্তিটির সঙ্গে তার ইচ্ছা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আবর্তিত হয়, সেখানেই যদি শক্তি না পায়, না-পায় অবলম্বন তাহলে জীবনে উৎসাহ থাকে না।

বাড়িতে ফেরা আর বেরোনোর সময় নির্বানীতোষের ঘড়ি ধরে। সকালে সাতটার মধ্যে ব্রেকফাস্ট সেরে সে চেম্বারে বেরিয়ে যায়, একটায় ফেরে, দুপুরে বিশ্রাম, আবার বেরোয় সন্ধ্যে সাতটায়। অন্য সময়গুলি জয়শীলার নিজস্ব। নিজস্ব বলেই নিঃসঙ্গ, ভারি, একঘেয়ে। জানালা দিয়ে আকাশে চিল-দেখা, রোদ-দেখা। কখনো ড্রেসিং টেবিল গুছোনো, আলনায় কাপড়গুলো গুছিয়ে রাখা। মর্নিং ইস্কুলফেরত শিবতোষের দুষ্টুমি আর চিৎকারে একসময় একঘেয়েমি কাটে। স্নান। খাওয়া। শিবতোষকে পড়া

বলে দেয়া। এর মধ্যে কয়েকদিন বাড়ি থেকে বেরিয়েছে জয়শীলা। স্নেহলতার ওখানে, কোনোদিন হাতিবাগান মার্কেটে, সঙ্গে শিবতোষ, কোনোদিন একা।

আর কী আশ্চর্য, বাড়িতে থাকার বিরক্তি কাটাবার জন্যে বাইরে বেরিয়ে পড়লেও খোলা আলোহাওয়াতে বাইরেও বিরক্তি ধরে। বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। পালাইপালাই লাগে। যেন মনে হয় এর চেয়ে গৃহকোণ ভালো, ভালো নিঃশব্দ চিন্তার জালবোনা।

সারাদিনের অবসাদ আর একঘেয়েমির পর গভীর রাত্রি আসে ভিন্ন স্বাদ নিয়ে।

খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে নির্বানীতোষ তখন খাটে আলতো হয়ে শুয়ে গভীর মনোযোগে সিগারেট টানে, আর সেই সময়ে জয়শীলা যখন ঘরে শুতে আসে, নির্বানীতোষের চোখের তারা দুটো এমন বাঙ্‌ময় হয়ে ওঠে যে সেই মুখর প্রবল ইচ্ছার তলায় সারা দেহমন তলিয়ে যায় জয়শীলার। রাত্রির প্রকৃতিতে বোধহয় নিজস্ব এক জাদু আছে—সব কিছু ভুলানো মায়া, আত্মহারা হবার চূড়ান্ত মুহূর্ত। খোলা মাঠে হাহা-করা হাওয়া এসে যেমন সর্বাঙ্গে জড়িয়ে ধরে তেমনি প্রগল্‌ভ কামনার পাবকে শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন উদগ্র জ্বালা ধরিয়ে দেয় নির্বানীতোষ।

মাথার ওপরে মৃদু বেগে ফ্যান ঘোরে। মশারি কাঁপে। জানালার পর্দাগুলি দোলে। আকাশে হাওয়ার খুশি।

কিশোর বয়েসে ঝিরঝিরে বৃষ্টি মাথায় করে' নদীতে স্নান করবার মতো কেমন এক অনুভূতিতে স্তম্ভিত হয়ে পড়ে চেতনা। আর সেই মুহূর্তে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পদ্মার ঘূর্ণির মতো যে কোনো পরিণতিতে টেনে নিয়ে যেতে পারে নির্বানীতোষ।

'শীলা—'

'উঁ ?'

'কেমন লাগছে ?'

'জানিনা।'

'শীলা—'

'উঁ ?'

'আমার আগে কাউকে ভালোবেসেছ ?'

'না—'
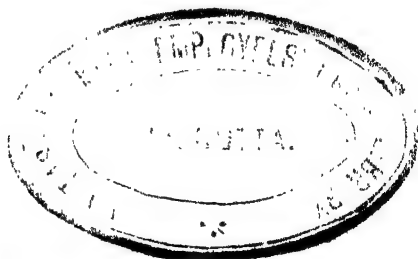
'লক্ষ্মীটি বলো না—'

'কী বলব ? যত বাজে কথা—'

'বলো না সত্যি—?'

নির্বানীতোষের ছেলেমানুষি কুতূহলে রাগ হয়না জয়শীলার, কেবল দুষ্টুমি করতে ইচ্ছে করে।

বলে ঃ 'সত্যি বলব ?'

'হুঁ হুঁ —'

'না। থাক।' জয়শীলা হাসল ঃ 'তোমার আবার জেলাসি হবে।'

নির্বানীতোষ বললে, 'জেলাসি না বললেও হবে।'

জয়শীলা চুপ করে রইল।

মাথার ওপরে পুরানো ফ্যানটার বদখত আওয়াজ। সিলিঙের গায়ে টিকটিকি পোকাটাকে জাদু করছে।

'এই—'

'উঁ ?'

'কথা বলছ না কেন ?'

'কী বলব ?'

নির্বানীতোষ একটু থেমে বললে, 'তোমাকে একটি ছেলের সঙ্গে ঘুরতে দেখতাম...'

জয়শীলার সারা শরীর স্তব্ধ নিথর।

'ছেলেটি কোথায় গেল ?' নির্বানীতোষের আবার জিজ্ঞাসা।

জয়শীলা মূক।

'কী নাম ছেলেটির—?'

জয়শীলা যেন ঘুমের ঘোরে কথা বলছে ঃ 'দেবপ্রিয়। আমার মামাবাবুর ছাত্র...'

'আর তোমার—?'

'আমার !' সর্বাঙ্গে শিহর জয়শীলার ঃ 'আমি—আমি ওকে ভালোবাসতাম।'

নির্বানীতোষ খানিক চুপ করে রইল। তারপর হাসল। 'আমি জানতাম। তবে লুকোচ্ছিলে কেন ?'

'লুকোচ্ছিলাম !' চোখ দুটো ধক্ করে জ্বলে উঠেছিল জয়শীলার, কিন্তু, না।

আরো রাত হল, অনেক অনেক রাত। রাত্রির কালো আকাশটা পূবদিকে ডিমের মতো পাণ্ডুর হয়ে এল। ঘুম নেই চোখে জয়শীলার।

নির্বানীতোষ অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আলুথালু বেশবাসে জানালার ধারে উঠে এল জয়শীলা, পিঠের ওপর বিনুনি স্খলিত। গোটা আকাশের চেহারাটা তার মনের মতোই নীরক্ত, ধূসর। দেবপ্রিয়, কী করছে এখন? হ্যাঁ: আমি ওকে ভালোবাসতাম, নির্বানীতোষ তুমি ঠিকই অনুমান করেছ। যত বিপুল শক্তিতে ওকে অস্বীকার করব ভেবেছিলাম, পারিনি। তোমাকে আঁকড়ে ধরে আমি বাজি ধরতে চেয়েছিলাম! আমি জিতেছি কি মরেছি, জানিনা। কিন্তু, নির্বানীতোষ, হঠাৎ ওর মনে এ-ধরণের প্রশ্ন জাগল কেন! আমি কী তাকে সব দিতে পারিনি। কোথাও কী ফাঁক আছে, ফাঁকি আছে। নির্বানীতোষকে তো আমি স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছি, তাকে এতটুকু ঠকাবার কোনো বাসনাই নেই আমার। তবে···দেবপ্রিয়কে ঘিরে ওর এত প্রশ্ন কেন, সে কি সন্দেহ করেছে, একস-রে করে তার মনের ফোটো পড়েছে। আর সেখানে সমগ্র মনের আকাশটাই কি দেবপ্রিয়ময় হয়ে রয়েছে।

একটা উদ্‌গত দীর্ঘনিশ্বাস ভোরের বাতাসের মধ্যে মিশে গেল।

পরদিন সন্ধ্যায় জয়শীলাকে দেখে স্নেহলতা জিগ্যেস করলেন: 'অমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন তোকে। শরীর খারাপ?'

জয়শীলা বিশীর্ণ হাসল। 'কই, আমার কিছু হয়নি তো।' তারপর মাসিমার কোল ঘেঁসে বসে বললে: 'তুমি কেবল আমার শরীর খারাপ ত্যাখো।'

'আমাকে লুকোসনি শীলা। কী হয়েছে তোর, সত্যি করে বল্ দেখি।'

'সত্যি করে বলছি মাসিমণি, আমার কিছু হয়নি। এই ত্যাখো আমি হাসছি।'

কিন্তু ছদ্মবেশ বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারল না সে। সব কথা বলল মাসিমাকে।

'আমি কিছু বুঝতে পারছিনে মাসিমণি। বলতে পারো কী করব আমি?' থরথর করে কাঁপছিল ওর গলার স্বর।

'এত বড় ভুল তুই কী করে করলি শীলা···'

'কী করব মাসিমা। ও এমন করে জিগ্যেস করল, ওর প্রশ্নে এমন কৌতূহল ছিল, আমি লজ্জায় নুয়ে গেলাম। দেবপ্রিয়ের কথা স্বীকার করতেই হল।'

'এমন বোকামি কেউ করে রে!'

'জানিনা মাসিমা। আমি তো বলতে চাইনি। কিন্তু···এমন করে ভুলিয়ে দিল সব কিছু···স—ব কিছু···'

স্নেহলতা চুপ করে রইলেন।

মাসিমার কোলে মাথা রেখে সিলিঙের দিকে দৃষ্টি স্থির করে জয়শীলা ফের বললেঃ 'কিন্তু নির্বানকে তো আমি ফাঁকি দিইনি মাসিমণি। আমি যে সব কিছু উজাড় করে দিয়ে ওকে সুখী করতে চাই···'

'কিন্তু···সমস্যাটা কী জানিস শীলাঃ পৃথিবীতে একদল লোক আছে যারা প্রতিপদে সুখকে টাকার মতো বাজিয়ে বাজিয়ে নেয়। আর এই যাচাই বুদ্ধি থেকে জীবনের জটিলতা বাড়ে। আমি বলছিনে যে নির্বানীতোষ তেমন ছেলে। যাকগে। বাজে কথা। কী ঠিক করলি তাহলে সত্যিই আর পড়বি নে?'

জয়শীলা চোখ বন্ধ করে বললে, 'না মাসিমা। ওসব আমার দ্বারা হবেটবে না।'

স্নেহলতা বললে, 'তোর যে কি জেদ বুঝিনে বাপু। মেয়েদের এত জেদ কি ভালো রে?'

'জানিনা মাসিমা। আমার ভাগ্যকে আমি নিজের হাতেই গড়েছি। বলতে পারোঃ এটা আমার অগ্নিপরীক্ষা···'

'তোকে আজো বুঝতে পারলাম না, শীলা···'

জয়শীলা হাসল। 'নিজেকে বুঝতে কি আমিই পেরেছি মাসিমণি। সে চেষ্টা আর করিনে।' একটু থেমে বললেঃ 'একটা জিনিস ভাবছি মাসিমা, আমি—আমি চাকরি করব।'

'চাকরি করবি! তুই!' স্নেহলতা অবাক হলেন।

'হ্যাঁ মাসিমা।'

'তোর টাকার দরকার?'

'টাকার দরকার কার নেই মাসিমা। আর তা ছাড়া—আমার শ্বশুরবাড়ি তো বড়োলোক নয়।'

'এ তোর আর এক ধরনের জেদ। যা ভালো বুঝিস কর বাপু। আমাকে বলতে আসিসনে।'

জয়শীলা বললে, 'তাই বলে এখুনিই কি চাকরি নিতে যাচ্ছি।'

জয়শীলা উঠল। 'আজ আসি মাসিমণি—'

'এত শীগগির। চা খেলিনে তো?'

'চা থাক মাসিমা। তাড়াতাড়ি রয়েছে। ও আবার সিনেমার টিকিট কেটেছে লাইট হাউস-এ। শেকসপীয়রের ওথেলো।'

সিনেমা দেখে নির্বানীতোষ বললে, 'আজ যখন ছুটি নিয়েছি, এরই মধ্যে বাড়ি-ফেরা নয়। চলো ট্যাক্সি করে একটু হাওয়া খাওয়া যাক।'

'বেশ তো।'

ট্যাক্সি ছুটেছে। আলোকোদ্ভাসিত চৌরঙ্গী। নিওন লাইট। লাল, নীল, সবুজ। রেস্তোরাঁয় সঙ্গীত। কলকণ্ঠ। জনতা, জনতার সজীব প্রবাহ। হাসি-গান রঙ। ট্যাক্সি মোড় ঘুরল সোজা গঙ্গার দিকে। এখানে আলোর দ্যুতি কম। আধো আধো অন্ধকার, আর অন্ধকারের তাথৈ বন্যায় এখানে-ওখানে আলোর দ্বীপ। হাওয়া ঝিরঝির করে ঝরে পড়ছে। আকাশ নক্ষত্রোজ্জ্বল, ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ, আর লম্বা গাছেদের কাঁধে ভর দিয়ে চাঁদের লুকোচুরি।

'কথা বলছ না কেন?' নির্বানীতোষ হঠাৎ প্রশ্ন করল গভর্ণমেণ্ট প্লেস পেরোতে-পেরোতে।

'বারে! তুমিই তো বলছ না—' জয়শীলা মৃদু অনুযোগ তুলল।

'ভীষণ দুষ্টু হয়েছ তুমি···' ওকে নিকটে আকর্ষণ করতে-করতে বললে নির্বানীতোষ।

স্বামীর আশ্লেষে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে জয়শীলা হাসল।

'সারারাত কাছে পেয়েও তোমার কাছে পাবার লোভ গেল না। ভীষণ অসভ্য তুমি।'

নির্বানীতোষ হাসল। 'কাছে পাবার লোভ ফুরিয়ে গেলে আর কি থাকে। বাড়িতে তোমার সান্নিধ্যটা এত অংক করে' হিসেব করা যে দু'য়ে দু'য়ে পাঁচ হবার যো নেই।'

জয়শীলা হাসল। 'আর এখানে ওই পাঞ্জাবী ট্যাক্সিঅলার সামনে বুঝি দু'য়ে দু'য়ে পাঁচ করবার খুব যো আছে।'

'আছে বৈ কি।' নির্বানীতোষ হাসল। 'ও তো তোমাকে আমার বিয়ে করা স্ত্রী ভাবতে নাও পারে।'

'তাতে তোমার লাভ?'

'লাভ আছে বৈকি। নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতিই তো মানুষের সবিশেষ আকর্ষণ। এই মুহূর্তে তুমিও ভাবো না কেন: তোমার পাশে একজন পরপুরুষ।'

'ছি-ছি। তোমার মুখের একেবারে বাঁধন নেই।'

'মুখ বাঁধব বলে তো আর হাওয়া খেতে আসিনি। ভেবে ছ্যাখো বিয়ের পর কদিন আমাদের এমন বেড়ানো ভাগ্যে ঘটেছে। আমি তো জানি: বাড়িতে তোমার কত কষ্ট হয়।'

'জানো নাকি। বাবা! তুমি একেবারে দয়ার সাগর হয়ে পড়েছ দেখছি। একটু সরে বসবে?'

'না।' আরো ঘন হয়ে বসল নির্বানীতোষ।

ট্যাক্সি স্ট্র্যাণ্ড রোড-এ পড়েছিল।

নির্বানীতোষ বললে, 'চলো বুফেতে যাই—'

'বুফে!' চমকে উঠল জয়শীলা। হঠাৎ বুকটা ধক্ করে' উঠল। 'না না—চলো এবার ফেরা যাক।'

'ফিরবে, এখুনি, এরি মধ্যে। দূর! কী যে বলো। এই ট্যাক্সি রোখো। চলো চায়ের তেষ্টা পেয়েছে। গলা ভিজিয়ে আসি।'

আউটরাম বুফে-র সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে জয়শীলা। প্রতিটি সিঁড়ি চেনা, প্রতিটি পায়ের শব্দ গোনা। দেবপ্রিয় আর জয়শীলা। কত নীরব সন্ধ্যা, দুর্লভ অবসর বুফের রেলিঙ ধরে কেটেছে। চুল উড়েছে, শাড়ির আঁচল উড়েছে হাওয়ায়। জলে নোঙর করা লঞ্চের মাঝিরা উনুন ধরিয়ে রান্না করছে, উনুনের আগুনের ছায়া পড়েছে গঙ্গার জলে, কাঁপছে আলোর প্রতিবিম্ব। আরো দূরে বন্দরের কালগুণে অপেক্ষারত প্রকাণ্ড জাহাজটা। জেটির ওপর ভ্রমনার্থী খুচরো নরনারীর ভিড়। বুফের চেয়ারগুলিও প্রায় ভরতি।

চেয়ার টেনে টেবিলের সামনে জাঁকিয়ে বসে চায়ের অর্ডার দিল নির্বানীতোষ। সিগারেট ধরিয়ে অনেকক্ষণ গঙ্গার জলের দিকে চোখ মেলে রইল।

প্রবল হাওয়াতেও কপাল বেয়ে চুঁয়ে চুঁয়ে যেন ঘামের ফোঁটা জমে উঠছে জয়শীলার। হঠাৎ মাথা ঘুরে যাওয়ার মতো কেমন চোখছুটো ঝাপসা ঝাপসা ঠেকল তার। আলো হাওয়া আকাশ জল জাহাজ স্টীমার লোকজন সব কিছু যেন চোখের সুমুখে অস্পষ্ট হয়ে এল। কিশোরী বয়সে মামার চশমার কাচে এমনি ঝাপসা ঠেকেছিল একবার। এমনি এক টেবিল

ঘিরে বসেছিল দুজন—কখনো মুখোমুখি, পাশাপাশি কখনো। চায়ের পেয়ালায় চামচের জলতরঙ্গ, আর কথার নূপুর। দেবপ্রিয়ের স্মৃতি যেন এখনো ছড়িয়ে রয়েছে এখানকার আকাশেবাতাসে।

পাথরের মতো নিশ্চল কতক্ষণ বসে থাকত, কে জানে।

বয়ের আগমনে, নাকি নির্বানীতোষের সিগারেটের গন্ধে চমক ফিরল জয়শীলার। পট্ থেকে লীকার ঢালল দু'কাপে, দুধ আর চিনি, তারপর চামচ দিয়ে নেড়ে একটা কাপ এগিয়ে দিল নির্বানীতোষের দিকে।

চামচ দিয়ে পেয়ালা থেকে চায়ের একটা কুটো তুলতে গভীর মনোযোগ দেখা গেল জয়শীলার।

'দেখলামঃ মন্দ না।' হাসল নির্বানীতোষ। 'আচ্ছাঃ তুমি কবিতা লেখ না কেন শীলা?'

জয়শীলা মৌন।

একটা লঞ্চ জেটিতে এসে ভিড়ল। দুলে উঠল বুকেটা। ছলাৎ ছলাৎ। জল ছোবল মারল জেটির গায়ে।

'তুমি ঘামছ···'

'ভীষণ খারাপ লাগছে শরীরটা। উঠবে?'

'হ্যাঁ চলো—সাড়ে দশটা বেজে গেল।'

আরো দিন গড়িয়ে চলল।

দেবপ্রিয়ের প্রসঙ্গটা নির্বানীতোষকে বলার পর ওর সম্পর্কে যে অমূলক সংশয় বাসা বেঁধেছিল, নির্বানীতোষের কদিনের ব্যবহারের উত্তাপে সেই গুমোট ভাবটাও মন থেকে দূর হয়ে গেল একদিন। অনেক শান্ত আর আরাম বোধ করতে লাগল জয়শীলা।

কিন্তু পরিপূর্ণ শান্তি পাবার পথ কোথায়!

এ-সংসারে অর্থের প্রশ্নটা বড় করে দেখা দিল। নির্বানীতোষের পশার বাড়লেও অর্থের কৌলীন্য বাড়েনি। আর অর্থের মতো সমস্যাটার সামনে দাঁড়িয়ে কিছুতেই নির্বিকার থাকতে পারে না জয়শীলা।

সংসারে সুখ বলো স্বাচ্ছন্দ্য বলো, সেটা যে অর্থ নামক বস্তুটির সঙ্গে এমন ভাবে জড়ানো—এর আগে কে বুঝেছিল এত! মনকে খর্ব করবার এতবড় শত্রু আর নেই।

আর সবচেয়ে অস্বস্তিকর ঠেকে যখন জয়শীলা দেখে তাকে আড়ালে রেখে এ-বাড়ির আর্থিক আন্দোলন প্রবাহিত হতে থাকে। সুহাসিনী বা নির্বানীতোষ দুজনেই তাকে সমস্যাটা গভীরে বুঝতে দিতে চায় না। এই ব্যাপারে জয়শীলার কিছু করবার নেই। জয়শীলা যেন মোমের পুতুল, এসব সমস্যার উত্তাপে সে গলে যাবে। হাসতে চেষ্টা করে রাগ হয় তার। বেড়া বেঁধে অর্থের সমস্যাটা আটকানো যায়, কিন্তু মন, মনের উপর বেড়া দেবে কে! আহা, সে যেন শিবতোষের মতোই ছেলেমানুষ!

জয়শীলা এই কয়েক মাসের মধ্যেই কেমন সহজ হয়েছে, স্বাভাবিক হয়েছে। নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকেই মিশিয়ে দিয়েছে এই সংসারের জীবনধারার সঙ্গে। কিন্তু, ওরা তার কাছে সহজ হতে পারল না কেন, কেন ভাঙল না ওদের মনের আড়! সংসারটা তো শুধু ওদের একারই নয়, তারও। সেও তো কিছু দিতে চায় নইলে জীবনের সঙ্গে জীবনের মিল হবে কি করে! আর, তাছাড়া, নির্বানীতোষকে তো বড়লোক ভেবে ভুল করেনি সে। তার আশা-ভঙের তো কারণ উপস্থিত হয়নি। জীবনে সমস্যা যখন আছে তাকে দূর করবার মতো আবেগও মানুষের রয়েছে। পটের বিবির মতো নিজেকে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখবার জন্যে তো এ-বাড়িতে আসেনি জয়শীলা।

এক-এক সময় মনে হয় কোথায় যেন এই বাড়ির মনের সঙ্গে তার দূরত্বের সম্পর্ক রয়ে গেছে। ওদের আছে বিত্ত-ফুরানোর অভিমান, এক ধরণের স্বার্থপর আত্মম্ভরিতা। নইলে জয়শীলার সঙ্গে এমন লুকোচুরি খেলত না তারা। সহজ ব্যাপারটাকে সহজভাবে মেনে নিতে মানুষের যে কেন এত দ্বিধা কে বলবে!

রাত্রে ওর মুখে আষাঢ়েমেঘের ছায়া দেখে নির্বানীতোষ ওর চিবুক ধরে কৌতুক করল: 'কি গো, মুখ অমন কালিপানা কেন?'

'কই, কে বললে?' জয়শীলা ততোধিক গম্ভীর আর নিস্পৃহ।

'ফেস্ ইজ দি ইনডেক্স অব মাইণ্ড—' 'ইংরেজি করে' বললে নির্বানীতোষ।

'হবে।' জয়শীলা উত্তর দিল। 'আমার মনটাই অমন।'

'আরে! তুমি দেখছি বেজায় রেগেছ। জানো না রামকৃষ্ণদেব কি বলেছেন: ক্রোধ চণ্ডাল।'

ছিটকে গেল জয়শীলা: 'তাহলে ছুঁয়ো না আমাকে।'

'আরে! হিউমার বোঝো না নাকি?'

জয়শীলা বললে, 'আমি তোমাদের চৌবাচ্চায় বাঁধা জল নই যে খেয়াল মতো ছিটিয়ে আনন্দ করবে।'

নির্বানীতোষ একটু স্থির থেকে গম্ভীর হবার ভান করে বললে, 'কী হয়েছে ? কে কী বলছে তোমাকে ? মা...'

'চুপ করো।' ধমকে উঠল জয়শীলা। 'মা আমাকে কি বলবেন!'

'তবে ?'

'কেন, কেন, কি করেছি তোমাদের ? কেন আমাকে এমন করে দূরে ঠেলে রাখবে ?' নাকের পাতা স্ফীত হল জয়শীলার, অবরুদ্ধ আবেগে গুমরে গুমরে উঠল শরীর।

নির্বানীতোষ ওর হাত ধরে কাছে টেনে নিয়ে বললে, 'কী হয়েছে লক্ষ্মীটি। কেন অমন করছ ?'

'আমি যে কত আশা করে' তোমাদের কাছে এসেছিলাম। কত গর্ব, কত অহংকার ছিল আমার।'...বলতে-বলতে হঠাৎ তার কণ্ঠস্বর, তার বেদনা যেন রাত্রির স্তব্ধ আকাশে ছড়িয়ে পড়ল, বিশেষ দুঃখটা আরো ব্যাপক, আরো প্রসারিত হয়ে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত পর্যন্ত অনুসন্ধান করে' ফেলল। অতীত জীবনের পটভূমিকায় অন্ধকারের চেহারাটা এত নগ্ন নির্জন যে বর্তমানের উত্তাপ-উত্তেজনা দিয়ে তাকে আবরিত করতে না পারলে ভয়ে হিমহিম হয়ে ওঠে সমগ্র সত্তা। একথা যদি নির্বানীতোষ বুঝত: কত বড় দুঃখকে ভুলতে চেয়ে বর্তমানকে শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল সে। ওদের একপেশে স্বার্থপর ব্যবহার তাকে যেন আরো নিঃসঙ্গ আরো ভয়াবহ করে তোলে। সেই নির্জনতার কাঁকরে ক্ষত-বিক্ষত জয়শীলা, নিয়ত নিঃশব্দ রক্ত ঝরছে, দেবপ্রিয়ের অপমান, ঔদ্ধত্যের হাসির দাপট হা-হা করে নাড়া দিচ্ছে তার মনের কপাট।

অত সূক্ষ্ম মনের কারবারী নয় নির্বানীতোষ। অমন করে জয়শীলার গভীরে ডুব দেবার মতো না ছিল তার প্রতিভা, না ধৈর্য। শুধু যতটুকু বলল জয়শীলা, তাই বুঝল। বুঝে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর সিগারেট ধরিয়ে গুমোট ভাবকে কাটাবার উদ্দেশ্যে লঘু গলায় বললে, 'তাই বলো। এই জন্যেই এত রাগ! কিন্তু এটাকে স্বার্থপরতা না-ভেবে এও তো ভাবতে পারতে: তোমাকে এই দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই দেবার জন্যেই এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করা হয়নি।'

একটু চুপ থেকে নির্বানীতোষ আবার বললে, 'তাছাড়া, সত্যি-সত্যি এত দুর্ভাবনার কোনো কারণ নেই। ডাক্তারি লাইনে পশার এত তাড়াতাড়ি হয়

না। তবে না-খেতে পেয়ে ডাক্তার বা ডাক্তারের পরিবার কোনোদিন মরেছে এমন নজির নেই। প্রাইভেট প্র্যাকটিস যদি নাই-ই জমে, চাকরি খাচ্ছে কে। এইতো সেদিনও একটা অফার পেয়েছি ঝরিয়ার ভাগ্যবাঁধ কোলিয়ারি থেকে…'

যেমন ভাবে জ্বলে উঠবে ভেবেছিল জয়শীলা, তা হল না, তার আগেই হঠাৎ জলে ভিজে স্যাঁতসেঁতে হয়ে গেল ওর মনের বারুদ। আর মন শান্ত হতেই নরম বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে তার চোখ জুড়িয়ে এল। এখন মনে হল একটু আগে অমন বিশ্রীভাবে খেপে না-উঠলেই চলত। সত্যি সত্যি কি খেপে-ওঠবার কোনো হেতু ছিল এত। কিন্তু, এছাড়া উপায়ও কী ছিল! কাপুরুষ দুর্বল মনটাকে শায়েস্তা করবার জন্যে যে মাঝেমাঝে খেপে-ওঠার দরকার। এ রাগ শুধু নিজের উপর, শুধু নিজেকে নিয়ে পালিয়ে-বেড়ানো।

এই ঘটনার কয়েক হপ্তা পরে দুপুরে খাবার সময় নির্বানীতোষ বাড়ি ফিরে যখন বিশ্রাম করছিল অস্বাভাবিক খুশির লহরে সমস্ত দেহটা দুলিয়ে হাসতে-হাসতে এগিয়ে এসে জয়শীলা বললে, 'বলো ঃ কি দেবে আমাকে ?'

নির্বানীতোষ ওর দিকে চোখ রেখে বললে, 'হঠাৎ ?'

'হ্যাঁ ঃ হঠাৎ-ই।' পিঠের দিকে হাত দুটো লুকিয়ে জয়শীলা হাসল আবার। 'তোমার জন্যে বিরাট সারপ্রাইস আছে।'

'সারপ্রাইস!…জীবনের কোথাও সারপ্রাইস বলে কি কিছু আছে আজকের দিনে।'

'আছে মশায় আছে। তোমার ডাক্তারিশাস্ত্রে কুলোবে না। এই দ্যাখো—' লুকোনো হাতদুটো সামনে দিকে এনে মুঠো থেকে খামটা ছুঁড়ে দিল নির্বানীতোষের নাকের ডগায়।

'এটা তো আপিসের খাম—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ দ্যাখো না চিঠিটা পড়ে'।'

যতক্ষণ চিঠিটা পড়ছিল নির্বানীতোষ ওর মুখের দিকে সকৌতুকে লক্ষ্য করছিল জয়শীলা। কিন্তু মুখের হাসি মুখেই মিলিয়ে গেল। কতক্ষণ লাগে চার লাইনের ইংরেজি চিঠিটা পড়তে। অর্থ বুঝতে পারছে না নাকি সে, নাকি বানান করে পড়ছে।

হঠাৎ জয়শীলাকে অবাক করে দিয়ে নির্বানীতোষ তালগোল পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলল চিঠিটা মেঝেতে। তারপর যেন নির্বানীতোষের গলায় অন্যকেউ কথা কয়ে উঠল ঃ 'না না ওসব চলবে না…'

জয়শীলার গালে যেন চড় বসিয়ে দিল নির্বানীতোষ। অপ্রত্যাশিত আঘাতে অনেকক্ষণ বোবা-ধরার মতো থ হয়ে রইল সে। তারপর হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে উঠে বললে, 'কী, কী চলবে না…'

নির্বানীতোষের মুখের দিকে যেন চাইতে পারছে না জয়শীলা। অবরুদ্ধ ক্রোধে ওর মুখে কে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে। আর ওর চোখের তারা দুটো যেন বোঁ-বোঁ করে ঘুরছে, চোখের শাদা অংশে ছিটছিট রক্তকণাবাহী শিরাগুলো যেন এখুনি জোঁকের মতো ফুলতে-ফুলতে ফেটে পড়বে। রাগ অনেক দেখেছে জয়শীলা, কিন্তু রাগ যে কখনো এমন কুৎসিত এমন অশ্লীল দেখাতে পারে, ধারণা ছিল না তার।

বিড় বিড় করে আবার বকে উঠল নির্বানীতোষ। 'আই ওয়াণ্ট ফ্যামিলি হ্যাপিনেস ঃ আমি দাম্পত্য সুখ চাই।'

জয়শীলা মূঢ়ের মতো বললে, 'তোমার কথা আমি কিছু বুঝতে পারছিনে। দাম্পত্যসুখ—ফ্যামিলি হ্যাপিনেস—কী বলছ ওসব কথা…'

'না। আমি এসব পছন্দ করিনে।'

জয়শীলা শক্ত গলায় বললে, 'কথাটা পছন্দ-অপছন্দের নয়। প্রয়োজনের।'

নির্বানীতোষ বললে, 'প্রয়োজন নিয়ে বড্ড বেশি মাথা ঘামাচ্ছ নাকি? কে বলেছিল তোমাকে দরখাস্ত করতে, কবেই-বা ইণ্টারভিয়ু দিলে, আমাকে লুকিয়ে এসব করার মানে কি?'

'তোমাকে লুকিয়ে…বলার মানে? কেন? কী অপরাধ করেছি আমি?'

নির্বানীতোষকে সিগারেট নিয়ে মনোযোগী হতে দেখা গেল।

জয়শীলা আবার বললে, 'তোমার কি ধারণা আমি আমার টয়লেটের খরচ জোগাবার জন্যে চাকরি নিচ্ছি? আর, দাম্পত্যসুখ বলতে তুমি কি বোঝাতে চাচ্ছ? ঘরের মধ্যে পাঁচিল গেঁথে তুললেই কি তোমার ধারণা দাম্পত্যসুখ বস্তুটি পাকা মজবুত হয়! সুখ মানুষের ঘরের ভেতরে নয়, বাইরেও নয়, সে-মনে। আর তাছাড়া, আমাকে যদি বিশ্বাস-ই না-করতে পারো তাহলে ঘর-বাহির সব সমান।

নির্বানীতোষ মুখ খুলল। গলার স্বর খাদে ঃ 'তোমাকে অবিশ্বাস করবার প্রশ্ন ওঠে না।'

'তবে?' জয়শীলার দু'চোখে জিজ্ঞাসা।

নির্বানীতোষ বললে, 'আপিসে বেজায় খাটনি—'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জয়শীলা হেসে বললে, 'না খাটলে মাইনে দেবে কেন? আর, সংসারের খাটনির পালা কেবল তোমার, আমার কেবল

চেয়ে থাকা। এ কথাটা কেন বুঝতে পারো না নির্বান, সংসারটা শুধু তোমার-আমার নয়। শিবতোষ, মা—ওদের ভালোবাসি বলেই তো খাটনির এত আনন্দ…'

'মা রাজি হবেন না—' নির্বানীতোষ বললে।

'মাকে রাজি করানোর ভার আমার। 'কিন্তু যেখানে আমার জোর, আমার শক্তি সেই তুমি—তুমিই যদি আমাকে ভুল বোঝো, তাহলে আমার দুঃখের সীমা থাকে না…' চোখ ছলছল করে উঠল জয়শীলার।

নির্বানীতোষ ওর হাত ধরে কাছে টেনে নিল। 'এক-এক সময় মাথাটা কেমন হয়ে যায়! তোমাকে যা বলছি তা হয়তো বলতে চাইনি।…এখনো রাগ করে আছ, কই মুখ তোল হাসো দেখি।'

জয়শীলা হাসল। 'তুমি যেন আর এমন কথা বলতে না পারো তারি জন্যেই তো রোজকার করব। জানোঃ আপার ডিভিশন ক্লার্কের চাকরি —ঢুকতেই একশো আশি টাকা পাবো…কক্ষনো মুখ ভার করে থাকতে পারবে না। আবার!'

নির্বানীতোষ হাসল।

'যাই। তোমার খাবারের ব্যবস্থা করি।' জয়শীলা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

জয়শীলা অদৃশ্য হয়ে যেতেই আবার সেই মাথা-কেমন-করা ভাবটা ধীরে ধীরে ছেয়ে ফেলল নির্বানীতোষের মনকে। কেমন একটা অপ্রসন্ন বিরক্তি। অপরিচ্ছন্ন অশুচিতায় নিজেকে অনেক ক্লান্ত লাগল। যদি এই মুহূর্তে প্রাণপণে চিৎকার করে বলতে পারতঃ না না ওসব চলবে না। দাম্পত্য জীবন এতে নষ্ট হয়। বাইরের মনকে আর ঘরে ফেরাতে পারে না মেয়েরা! কিন্তু…কিছুই বলা হয়ে, ওঠে না। জয়শীলার স্থির-দীপ্ত মুখের সামনে এ সব প্রশ্ন হাস্যকর, জলো ঠেকে। প্রবেশ-পথ না পেয়ে নিজের মনের মধ্যে বিরক্তিটা ছোবল মারতে থাকে।

'খোকা—' সুহাসিনী এগিয়ে এলেন। 'বউমা আমাকে সব বলেছে। তা' আমি বলি কীঃ মন্দ কী! শীলার যদি চাকরি করতে কষ্ট না হয়, করুক না।'

কী একটা বিশ্রী কথা জিভের আগায় থরথর করে উঠেছিল, মায়ের মুখের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে রইল নির্বানীতোষ। এত বড় একটা প্রশ্নকে কি করে মা এত সহজ, হাসিহাসি মুখে গ্রহণ করতে পারলেন! এর চেয়ে যদি বাধা দিতেন, আপত্তি তুলতেন তাহলে কত নিশ্চিন্ত হতে পারত সে।

সুহাসিনী যদি কাজের তাড়ায় ঘর থেকে না চলে যেতেন তাহলে সন্তানের কালিঢালা মুখের গভীরে তার মনকেও চিনে নিতে পারতেন। কিন্তু···

নির্বানীতোষ গভীর নিশ্বাস ছাড়ল।

আপিসে প্রথম দিনের অভিজ্ঞতাগুলি সংক্ষেপে এই রকম: বাড়ি থেকে চুপিচুপি পালিয়ে এসে ইণ্টারভিয়ুর দিনে লালরঙের চারতলা বিল্ডিংটি দেখে আজকের মতো এমন নার্ভাস বোধ করেনি। নির্বানীতোষও পাশাপাশি সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠেছিল। এস্টাব্লিশমেণ্ট-এ জয়েনিং রিপোর্ট দিয়ে সেকশেন খুঁজে সুপারিনটেনডেণ্ট-এর সঙ্গে সেই-ই কথা বলে জয়শীলার অনেক সমস্যা সহজ করে দিয়েছিল। সুপারিনটেনডেণ্ট মিঃ দত্ত—তারই মতো কি বছর কয়েকের বড়ই হবেন। হাসতে জানেন, কথা বলতে জানেন। তারচেয়েও বেশি জানেন পদমর্যাদা এবং আচরণবাদ। সামনের চেয়ারে বসতে দিয়েছিলেন দুজনকে। বেশিক্ষণ থাকেনি নির্বানীতোষ, নমস্কার করে বেরিয়ে গেছে। বিরাট হল্‌ঘরটায় টেবিল, হোয়াট-নট, ফাইলের আড়ালে কুতূহলী কেরানিদের চোখের দৃষ্টির সামনে অনেকক্ষণ বসে ঘামতে লাগল জয়শীলা। জনদশেক পুরুষদের মধ্যে চারজন মহিলাও আছেন। কিন্তু, ভালো করে তাকিয়ে দেখবার মতো মনের ধীরতা ছিল না তার। মাথার ওপরে লম্বা রডে-ঝোলানো ফ্যানের সরব আওয়াজ আর পুরানো জমে-ওঠা কাগজের গন্ধ অথবা ডি. ডি. টি-র ঝাঁজে মাথা ঝিমঝিম করছিল জয়শীলার। আর সুপারিনটেনডেণ্ট-এর মাথার উপরের ঘড়িটিও যেন প্রাচীনতার মূর্ত প্রতীক। নিবিষ্টমনে কাজ করে যাচ্ছেন মিঃ দত্ত। মাথায় পাতলা হয়ে-আসা চুল, ভোঁতা শক্ত আঙুলে বিভিন্ন ধাতুর আঙটির ঘোষণা। কলমটা বোধ হয় শেফারস্।

চেয়ারে বসে-বসে পিঠ ব্যথা করে উঠল। একবার কুঁজো হয়ে, আর একবার পা আল্‌গা করে দিয়ে একঘেয়েমি কাটাবার চেষ্টা করল জয়শীলা।

এখন কি করতে হবে, কোথায় বসবে। কোনো নির্দেশই দেন না কেন মিঃ দত্ত। নাকি, একটু বেরিয়ে আসবে বারান্দা বরাবর, এ্যাসেম্বলি হাউসের ওধারে, হাইকোর্ট পর্যন্ত। কিন্তু, চেয়ার থেকে উঠে পড়বারও কোনো প্রেরণা পায়না সে। উঠতেই জিগ্যেস করবেন নিশ্চয়ই মিঃ দত্ত, জবাব দিতে হবে কথার, সঙ্গে সঙ্গে ফাইলের স্তূপের এধার ওধার থেকে

কৌতূহলী মাথাগুলো তাদের দৃষ্টি দিয়ে তাকে বিদ্ধ করতে থাকবে। সে বড় অপ্রস্তুত, বড় লজ্জা। তারপর না হয় অনুমতি নিয়ে বেরোলো একবার, কিন্তু আবার তো ঢুকতে হবে, আবার সেই এতগুলি মাথা, তাদের সন্ধানী দৃষ্টি—লজ্জা, মাগো।

সুপারিনটেনডেণ্ট হঠাৎ চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন। হাতের ফাইলটা বগলে করে ত্বরিতপায়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

জয়শীলা আবার নতমুখে টেবিলের কোণটা নখ দিয়ে খুঁটতে লাগল। মিঃ দত্ত এতক্ষণ ছিলেন তাও নিজেকে নিয়ে এত পীড়িত বোধ হচ্ছিল না, কিন্তু এবার এই অপরিচিত রাজ্যে নিঃসঙ্গ মনের আকাশে আরো সংকোচ আরো ব্রীড়া পাকে-পাকে জড়িয়ে ধরল তাকে।

ভারি কতকগুলি মিনিট কেটে গেল।

আর কয়েক সেকেণ্ড বিলম্ব হলেই যেমন মনের অবস্থা হয়েছিল জয়শীলার হঠাৎ পা টিপে টিপে বেরিয়ে যেত ঘর থেকে বাইরের বারান্দায়, তারপর সিঁড়ি খুঁজে ঊর্ধ্বশ্বাসে নেমেই পড়ত হুদ্দাড় করে, আর উন্মুক্ত রাজপথে নেমে চোখকান বুজে একটা ট্যাক্সিতেই উঠে পড়ত, কিন্তু সে সব কিছু করবারই সুযোগ পেল না জয়শীলা।

ফিরে এসে মিঃ দত্ত বললেন, 'আপনি আমার সামনের এই টেবিলেই বসবেন। কাজকর্মগুলো বুঝে নেবেন ভালো করে।'

জয়শীলা নীরবে মাথা নাড়ল।

মিঃ দত্ত বললেন : 'এই প্রথম আপিসের চাকরি, আশা করি?'

'হ্যাঁ—'

'এম. এ-তে কী ছিল?'

'দর্শন।'

'চাকরিশাস্ত্রের কিন্তু কোনো দর্শন নেই মিসেস চ্যাটার্জি।' বুদ্ধিমানের গলায় হাসলেন সুপারিনটেনডেণ্ট। 'চাকরি তো পেলেন। থাকবেন তো?'

জয়শীলা হাসল শুধু।

মিঃ দত্তও হাসলেন। 'কথাটা হাসির মতো লাগলেও মোটেই হাস্যকর নয়। প্রতি বছর কলেজ য়ুনিভার্সিটি থেকে জুয়েল ছেলেরা এসে এখানে চাকরি নিচ্ছে, আর কয়েক বছর যেতে না যেতেই কেউ কলেজে, ডব্লু বি. সি. এস. পাশ করে সরে পড়ছে। এই দেখুন না : আমাদেরই ডিপার্ট-মেণ্টের ধ্রুবপদ মিত্তির বলো এক ভদ্রলোক দশ বছর এখানে আপার

ডিভিশন ক্লার্ক হিসেবে কাজ করলেন, তারপর হঠাৎ পাকা পেনশনেবল সরকারি চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে আগরতলা না কোথায় এক বেসরকারি কলেজে কম মাইনের প্রফেসারি নিয়ে চলে গেলেন। অথচ, কতবার বললাম মিত্তিরকে সুপারিনটেনডেণ্ট-এর পরীক্ষাটা দিয়ে দাও, একদিন অফিসার হতে পারবে নির্ঘাত।' তারপর একটু থেমে চেয়ারে কাত হয়ে শেষ করলেনঃ 'বুঝলেন মিসেস চ্যাটার্জি, জীবনের আসল লক্ষ্য হচ্ছে কেরিয়ার তৈরি করা।'

মিঃ দত্তের গলায় যেন মামাবাবুর মৃত আত্মা কথা কয়ে উঠল কেরিয়ার! জীবনের আসল লক্ষ্য হচ্ছে কেরিয়ার তৈরি করা! জীবনে ওই একটিমাত্র শব্দ, যার বিরুদ্ধে জয়শীলার সারা জীবনের সংগ্রাম।

টিফিনের সময় মিঃ দত্ত বললেন, 'আজ মঙ্গলবার। আজ আর কোনো কাজ দেবো না আপনাকে। বসতে চান বসতে পারেন। আর যদি অসুবিধে বোধ করেন ঃ ছুটি দিচ্ছি, বাড়ি যেতে পারেন।'

'ধন্যবাদ।'

এতক্ষণে হাঁপ ছেড়ে যেন বাঁচল জয়শীলা।

আবার রাজপথ।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল জয়শীলা। ভয় অবশ্য খুবই ছিল, কিন্তু নতুন সব জিনিসেরই তো ভয় আছে। আর মিঃ দত্ত মানুষটি গম্ভীর বটে তবে সহানুভূতিহীন নন। যে কোনো অসুবিধায় তাঁর সাহায্য পাওয়া যাবে, তিনিই তো হাতে কলমে কাজ শেখাবেন।

জয়শীলার যদি একটু খেয়াল থাকত তাহলে বুঝতে পারত তার কোনো কথাই শুনছে না নির্বানীতোষ। আধা-অন্ধকারে ওর চোখদুটো কেবল চাপা উত্তেজনায় জ্বলছে। নির্বানীতোষ অত্যন্ত নীরব, ভয়াবহ রকমের নীরব।

কথা কইতে কইতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল জয়শীলা।

নির্বানীতোষের চোখে ঘুম নেই।

জয়শীলার ঘুমশিথিল দেহের দিকে চেয়ে আজ আর কোনো কামনার

শিখা জ্বলে উঠল না নির্বানীতোষের চোখে। বাতির এক টুকরো মুগ্ধ আলো এসে থমকে পড়েছে জয়শীলার মুখে। মনে হল : সে-মুখে অনেক প্রশান্তি, অনেক তৃপ্তি। হঠাৎ মনে হল নির্বানীতোষের : যেন কত আলাদা, স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনা ওর মুখেচোখের আনন্দে। আর সেই আনন্দিত তৃপ্তিমাখা মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে অনেক ক্লান্ত আর অসহায় মনে হল নিজেকে। ক্লান্তি আর অসহায়ত্ব যতই ঠাণ্ডা কম্বলের মতো জড়িয়ে ধরতে চাইল তাকে ততই কালো হয়ে উঠল মুখ, সমগ্র চেতনা। আর অদ্ভুত বন্যতায় কেন সিনেমার ওথেলোর শেষদৃশ্যটি বীভৎস মুখভঙ্গি করে দুলে উঠতে লাগল চোখের পরদায়। কী নাম বলেছিল জয়শীলা তার প্রথম ভালোবাসার লোকটির! দেবপ্রিয়! জয়শীলা ওকে ভালোবাসত, কতোখানি, কতদূর এগিয়েছিল ওদের প্রেমপর্ব। আর কথাটা মনে পড়তেই আরো বিদ্বেষ ঘন হয়ে উঠল নির্বানীতোষের মনে। যে-মেয়ে একবার ভালোবেসেছে, তার ভালোবাসার পাত্রের অভাব নেই। মেয়েদের প্রেম-করা একধরনের বিলাসিতা, দামি শাড়ি, গহনার মতো। দেবপ্রিয়কে ভুলে যে মেয়ে নির্বানীতোষকে আশ্রয় করেছে, নির্বানীতোষকে ভুলে আর একজনকে আঁকড়ে ধরতে তার কতটুকু সময় লাগে! আর নিজের হাতেই সে সম্ভাবনার আলগা পথেই ছেড়ে দিয়েছে সে জয়শীলাকে।

আর একবার জয়শীলার তৃপ্তি-ধৌত মুখের দিকে অনিমিষে তাকিয়ে থেকে আবার নিদারুণ অসহায়ত্বে গুমরে উঠল নির্বানীতোষের সমগ্র চিত্ত।

রাত্রির বয়েস বাড়ল।

আলাপ করবার প্রতিভা মেয়েদের স্বভাবজাত। সে বাড়িতেই হোক, কি রাস্তায় হোক, কি আপিসেই হোক। তাদের স্বভাবের চারপাশে ঘিরে থাকে একটা ঘরোয়া আবহাওয়া, যেখানেই যাক এই আবহাওয়ার বাষ্পে তাদের পরিবেশকে তারা ভরে রাখতে জানে।

জয়শীলার সেকশনে চারজন মেয়ে। সুশীলা, সুধা, বিজয়া আর নির্ঝরিণী।

সেদিন টিফিনের সময় ওরাই জোর করে নিয়ে গেল চারতলায় টিফিন-রুমে। সুশীলা আর সুধা দুজনেই বয়সে বড়। আর ওদের দু'জনকেই বেশি ভালো লাগল জয়শীলার।

রোগা শুকনোমতো চেহারা। সুশীলা। মাথায় অযত্নেলাঞ্ছিত পাতলা চুলের রাশ। মরুভূমির মতো উষর চওড়া সিঁথি। চোখদুটো ছোটো অথচ ধারালো। কথা কম বলে। কিন্তু, কথা বলার কায়দায় তার সমগ্র মন ঝলমল করে ওঠে। যেন পৃথিবীতে অনেক কিছু দেখেছে, জেনেছে। আজ আর দেখার কিছু নেই, নেই জানার কিছু। তাই সব কিছুতে তার কৌতুক, ঠাট্টা।

বেঁটেখাটো হ্রস্ব মানুষটি সুধা। বিয়ে হয়নি। কৌতূহল আছে। কিন্তু এই কৌতূহল নির্লজ্জ, অসভ্য নয়, সহানুভূতি আর প্রীতির রসে ভেজা।

বিজয়া আর নির্ঝরিণী দুজনেই বোধহয় তার সমবয়নী। জীবনে দায়িত্ব কম, তাই সমস্যার বোঝায় তাদের মনের প্রগল্‌ভতা তলিয়ে যায়নি। তারা নির্দ্বিধায় মন খুলে আড্ডা দিতে পারলে আর কিছু চায় না।

নির্ঝরিণী হাসতে হাসতে বললে, 'আপনাকে যে ভাই সুপারিনটেনডেণ্ট একেবারে মাথার মণি করে রেখেছেন!'

সুশীলা বললে, 'তোর চোখ টাটাচ্ছে কেন, শুনি?'

নির্ঝরিণী বললে, 'বা! টাটাবে না! আমাদের না হয় জয়শীলার মতো রূপ নেই, তবু মেয়ে তো।'

বিজয়া বললে, 'কেন বাছা, তোমাকে ঘিরে গুনগুন করবার লোকের তো অভাব নেই। নির্মল…'

নির্ঝরিণী বললে, 'নির্মল শুধু গুনগুন করতেই জানে। ন্যাকা! বিয়ে করবে আমাকে?'

'বাবা! এতদূর তলে তলে!'

'নয় কেন? মনের মতো বর পেলে আপিসে কোন্ মেয়ে কলম পিষতে আসে, তুই আসবি?'

সুশীলা বললে, 'বিয়ে করলে চাকরি করতে হবে না, এ-বিশ্বাস তোমার কেমন করে হল? এই তো জয়শীলার কপালে টকটকে সিঁদুর, ওর স্বামী ডাক্তার—তবু ওকে চাকরি করতে আসতে হয় কেন?'

নির্ঝরিণী একটু দমে গেল। তারপর জোর দিয়ে বললে, 'জয়শীলা নিপাতনে সিদ্ধ। বিয়ে করেও অনেক সময় বিনা কারণে মেয়েরা চাকরি করতে আসে কেবল স্বাধীন থাকবে বলে! হাসি পায় এইসব মেয়েদের দেখে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সৃষ্টিকর্তা যাদের সর্বরকমে পুরুষের নির্ভরশীল করে রেখেছে তাদের স্বাধীনতার দাবি হাস্যকর। যুগে যুগে মেয়েদের পরাধীনতাই বলো স্বাধীনতাই বলো, দিয়েছে পুরুষেরাই।'

বিজয়া হাসল। 'কলেজের ডিবেটিঙ-এর পুরানো অভ্যাস আজো তোমার কাটেনি দেখছি।'

নির্ঝরিণীর নাকের পাতা ফুলে উঠল। 'ওসব কথার চালাকিতে আমাকে দমানো যাবে না। আমি এ-ব্যাপারে সনাতনপন্থী। বলছিতো আমাকে মনের মতো বর এনে দাও, আমি এই মুহূর্তে চাকরি ছাড়ব, আর পাঁচ বছর বাদে তোমাদের জানিয়ে দিয়ে যাব। আমার সুখ আর সৌভাগ্যকে স্বয়ং কুইন এলিজাবেথও ঈর্ষা করবেন সেদিন।'

সুশীলা বললে, 'তোমাদের কথার চাপে জয়শীলাকে একেবারে কোণঠাসা করে দিলে দেখছি। নির্ঝরিণী শুধু ঝরঝর করে কথা কইতেই পারে, জানে না যে মাঝেমাঝে থামাও দরকার।'

নির্ঝরিণী হাসল। 'বেশ। এই থামলাম।'

সুধা বললে, 'জয়শীলা আজ আমাদের গেস্ট। ওকে খাওয়ানোর ভার আজ আমাদের। যা না ভাই বিজয়া, কুপন নিয়ে আয়, পাঁচখানা টোস্ট আর পোচ্—'

জয়শীলার মৃদু আপত্তি ওদের প্রবল আবেগের জোয়ারে ভেসে গেল।

টোস্ট চিবোতে-চিবোতে সুশীলা বললে, 'সুপারিনটেনডেণ্টকে বলুন আপনার আলাদা সিট দিতে। নিজে থেকে না বললে দেখবেন ওঁর চাড় হবে না।'

জয়শীলা বললে, 'বলব।'

নিচে নেমে এসে সুপারিনটেনডেণ্ট-এর চেয়ারের সামনে বসতেই মিঃ দত্ত অমায়িক হাস্যে জিগ্যেস করলেন: 'কোথায় গিয়েছিলেন?'

জয়শীলা বললে, 'চা খেতে।'

'বেশ বেশ।···ড্রাফ্‌টটা হয়েছে?'

'না। পারছিনে।' হাসল জয়শীলা। ভীরু-ভীরু।

'ও কিছু নয়। দু' একদিনেই ঠিক হয়ে যাবে। ড্রাফ্‌ট মোটেই লম্বা করবেন না—এই তিনচার লাইনের মধ্যেই শেষ করবেন। এই দেখুন না: আমি এটা লিখেছি—' একটু থেমে চেয়ারে হেলান দিয়ে আবার বললেন: 'জানেন মিসেস চ্যাটার্জি, সত্যিকারের কাজের লোকদের কাজ শিখতে দেরি হয় না। আমরা অনেকেই—কিছু মনে করবেন না—আপিসের কাজকে আমাদের নিজেদের কাজ মনে করিনে। কিন্তু এটা ঠিক নয়। আমার কি বিশ্বাস জানেন: যারা সত্যিকারের কাজের লোক তারা কাজকে পরম

পবিত্র বলে' জানে। সে-কাজ আপিসেরই হোক, বাড়িরই হোক। আপনি কি বলেন?'

'নিশ্চয়ই।'

মিঃ দত্ত বললেন, 'অবশ্য এ কথা ঠিক ঘড়ি ধরে কাজ করার অভ্যেস আমাদের একেবারেই নেই। না-থাকাই উচিত, মানুষ তো আর যন্ত্র নয়। টিফিন করতে বেরোলে ঠিক যে সময়-মতোই ফিরতে হবে, একথা আমি মনে করিনে।' মৃদুমৃদু হাসতে লাগলেন সুপারিনটেনডেণ্ট। তারপর বললেন আবার: 'আমি চাই কাজ। স্পীডি ডিসপোসাল। ভালো কথা: আপনার স্বামী তো ডক্টর, চেম্বার কোথায় বললেন? কর্নওআলিশ স্কোয়ারে মানে হেদো। আমার একটা এডভাইস চাই—'

জয়শীলা বললে, 'বেশ তো যাবেন। আমি বলে রাখব।'

মিঃ দত্ত বললেন, 'ছুটির পর আজ কী খুব তাড়াতাড়ি আছে? নেই তো? একসঙ্গে বেরোনো যাবে—'

'বেশ তো।'

অফিসারের ঘরে ফাইল নিয়ে মিঃ দত্ত উঠে যেতে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল জয়শীলা।

পাঁচটার পরে সেকশনের সকলে বেরিয়ে গেলেও সুপারিনটেনডেণ্ট-এর চেয়ারের সামনে স্থির হয়ে বসে রইল জয়শীলা। পাঁচটার পরেই যেন ওঁর আসল কাজের তাড়া। টেবিলে গোটা কয়েক ফাইল। ফাইলের অরণ্যে হারিয়ে গেছেন মিঃ দত্ত। জয়শীলা যে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে, এ খেয়ালও নেই তাঁর।

ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটা। বাইরে সন্ধ্যে নামছে। প্রকাণ্ড বিল্ডিঙটায় ভূতুড়ে মৌন নেমে আসছে।

হঠাৎ একবার ফাইলের থেকে সামনে মুখ তুলে তাকাতেই যেন ঘুমঘুম আচ্ছন্নতা ভেঙে কথা ক'য়ে উঠলেন মিঃ দত্ত: 'এ কী আপনি এখনো যাননি!'

বিস্মিত হবার পালা এবার জয়শীলার। 'আপনি যে বললেন একসঙ্গে বেরোবেন—'

'এইরে। একদম ভুলে গেছলাম। এক্সকিউজ মী। আজ আর সময় পাব না মোটেই। দেখছেন তো কাজের চাপ। আপনার দেরি করে' দিলাম! আচ্ছা আপনি চলে যান।'

নমস্কার করে' চিন্তিত মুখে বেরিয়ে এল জয়শীলা।

পরদিন সুপারিনটেনডেণ্ট আসেননি আপিসে। কাজের তাড়া ছিল না জয়শীলার। কিছুক্ষণ মিঃ দত্তের শূন্য চেয়ারের মুখোমুখি বসে গতদিনের ড্রাফ্‌টটা আবার কায়দা করবার চেষ্টা করল। কাটাকুটি করে' অবশেষে দাঁড় করাল সেটা। অন্য টেবিলেও আজ আর কাজের যান্ত্রিক তাড়না নেই। হাতের চেয়ে আজ মুখেরই উৎসাহ দ্বিগুণিত হয়ে উঠেছে।

চাক-ভাঙা মৌমাছির গুঞ্জন।

সুশীলা ওর টেবিল থেকে ডাকল: 'এই জয়শীলা—'

জয়শীলা উঠে এল ওর টেবিলের কাছে। পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ল সে। ওদিক থেকে সুধা নির্ঝরিণী। সুশীলাকে ঘিরে যেন গুলতানিটা জমে উঠল। পাশের টেবিল থেকে সুকমল, বিকাশ, রামভদ্র পর্যন্ত কলম ছেড়ে আলাপে কলকল করে উঠল।

একটা লোক আজ অনুপস্থিত আর তার বিহনে সমস্ত ডিপার্টমেণ্ট আজ বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

সুকমল হাসতে-হাসতে বললে, 'সুপারিনটেনডেণ্ট মিসেস চ্যাটার্জিকে এমন ভাবে আগলে রেখেছেন যে আমরা আলাপ করবার সুযোগ পাইনে।'

সুশীলা বললে, 'আজ বুঝি তাই সুদেমূলে পূরণ করতে এসেছেন। সব মেয়েকেই কি আমাদের মতো পেয়েছেন যে দুদিন না-যেতে-যেতে আপিসটাকে মেছোবাজার বানিয়ে তুলবে।'

সুকমল হাসল আবার। 'চাকরির জাঁতাকল তো সমস্ত রস নিঙরে নিচ্ছে এর মধ্যে একটু যদি ফূর্তির জোগান না থাকে তাহলে বাঁচব কি করে? আপনি কি বলেন মিসেস চ্যাটার্জি—'

জয়শীলা না-হেসে পারল না। বললে, 'চাকরির অভিজ্ঞতা তো আমার আপনাদের চেয়ে বেশি নয়…'

পাশ থেকে বিকাশ কথা কয়ে উঠল: 'আচ্ছা আপনারা কেরানিগিরি করতে আসেন কেন বলুন তো? আপনার স্বামী তো শুনেছি ডাক্তার…'

জয়শীলার হয়ে নির্ঝরিণী ঝরঝর করে উঠল: 'বিকাশবাবু, আপনিও তো এম. এ. ফার্স্টক্লাশ, আপনিই-বা এলেন কেন কলম পিষতে?'

বিকাশ এমনভাবে জব্দ হবে, ভাবেনি। বললে, 'আমাদের ছেলেদের কথা ছেড়ে দিন। আমাদের সমস্যা অন্যরকম।'

'তুই থাম।' সুকমল থামিয়ে দিল ওকে। 'কথাটা কি জানেন মিসেস চ্যাটার্জি, যে ভাবেই হোক আমরা এখানে এসে জুটেছি। কিন্তু এই জীবনটাকে

সিরিয়স ভাবে গ্রহণ করবার কারণ নেই। আমরা যা করছি তাকে অর্থনীতিতে আনপ্রোডাকটিভ লেবর ছাড়া কিছু বলা যায় না। আপনার কি মত মিস দত্ত?'

সুশীলা বললে, 'আমার মতটা কি খুবই জরুরি? চাকরির জগতটা যদি একেবারেই আন-সিরিয়স হয়, অন্তত মাসান্তে মাইনে পাওয়ার মতো বাস্তব ঘটনাটা তো আর আন-সিরিয়স নয়!'

রামভদ্র এতক্ষণ পর মুখর হল। বললে, 'আপনারা মেয়েরা হচ্ছেন জলজ্যান্ত এক-একটি মনিব্যাগ। আপটন সিনক্লেয়ার আপনাদের সম্বন্ধে বলেছেন: আপনারা সেল্‌ফ কনসাস নন, মনি কনসাস্…'

সুশীলা হাসল। 'আপনার সিনক্লেয়ারসাহেব নিশ্চয় আপনার মতোই একজন পুরুষ!'

উদ্দাম হাসির তুফান উঠল।

রামভদ্র নাছোড়বান্দা। বললে, 'আপনি আমাকে ঠাট্টা করতে পারেন। ঠাট্টা করলেই তো আর কথাটার সত্যতা হ্রাস পায় না।'

সুকমল বললে, 'ওর কথা ছেড়ে দিন মিস দত্ত। ওটা একনম্বরের স্বার্থপর। বাড়ি থেকে ওর বিয়ের কথা হচ্ছে ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির গোঁ ধরে বসেছেন: চাকরি-করা মেয়ে ছাড়া বিয়ে করবেন না!'

রামভদ্রের সারা মুখে যেন রক্তোচ্ছ্বাস দেখা গেল। তোতলামি করে কি উত্তর দিতে গিয়ে চুপ করে গেল সে।

প্রথম-প্রথম এদের কথাবার্তায় অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ করলেও অসহ্য লাগেনি জয়শীলার।

কিছুদিন ওদের সঙ্গে মিশে অন্তত এইটে বুঝেছে এরা ক্ষতিকর নয়, সাধারণ সহজ মানুষ, হাসিকান্না সুখদুঃখঘেরা এদেরও জীবন। শুধু আপিসের একঘেয়েমির মধ্যে জীবনের মরিয়া ঝোঁকটা যখন ছটফট করে ওঠে তখন ফূর্তি আর প্রাণিন আবেগের জোয়ারে মাঝে মাঝে একঘেয়েমিকে কাটাতে চায়।

সেদিন টিফিনে সেই চারজন মেয়ের সঙ্গেই ছিল জয়শীলা। পরে সুকমল আর বিকাশ গিয়ে জুটেছিল। গল্প করতে-করতে সেদিন সেকশনে ফিরতে একটু দেরিই হয়েছিল সকলের।

সুপারিনটেনডেণ্ট-এর সামনে চেয়ার টেনে বসতে-বসতে ওঁর অস্বাভাবিক গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে কেমন অস্বস্তিবোধ করতে লাগল জয়শীলার।

মিঃ দত্ত যে অসন্তুষ্ট হয়েছেন জয়শীলার দিকে না-তাকিয়ে তাঁর নিজের কাজকর্মের মধ্যে ডুবে-থাকার ধরনেই সেটা বোঝা যাচ্ছিল।

অসমাপ্ত ফাইলটা টেনে বসল জয়শীলা। কিছুক্ষণ কি লিখল ঘস্‌ঘস্ করে, কাটল, আবার লিখল। একবার মুখ তুলে সুপারিনটেনডেণ্ট-এর মুখের চেহারা দেখে নেবার চেষ্টা করল।

অনেকক্ষণ পর মিঃ দত্ত বললেন, 'শুনুন—'

চোখ তুলে তাকাল জয়শীলা।

মিঃ দত্ত বললেন, 'রামভদ্রবাবুর ডানদিকে আপনার সিটের ব্যবস্থা হয়েছে। কাল থেকে ওখানেই বসবেন।'

একটু মৌন থেকে জয়শীলা বললে, 'আচ্ছা।'

সুপারিনটেনডেণ্ট আবার কাজের অতলে হারিয়ে গেলেন।

জয়শীলা ফাইলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

ফ্যানের পাখায় সময় আবর্তিত হয়।

'আর হ্যাঁ ঃ' হঠাৎ মুখ তুলে সুপারিনটেণ্টডেণ্ট বললেন ঃ 'মিঃ চ্যাটার্জি এসেছিলেন। অনেকক্ষণ বসেছিলেন আপনার জন্যে। টিফিনের পরও কিছুক্ষণ ছিলেন। বেশ ভদ্রলোক।'

একটু চমকে উঠল জয়শীলা। নির্বানীতোষ আপিসে এসেছিল। তারই খোঁজে। কেন? হয়তো আপিসপাড়ায় এসেছিল কোনো কাজে। স্বামীর মুখ মনে পড়তেই মনটা কেমন ভিজে-ভিজে হয়ে ওঠে। আপিসের নিয়মনিষ্ঠ চাহিদা দাম্পত্যজীবনের অনেকটা সময় খাটো করেছে, এ কথা তো মিথ্যে নয়। সারাদিনে আর কতটুকু সময় দেখা হয় নির্বানের সঙ্গে। শুধু রাত্তিরটা। আর রাত্তিরটাও আসে দেহজোড়া ক্লান্তি আর অবসাদের মধ্যে, কখন যে চোখ জুড়ে আসে, নির্বানীতোষের আগেই প্রায় দিন ঘুমিয়ে পড়ে। ভোরের দিকে আর সময় থাকে না। নির্বানীতোষ উঠে পড়ে, চা খায় শেভ্ করে, তারপর চান করতে বেরিয়ে যায়, ওর জামা কাপড়গুলোও সব সময় হাতের কাছে পৌঁছে দিতে পারে না। অনেকদিন জয়শীলা স্নান করে এসে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে দেখে টেবিলের ওপর ভুল করে রুমালটা ফেলে গেছে নির্বানীতোষ। দুঃখ হয়, কষ্ট হয়। এক-এক সময় রাগও হয় ঃ এত পরনির্ভর কেন নির্বানীতোষ। আপিসে তো জয়শীলাও বেরোয়—নিজের হাতেই তাকে জামা কাপড় বার করতে হয়, রুমাল নিতে বা ব্যাগ নিতে ভুল করলেও কেউ এগিয়ে দেবার নেই জেনেই ভুল করবার উপায় থাকে না। এমন তো

নয় যে জয়শীলা বাড়িতে বসে আছে, সকালের দিকে তারও তো সময় কম। এর মধ্যেও শিবতোষকে খাইয়ে-দাইয়ে পরিষ্কার করে সময় মতো ইস্কুলে পাঠাতে হয়। মা ঠাকুরঘরে থাকলে কোনোদিন মাছের ঝাল বা আলুর ডালনা তাকেই উনুন থেকে সময় মতো নামাতে হয়।

জয়শীলার ছেঁড়া ছেঁড়া ভাবনার মধ্যে দিয়ে অনেক সময় উৎরে গেল।

মাইনে পেতে-পেতে সন্ধ্যে ঘনিয়ে এল প্রায়।

প্রথম চাকরি আর প্রথম রোজকারের টাকা। ব্যাগে পুরতে-পুরতে টাকার কথা ভেবে মনটা অকস্মাৎ স্নেহশীল নরম-নরম হয়ে উঠল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে আজ অনেক উদার বলেও নিজেকে মনে হল।

সুশীলা আর সুধার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে এসপ্লানেড পর্যন্ত এগিয়ে এল জয়শীলা।

সুশীলা বললে, 'চলো এদিকে এলামই যখন অজন্তায় একটু চা খাই—'

বাড়ি-ফেরার তাড়াটা ওদের উদগ্র নয়। কিন্তু, আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে পারলে যেন বাঁচত জয়শীলা। নির্বানীতোষের মুখটাই বেশি করে চোখের সামনে ভেসে উঠছে: জয়শীলার মনেরই ভুল, না কি জন্যে যেন মনে হচ্ছে: নির্বানীতোষ যেন তার থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে। না। আজ আর রাত্রে কিছুতেই 'ওর আগে ঘুমোবে না জয়শীলা, ঘুমে চোখ জড়িয়ে এলেও নয়। তার দিক থেকে যদি কোনো ফাঁক থাকে, তাহলে সে-ফাঁককে বহুগুণে আজ ভরে দেবে জয়শীলা।

চা খেয়ে যখন রেস্তোরাঁ থেকে বেরোলো ওরা তখন পৌনে সাতটা। সুশীলা, সুধা দক্ষিণের ট্র্যাম ধরল।

শ্যামবাজারের ট্র্যামের অপেক্ষায় স্টপে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল জয়শীলা।

কী-একটা ভেবে রাস্তা পার হয়ে মেট্রোপলিটান বরাবর ফুটপাথ দিয়ে সোজা দক্ষিণমুখী ট্যুবাকোর দোকানটায় এসে থামল জয়শীলা।

'কী দেবো?'

'ভালো সিগারেট কি আছে?'

'থ্রি-ক্যাসেলস্, নাইন নাইটিনাইন, ব্ল্যাক এণ্ড্ হোয়াইট, ফাইভ্ ফিফটি ফাইভ...' দোকানদার যন্ত্রের মতো আউড়ে গেল।

ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট-এর নামটা শোনা ছিল জয়শীলার। টাকা বার করে ওটাই কিনল।

ধর্মতলার মোড়ে এসে শিবতোষের জন্যে কিনল রঙের বাক্স। ছবি-ছবি খেলার শখ ওর খুব। ওদের ইস্কুলে কে যেন কিনেছে।

ট্র্যাম-ধরতে সেই সাড়ে সাতটা হয়ে গেল।

হেদোর মোড়ে উঁকি মেরে একবার নির্বানীতোষকে দেখে নিতে ভুলল না। এক হাতে ধূমায়মান সিগারেট, আর অন্য হাতে প্রেসক্রিপশন লিখতে ব্যস্ত।

দরজা খুলে দিলেন সুহাসিনী। 'বৌমা, তোমার আজ দেরি।'

'জয়শীলা হাসল। 'মাইনে নিতে দেরি হয়ে গেল।'

'বৌদি—ও বৌদি—' শিবতোষ যেন অপেক্ষায় ছিল। 'আমার জন্যে কি এনেছ?'

সুহাসিনী ধমকে উঠলেন। 'যা পড় গে।'

জয়শীলা ওকে হাত ধরে টেনে নিয়ে এল ঘরে।

রঙের বাক্স দেখে রঙ ধরল শিবতোষের চোখেমুখে। 'বারে! খাতা কই? ছবি আঁকব কোথায়?'

'খাতা কালকে এনে দেবো। এক দম মনে ছিল না।'

'কিন্তু···আমাকে ছবি আঁকতে শিখিয়ে দেবে কে?'

'আমি দেব।' জয়শীলা ব্যাগটা কাঁধ থেকে খালাশ করে বললে।

'সত্যি?'

'সত্যি—সত্যি—সত্যি।'

'আমি প্রথমে আম আঁকব। জানো বৌদি, আমাদের ক্লাশের সন্তু আম আঁকতে জানে না। আম আঁকতে গিয়ে নাক আঁকে। আচ্ছা বৌদি ঃ আমের কি নাক আছে?'

জয়শীলা ততক্ষণে আপিসের জামা কাপড় ছেড়ে ফেলেছে। তোয়ালেকাঁধে বাথরুমের উদ্দেশে বেরিয়ে যেতে-যেতে বললে, 'তুমি বই নিয়ে বোসো। আমি আসছি।'

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর এলাচের কয়েকটা দানা মুখে দিয়ে ঘরে ঢুকল জয়শীলা নির্বানীতোষ তখন বিছানার ধারে টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে জার্নাল পড়ছিল।

নিঃসাড় পায়ে ব্যাগ থেকে সিগারেটের টিনটা বের করে পিছন দিকে লুকিয়ে সম্রাজ্ঞীর মতো বিছানার দিকে এগিয়ে এল জয়শীলা।

'বলো তো কি এনেছি তোমার জন্যে ?'

'কে ? ও তুমি।' আবার জার্নালের পাতায় ডুবে গেল নির্বানীতোষ।

জয়শীলা বিস্মিত কণ্ঠে বললে, 'তুমি কি এখন পড়বে ?'

'কেন ? পড়তে বারণ করছ ? তাহলে থাক।' জার্নালটা মুড়ে খাটের এক পাশে রেখে দিল নির্বানীতোষ। 'বলো ঃ কি বলবে ?' নিরুৎসুক শীতল গলা নির্বানীতোষের।

ওর মাথার কাছে ঘেঁসে এসে জয়শীলা আবার জিগ্যেস করল ঃ 'বলো তো কি এনেছি তোমার জন্যে ?'

নির্বানীতোষ বললে, 'কী করে বলব। আমি তো গুনতে জানিনা।'

'আহা! কি কথার ছিরি! অনুমানও তো করতে পারো ?'

'অনুমান করাটা কি সবসময় ভালো ? বিপদ আছে যে ওতে!'

'তুমি বলবে না বুঝতে পারছি। এই নাও তোমার সিগারেট…'

'ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট! হঠাৎ কি ব্যাপার ?'

'জানো না আজ মাইনে পেয়েছি। আমার প্রথম মাইনে।'

'তাই বুঝি ঘুস দিতে এসেছ ?' নির্বানীতোষের কণ্ঠস্বর কেমন বেসুরো।

বিস্মিত গলায় জয়শীলা বললে, 'মানে ?'

'ভয় পেয়ে গেলে তো!' নির্বানীতোষ চালাকের হাসি হাসল।

জয়শীলা আরো অবাক হয়ে চেয়ে রইল নির্বানীতোষের মুখের দিকে।

নির্বানীতোষ আবার বললে, 'তোমাদের আপিসে আজ গেছলাম। ঘণ্টা দেড়েকই ছিলাম বোধহয়।'

'হ্যাঁ শুনেছি। কিন্তু আপিসে গেছলে কেন হঠাৎ?' জয়শীলা জিগ্যেস করল।

'খুব অসুবিধে করলাম, না ?'

'মানে ? কী বলতে চাচ্ছ তুমি ? তোমার কী হয়েছে আজ বলো তো ?'

'কী আবার হবে!' নির্বানীতোষ হাসল ঃ 'আপিসটা এমন আড্ডার জায়গা, জানা ছিল না। যাক। আমি নিশ্চিন্ত হলাম।'

নিশ্চিন্ত হতে পারল না জয়শীলা। দু' চোখ তার ক্রোধে জ্বলে উঠেছিল। কিন্তু, রাগতেও পারল না। কেমন পাণ্ডুর ব্যথায় ভরে উঠল সমগ্র চিত্ত। কয়েক মুহূর্ত নিশ্বাস বন্ধ করে অনড় বসে রইল। তারপর আস্তে আস্তে চাপা স্বরে বলে উঠল ঃ 'তুমি, তুমি আমাকে সন্দেহ করো ?' একটা বিবর্ণ ধুসর শূন্যতা যেন জড়িয়ে ধরল তাকে। দেবপ্রিয়ের কাছ থেকে শেষ-

দিন রেস্টুরেণ্ট থেকে ফিরতে-ফিরতে যেমন লেগেছিল। কয়েকটা দিন কেমন ঘোরঘোর আচ্ছন্নতা। খাবারের প্লেটে, চায়ের কাপে, বই-এর পাতায় কেবল দেবপ্রিয়ের মুখ। খেতে পারত না জয়শীলা। বিছানায় এসেও নিস্তার ছিল না। সিলিঙের গায়ে দেবপ্রিয়, বিছানার পাশে দেবপ্রিয়। তার মনের সাম্রাজ্যে তখন দেবপ্রিয়েরই প্রতিবিম্ব। তারপর সে প্রতিবিম্বও ধুসর হল, অস্পষ্ট হল। অস্পষ্ট হল, কিন্তু মিলিয়ে গেল না তো একেবারে। নির্বান তাকে সন্দেহ করে! একটা দীর্ঘনিশ্বাস উদ্‌গত হয়ে হাওয়ায় ভেঙে চুরে গেল। বেদনাটা আরো ছড়িয়ে পড়ল দিগ্‌দিগন্তে। শুধু নির্বানীতোষ নয়, শুধু দেবপ্রিয় নয়—সমস্ত কিছু মিলিয়ে তার জীবনটা যেন হাহাকার করে উঠল। এত অসহায়, নিঃসম্বল বোধহয় কোনোদিন আর মনে হয়নি নিজেকে। কেন, কেন নির্বানীতোষ তাকে অবিশ্বাস করবে? ওর বিশ্বাস হারানোর তো কোনো কাজ করেনি জয়শীলা। ওদের সংসারকে সুখী করতে চায় সে তো শুধু নির্বানীতোষের জন্যেই। ওর খাটনির ভার কিছুটা লাঘব করবার জন্যে। কিন্তু···এর পরেও যদি সন্দেহ করে, অবিশ্বাস করে নির্বানীতোষ তাহলে খাটনির আনন্দও চলে যায়। বেশ তো। যদি আপত্তি থাকে ওর চাকরিটা না হয় ছেড়ে দেবে জয়শীলা।

'শোনো—শুনছ?' জয়শীলা ডাকল।

'বলো?'

'আমি জানতাম না। আমি বুঝতে পারিনি।' জয়শীলা থেমে-থেমে বললে, 'আমি ভেবেছিলাম, যাকগে। শোনো—আমি কালকেই চাকরির রেজিগনেশন সাবমিট করব।' হেসে উঠল সে: 'চুলোয় যাক আমার চাকরি, তারচেয়ে তোমাকে পাওয়া আমার ঢের বেশি। আর তো ভুল বুঝবে না আমাকে!···কই গো, ফেরো না আমার দিকে। আমি কী দেখতে এত খারাপ···'

যেটাকে ঘিরে এত বিক্ষোভের কারণ, সেই কারণটাকেই যে এত সহজে নির্দ্বিধায় উৎপাটিত করে ফেলবে জয়শীলা, বুঝতে পারেনি নির্বানীতোষ। আর জয়শীলার কাছে নিজের মনের চেহারাটা ধরা পড়ে যাওয়ায় লজ্জায় কুঁকড়ে গেল সে। ফাঁসা ফ্যাসফেসে গলায় নির্বানীতোষ বিড় বিড় করে বললে, 'চাকরি ছাড়ার কথা তো আমি বলিনি···'

জয়শীলা বিশীর্ণ হাসল। 'আর মানুষ কি ভাবে বলতে পারে!'

নির্বানীতোষ নিশ্চুপ।

'কী, এখনো রাগ গেল না ?'

নির্বানীতোষ আলোর দিকে তাকাতে পারছে না। কষ্ট হচ্ছে। চোখের ওপর হাতের আড়াল করল সে।

'কী হল ? চোখ ব্যথা করছে ?' জয়শীলা বললে।

'মাথাটা কেমন করছে।'

'হাত বুলিয়ে দি। আরাম হবে।'

জয়শীলার আঙুলগুলো নির্বানীতোষের চুলে, কপালে, চোখের ওপর সঞ্চারিত হতে লাগল। চোখ বন্ধ করে রয়েছে নির্বানীতোষ। চোখের কোলে ক্লান্তির গ্লানি। আগের চেয়ে রোগা। কর্কশ আর কঠিন। সারা গায়ে সিগারেটের আঘ্রাণ। এত সিগারেট খায় কেন নির্বান।

জয়শীলার আঙুলগুলো গালের ওপর টেনে নিয়ে মৃদু গলায় জানাল নির্বানীতোষ : 'এক-এক সময় মাথাটা কেমন করে ওঠে...'

'বাজে-বাজে চিন্তা করলে হবে না! নার্ভে চাপ পড়ে যে।'

'আমাকে তোমার খুব বোরিঙ লাগছে তো ?'

'নাগো। শুধু আমাকে ভুল বুঝো না। ছাখো তো আমার চোখের দিকে চেয়ে আমাকে অবিশ্বাস হয়, তোমার কোনো ক্ষতি কি আমি করতে পারি কখনো!'

নির্বানীতোষ ওকে কাছে টেনে নিল। 'কথা দাও, আমাকে ভুল বুঝে চাকরি ছাড়বে না।'

জয়শীলা হাসল। 'বারে! তুমি শুধু শুধু রাগ করবে, আর আমি চাকরি করব কেন। আপিসে আমি আড্ডা দিই, দশটা ছেলে-মেয়ের সঙ্গে মিশি, হই হই কারি। চরিত্র খারাপ তো হতে পারে ?'

জয়শীলার বুকে মুখ ঘসতে-ঘসতে নির্বানীতোষ মন্ত্রোচ্চারণের মতো কী বলল, বোঝা গেল না। জয়শীলার বুক থেকে একটা পাষাণ ভার নেমে গেল, অনেক হাল্‌কা আর নিশ্বাসও অনেক সহজ শান্ত হয়ে এল।

'এই—এই নির্বান—'

'উঁ ?'

'অনেক রাত হল। ঘুমিয়ে পড়ো। তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।'

'না।'

'ঘুমোবে না ?'

'ঘুম আসছে না!'

'জল খাবে ?'

'না।'

'দুষ্টুমি হচ্ছে। ভীষণ বকব কিন্তু। আবার! এতক্ষণ ঝগড়া করে আদর করা হচ্ছে। এই, এই কী হচ্ছে ?'

হাত বাড়িয়ে আলোটা নিবিয়ে দিল নির্বানীতোষ।

আপিসে পা দিতেই সুধা চেঁচিয়ে উঠল: 'এই যে জয়শীলাও এসে পড়েছে।'

'ব্যাপার কি ?' জয়শীলা ভ্রূর ঢেউ তুলে এগিয়ে এল।

সুশীলার টেবিলের চারপাশে ভিড়টা জমে উঠেছে। মেয়েরা তো আছেই। সেকশনের ছেলেরাও ঘিরে দাঁড়িয়েছে।

'সুকমল আমাদের ছেড়ে যাচ্ছে। ডব্লিয়ু. বি. সি. এস-এ প্রথম সারিতে ওর নাম বেরিয়েছে। ওর সিলেকশনও হয়ে গেছে কাল। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে জয়েন করবে মালদায়।' বললে বিকাশ।

'কনগ্রাচুলেশন!' হাসিভরা চোখ তুলে সুকমলের দিকে তাকাল জয়শীলা।

বিকাশ বললে, 'হ্যাঁ। আমরা ওর ফেয়ারওয়েলের ব্যবস্থা করেছি। সামনে রবিবারে আমরা সেকশনের সকলে মিলে পিকনিকের আয়োজন করেছি বোটানিকাল গার্ডেনে।'

সুশীলা বললে, 'চাঁদা ধরা হয়েছে পাঁচ টাকা। তোমারটা কালকে দিও।'

'আচ্ছা। চাঁদা নিশ্চয়ই দেবো।' জয়শীলা বললে।

'চাঁদা দিলেই হবে না শুধু। যেতেও হবে। আপনারা মেয়েরা না গেলে রান্না-বান্না করবে কে।' বিকাশ বললে।

'বাবা! পিকনিকে আমি যেতে পারব না।' জয়শীলা হেসে মাথা নাড়ল।

'সে কি। সবাই যাচ্ছে। আপনি যাবেন না কেন ?'

জয়শীলা বললে, 'সবাই যাচ্ছে বলেই তো আমার না গেলে ক্ষতি হবে না।'

সুশীলা বললে, 'আমি জানি কেন যাবে না ও। মিস্টার চ্যাটার্জি—'

রামভদ্র হঠাৎ বলে উঠল: 'মিস্টার চ্যাটার্জি বুঝি এসব পছন্দ করেন না ?'

'না না সে কথা নয়...' লজ্জায় লাল হয়ে উঠল জয়শীলার মুখ।

'বেশ তো আমরা ওঁকেও নিমন্ত্রণ করব।' বিকাশ যোগ করল।

জয়শীলা একটু দম নিয়ে হেসে বললে, 'বেশ তো করবেন। কিন্তু ওর কি সময় হবে!'

রামভদ্র বললে, 'তার মানে আপনাদের দু'জনকেই আমরা পাচ্ছি নে।'

সুধা বললে, 'জয়শীলা যদি না যায় তাহলে আমাকে বাড়ি থেকে যেতে দেবে না।'

'কেন?'

'কেন আবার! আমার দাদারা অমনিই। জেরা করবেনঃ মেয়েরা কে কে যাচ্ছে? গার্জেন হতে পারে এমন বিবাহিতা মেয়ে সঙ্গে যাচ্ছে কিনা? সুপারিনটেনডেণ্ট যাচ্ছে কিনা ইত্যাদি এমন হাজারো প্রশ্ন!'

সুধার কথার ধরনে রাগতে গিয়ে সকলে হেসে উঠল।

রামভদ্র বললে, 'যেখানে মেয়েরা সেখানেই গোলমাল। সেই সৃষ্টিকাল থেকেই এই চলছে। শেকসপীয়র বোধহয় তাই দুঃখ করে বলেছেনঃ থ্বাই নেম ইজ ওম্যান।'

বিকাশ বললে, 'বাজে কথা থাক। মিসেস চ্যাটার্জিকে আমরা অবশ্যই আশা করব আমাদের মধ্যে। মিঃ চ্যাটার্জির সঙ্গে আমরা কালকেই দেখা করছি।'

টেবিলে ফিরে এসে কাজ করতে-করতে উন্মনা হয়ে পড়ে জয়শীলা। সহকর্মীরা তো তাকে ভুল বুঝতেই পারে। কি করে বোঝাবে ওদের চাকরি করতে এলেও সবরকমের স্বাধীনতা নেই তার। নিবানীতোষকে তো সে চেনে। পিকনিকের নাম শুনে হয়তো প্রথমটায় জ্বলেই উঠবে। তারপর হয়তো শান্ত হবে পরমুহূর্তে। কিন্তু, তার জন্যে যে দাম, যে তিক্ততা সঞ্চয় করতে হবে জয়শীলাকে যে পরে মত দিলেও পিকনিকে যাওয়ার মতো উৎসাহই থাকবে না অবশিষ্ট।

কেন এমন হয়? কেন নিবানীতোব তার সর্বগ্রাসী অস্তিত্ব দিয়ে তাকে ঘিরে রাখতে চায়! কেন ওর নিজেকে নিয়ে এত দ্বিধাদ্বন্দ্ব। জয়শীলা যে কোনোদিন তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না—এই সহজ চেতনাটুকু তার নেই কেন! নিবানীতোব তো রয়েছেই, চোখের পাতার মতোই তার স্বাভাবিক অস্তিত্ব, বারবার জানান দিয়ে কেন জানাতে চায় সেঃ আমি আছি—আমি আছি। সে আছে বলেই তো আপিসের খাটনিতে এত আনন্দ, পরিশ্রম উদ্দেশ্যহীন নয়, তাইতো সে মনকে ছড়াতে পারে, দশজন

মানুষের সঙ্গে মিশতে পারে, হাসতে পারে, কথা কইতে পারে। ও যদি না থাকত তাহলে কারুর সঙ্গেই যে তার মিশতে হাসতে কথা কইতে ইচ্ছে করত না। এই সহজ কথাটাও কেন বুঝতে পারে না নির্বানীতোষ। কপালের সিঁদুরে হাতের নোয়ায় যে তারই অস্তিত্ব বহন করে চলেছে।

'এই, এই জয়শীলা—'

কে? মুখ তুলে তাকাল জয়শীলা। 'সুশীলাদি!'

'কী বসে-বসে ঝিমোচ্ছিস নাকি?'

'যাঃ—' হাসল জয়শীলা। 'কাজ করছি তো।'

'তোর পেনের কালিটা দেতো। কলমটা বিট্রে করেছে।'

কলমে কালি ভরতে-ভরতে সুশীলা বললে, 'তোকে অমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন। শরীর খারাপ হয়নি তো।'

'না সুশীলাদি, আমার কিছুই হয়নি। কেমন ম্যাজম্যাজ করছে শরীরটা—'

'চল—চা খেয়ে আসি—'

'এখন? আচ্ছা চলো।'

চায়ের পেয়ালা এগিয়ে নিয়ে সুশীলা নরম গলায় জিগ্যেস করল: 'আচ্ছা সত্যি করে বলতো কি হয়েছে তোর?'

'মন কী সব দিন সমান থাকে সুশীলাদি যন্ত্র তো নয়।' ফ্যাকাসে হাসল জয়শীলা।

'মন তো আমাদেরও আছে রে।' সুশীলা বললে: 'আর তারও সব দিন সমান যায় না। আমার কথাই ধর: কোনদিন আমাকে মনমরা দেখেছিস? য়ুনিভার্সিটিতে ঢুকতে না ঢুকতে বাবা মারা গেলেন। নাবালক কতগুলো ভাইবোন, আর আমার বড় বলতে দাদা। দাদা তখন পঞ্চম-বারের মতো জেলে। নিতান্ত বাধ্য হয়েই এই চাকরিতে আসা। বারো বছর তো এই ভাবেই কাটিয়ে দিলাম। দু'বোনের বিয়ে দিয়েছি। ছোট ভাই এম. এস. সি পরীক্ষা দেবে এবার, আর দু'জন ভাইবোন ইস্কুলে পড়ে।'

'আশ্চর্য! তোমার মুখ দেখলে কিছুই বোঝবার উপায় নেই।'

'এইটেই তো আমার রক্ষাকবচ। তখন বয়েস ছিল কচি, নরম মাটির মতো মনটা রাতারাতি সংসারের চাপে একটা স্পষ্ট ছাঁচ পেয়ে নির্দিষ্ট আদল গড়ে তুলতে বেগ পেল না। তোরা হয়তো বলবি: সুশীলাদি নিজের জীবনকে সংসারের বেদীমূলে স্যাকরিফাইস করেছে। কিন্তু, যেদিন

সংসারের রথের রশিটাকে আমি নিজের হাতে অবলীলায় তুলে নিলাম তখন এ-ধরণের সার-কথা আমার মনেই আসেনি। কোনো মানুষেরই আসতে পারে না।'

'এসব কথা কেন বলছ সুশীলাদি?'

'অমনি। হয়তো নিজের মন দিয়ে তোমাকে ছুঁতে পারছি বলেই বলা এত সহজ হচ্ছে। জেল থেকে বেরিয়ে দাদা বিয়ে করেছে সেদিন। দাদা চাকরি পেয়েছে বঙ্গবাসী কলেজে, আর বৌদিও ব্রাহ্ম গার্লইস্কুলের টীচার। কিন্তু, ওরা কেউই ফিরল না; ফিরেও দেখল না আমাদের পুরানো সংসারটার দিকে। কত কী ভেবেছিলাম—যাকগে।'

চায়ের পেয়ালা মুখে দুজনে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

মুখ তুলে মৃদু গলায় জয়শীলা বললে, 'তুমি কেন বিয়ে করো না, সুশীলাদি।'

সুশীলা হাসল। 'আমাকে দেখে কত বয়েস মনে হয়? গেল মাসে চৌত্রিশে পড়েছি। মেয়েদের মনে বিয়ে করবার জন্যে যে বয়েস থাকে, পেরিয়ে এসেছি। এতদিন এত লোককে সান্ত্বনা দিয়েছি, বুড়ো বয়সে নতুন করে কেউ সান্ত্বনা দিতে আসবে, সহ্য হবে না। আমার কথা যাক। তুই অমন মুখ ভার করে থাকিস কেন, বল দেখি।'

'কই, কে বললে?'

'আমার চোখকে ফাঁকি দিবি তুই! তোদের দু'জনের কী একটা গণ্ড-গোল আছে।'

'সত্যি বলছি সুশীলাদি, তুমি যা ভাবছ তা নয়। মাঝে মাঝে ঝগড়া একটু হয় বৈকি। সেটা আমাদের দুজনের স্বভাবের জন্যে। আমার মতো হৈ হৈ স্বভাব ওর নয়, এই জন্যেই। কিন্তু, আসল জায়গায়, আমাদের আণ্ডারস্টানডিঙে গরমিল নেই।'

'না থাকাই উচিত। তাই বুঝি পিকনিকে যেতে তোর আপত্তি। আমার কি মনে হয় জানিস জয়শীলা: দাম্পত্য জীবনটাই হচ্ছে এ্যাডজাস্টমেণ্ট এর ব্যাপার। দুজনকেই কিছু কিছু ছাড়তে হবে। একে অপরের স্বার্থ কিছু কিছু দেখলে শান্তি নষ্ট হয় না। পিকনিকে যেতে যদি সত্যিই নির্বানীতোষের আপত্তি থাকে, নাই-বা গেলি। আজকের না যাওয়ার ফল এমন হতে পারে যেদিন সেইই তোকে হাসিমুখে পিকনিকে কেন, একস-কারশেনেও পাঠাতে আপত্তি করবে না।'

জয়শীলা হাসল। ‘বিয়ে না করেও এত কথা জানলে কি করে সুশীলাদি ?’

‘হয়তো বিয়ের রাজ্য থেকে দূরে আছি বলেই কার্যকারণগুলি বিচার করা সহজ হয়।’

‘তুমি এসব কথা আর কাউকে বলো না সুশীলাদি।’

‘আমি বলব কি রে ? তোর মুখই যে বলে দেয়। যেমন আমি বুঝেছি তোর মুখ দেখে।’ সুশীলা হাসল। তারপর গম্ভীর গলায় বললে, ‘সব মানুষেরই, বিশেষ করে স্বামীস্ত্রীর বেলায় কিছু প্রাইভেসি থাকার দরকার— সেটা সাধারণের আড়ালে যত থাকে ততই মঙ্গল। সাধারণের অনুকম্পা নামক বস্তুটি যত উপকার করে তার চেয়ে পীড়িত করে বেশি। অনেকটা অভিনেত্রীর কায়দায় আসল মনকে লুকোতে চাই মুখের অন্য রঙ। কিন্তু, আর নয়, চল, সেকশনে যাই—’

বছর ঘুরে গেল নির্দিষ্ট গতিতে।

সেদিন আপিস-ফেরত মাসিমার ওখানে গেল জয়শীলা।

বই থেকে চোখ তুলে স্নেহলতা ডাকলেন ঃ ‘আয়।’

‘সব সময় বইএ মুখ গুঁজে থাকো কেন, বলো তো ?’

‘কই, কে বললে ?’ স্নেহলতা হাসলেন জয়শীলার বাহুতে হাত বুলোতে-বুলোতে।

‘কে আবার বলবে ! আয়নায় দেখতে পাওনা চেহারাটা।’

‘নে। তোকে আর গিন্নিপনা করতে হবে না। বিয়ের পরও তো তোর গায়ে একটুও বাড়তি মাংস লাগল না ! আপিসে খাটনি কি খুব বেশি—?’

‘আমাকে একটা মাংসের ডেলার মতো দেখতে না-পেলে ভালো লাগে না তোমার। মেয়েদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কি-যে তোমাদের সেকেলে আইডিয়া।’ জয়শীলা বললে।

স্নেহলতা হাসলেন। ‘শ্বশুরবাড়িতে গিয়েও যদি মেয়েদের স্বাস্থ্যের উল্লেখ-যোগ্য পরিবর্তন না-ঘটে তাহলে লোকে যে শ্বশুরবাড়িরই দুর্নাম করবে রে।’

জয়শীলা মুখ বাঁকিয়ে বললে, ‘তাই নাকি ? শ্বশুরবাড়ি তাহলে মেয়েদের কাছে কড়া টনিক। তোমার মতের একটা কপিরাইট করে ফেলো।’

'করব কি করে রে? তুই যে ব্যতিক্রম হবি। আমার ফরমুলা যে বিকোবে না।'

'যত বাজে কথা। আমার খিদে পায়না বুঝি? আপিস থেকে সোজা আসছি।'

'বোস। খাবার নিয়ে আসছি।'

জয়শীলা আয়েস করে চিত হয়ে শুল বিছানায়। সেই কড়িবরগা, চার দেয়াল, জানালা, আকাশ আর হাওয়ার খুশি। পুরানো ঘর তার গভীর সৌহার্দ্য দিয়ে তাকে যেন গভীর আশ্লেষে জড়িয়ে ধরল। আর সেই সস্নেহ মাদকতার রসে আচ্ছন্ন হয়ে এল চেতনা। বিকেলের আলো-নেবা আকাশে যেমন করে একটি-দুটি তারা ফুটি-ফুটি করে ওঠে তেমনি মেদুর আবিষ্ট হয়ে এল জয়শীলার মন। এই আচ্ছন্নতাকে কাটাবার জন্যে হঠাৎ ধড়মড়িয়ে উঠে বসতে ইচ্ছা করল তার। কিন্তু, পারল না। এই ঘর, ওই জানালার ফাঁকে আকাশের এক ফালি ইশারা, আর অজস্র আলোর খামখেয়ালিপনা তাকে যেন বর্তমান থেকে এক নিমিষে লোপাট করে অতীতের জগতে ঠেলে জাগিয়ে দিতে চায়। দেবপ্রিয়! হঠাৎ দেবপ্রিয়ের স্মৃতির গন্ধে নাসারন্ধ্র ঝিমঝিম করে ওঠে। ট্র্যামের ভিড়ে সহসা কোনো বিলাসী তন্বঙ্গীর শাড়ির উচ্চকিত সুবাস যেমন জানান দিয়ে ওঠে। দেবপ্রিয় কি এখনো চীনে গবেষনার কাজ করে যাচ্ছে! ওকে জড়িয়ে কত কথা, কত ঘটনা মনে ভাসছে জয়শীলার। শুধু কথা আর ঘটনা। কথা আর ঘটনার ভিড় ঠেলে দেবপ্রিয়ের চেহারাটা স্পষ্ট করে আর ধরা পড়েনা চোখের আয়নায়। কী আশ্চর্য, ওর একটা ছবিও নেই তার কাছে। কতদিন ছবি তুলবে দুজনে ভেবেছিল স্টুডিয়োতে গিয়ে, কিন্তু রোজকার দেখাশোনার জগতটা এত সত্য, এত জীবন্ত ছিল যে ক্যামেরার স্তম্ভিত মুহূর্তে তাকে বেঁধে রাখবার প্রয়োজন বোধ হয়নি। কিন্তু, এখন মনে হচ্ছে, ছবি থাকলেই ভালো হত। অন্তত অতীতকে স্মরণ করতে গিয়ে এমন করে অন্ধকারে হাতড়াতে হত না সিঁড়িগুলি। কিন্তু···কী অর্থ এই অতীতকে স্মরণ করে! আজ তার জীবনের সঙ্গে বেঁধেছে আরএকজনকে, তার বর্তমান, ভবিষ্যত— প্রকাণ্ড সত্যটা তার গতিতেই আবর্তিত হচ্ছে। নিবানীতোষের সঙ্গে তার জীবনের কোনো বিরহের অধ্যায় নেই! যদি নিরবচ্ছিন্ন মিলনের মধ্যেও কিছু বিরহের দুঃখ থাকত, তাহলে হয়তো দেবপ্রিয়কে মাঝে মাঝে এমন করে মনে পড়ত না। মনে অবসর থাকলেই বিরহের দুঃখ-সাগর উজিয়ে দেবপ্রিয়ই পা ফেলে-ফেলে আসে।···

'শীলা—এই—'

কে ?…ও মাসিমণি। উঠে বসল জয়শীলা। 'কেমন ঘুম আসছিল মাসিমা—'

'আসবে না ? আপিসের খাটনি কি তোর পোষায় ?'

জয়শীলা খাবারের প্লেট টেনে নিল।

স্নেহলতা বললেন, 'নির্বানীতোষকে কতদিন দেখিনি। তোরা দুজনে একসঙ্গে আসিসনে কেন। তোদের দুজনকে একসঙ্গে দেখতে খুব ইচ্ছে করে।'

'বেশ তো একদিন নেমন্তন্ন করো। ও জামাই মানুষ হুট্ করে আসবে কেন ?' জয়শীলা টোস্টে ডিম মাখাতে মাখাতে হেসে বললে।

'বাবা! খুব কথা শিখেছিস—'স্নেহলতা হাসলেন: 'তোদের কি কার্ড ছাপিয়ে নিমন্ত্রণ করতে হবে।'

'হবে না ? আচ্ছা: তুমিই-বা কদিন গেছ আমাদের ওখানে ?'

'আমার কথা ছেড়ে দে। বুড়ো হচ্ছি নে।'

'ছাই!' মাসিমার কোলে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল জয়শীলা।

স্নেহলতা ওর চুলে হাত বুলোতে-বুলোতে বললেন, 'তোর খুকিপনা গেল না এখনো।'

'গেলে কি তুমি খুশি হতে মাসিমণি ?'

স্নেহলতার আশ্চর্য সুন্দর ক্লান্ত মুখের দিকে অপলকে তাকিয়ে রইল জয়শীলা। মাসিমণির ঘন কালো চুল পাতলা আর লালচে, কপালে কয়েকটা কুঞ্চন, চোখের কোল বসা-বসা। মাসিমার বয়েস হচ্ছে। তবু, কী সুন্দর মাসিমণি। নিঃসঙ্গ সুন্দর।

'মাসিমণি—'

'বল—'

'তুমি আর কতদিন একলা থাকবে…'

'একলা কে বললে। ইস্কুলে কত মেয়ে। ওরা কি আমাকে একলা থাকতে দেয়। বাড়িতেও ওদের কথা ভাবি, ওদের খাতা দেখি, ভুল শুধরে দিই। নিজের সময়টুকু বই পড়ে ওদের যোগ্য হবার চেষ্টা করি।'

'মেসোমশায়ের কোনো খবর পেয়েছ ?'

স্নেহলতা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। পরে বললেন: 'পেয়েছি।'

'কেন ওঁকে আসতে বলোনা মাসিমা। তোমার এই সময়ে…'

'ও তুই বুঝবি নে শীলা।'

'কেন বুঝব না। বুঝিয়ে দিলেই বুঝব। সারাজীবন কি করে কাটাবে, ভেবে দেখেছ কি?'

স্নেহলতা হাসলেন। 'ভাববার অত সময় কোথায়?'

'তবু তো ভাবনাকে ঠেকাতে পারোনি। মামাবাবু মারা যাবার পর থেকে তুমি কত তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে গেছ।'

স্নেহলতা উদ্‌গত নিশ্বাসটাকে হাওয়ার সঙ্গে ছেড়ে দিলেন। ফিশফিশ করে বললেন, 'তা হয়না, হয়না রে শীলা। এতগুলো বছর একভাবে কাটিয়ে দিয়ে আজ শুধু আশ্রয়ের লোভে আর জীবনের মোড় ফেরানো যায়না। সে বড় লজ্জা, বড় অপমান।'

জয়শীলা চুপ করল।

'জঙ্গীপুর থেকে আমার বন্ধু শৈল লিখেছে ওর ছেলে যতীন ইস্কুল ফাইনাল পাশ করেছে ফার্স্ট ডিভিশনে, ওর ইচ্ছা আমার এখানে থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভরতি হয়। ওকেই আসতে লিখে দেবো ভাবছি। আর, তাছাড়া, তোরাই তো রয়েছিস, আমার ভাবনার কি আছে।'

হাত উলটে ঘড়ি দেখে জয়শীলা বললে, 'পৌনে নটা মাসিমা। আজ আমি উঠি।'

'নির্বানীতোষকে নিয়ে আসিস একদিন। কতদিন ওকে দেখিনি।'

'আসব।'

জয়শীলার জুতোর শব্দ নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে।

জয়শীলার পদশব্দ মিলিয়ে যেতেই আবার বোবা নিরেট শূন্যতা গ্রাস করে ফেলল স্নেহলতাকে। অর্ধেক-পড়া বইটা আবার চোখের সামনে খুলে ধরলেন। এক বর্ণও মগজে গেল না।

বই ছেড়ে দিয়ে বারান্দায় উঠে দাঁড়ালেন স্নেহলতা।

হেদোর মোড়ে আসতেই নির্বানীতোষের চেম্বারের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে ভুলল না জয়শীলা। নির্বানীতোষের চেম্বারে ভিড় নেই। চেয়ারে হেলান দিয়ে সিগারেট খাচ্ছে সে।

সিঁড়ি ঠেলে উঠল জয়শীলা।

'এস। এদ্দিকে—হঠাৎ?' নির্বানীতোষ চেয়ারে ঝুঁকে পড়ে জিগ্যেস করল।

জয়শীলা মুখ টিপে হেসে বললে, 'দেখতে এলাম তোমাকে।'

নির্বানীতোষ হাসল। 'ইয়ার্কি রাখো। কোথায় গেছলে। মাসিমার ওখানে ?'

'হ্যাঁ।' বসতে-বসতে বললে জয়শীলা।

'আপিস থেকে বাড়ি যাও নি ?'

'না। শোনো : আর কত দেরি হবে তোমার ?'

'আরো ঘণ্টাখানেক তো বটেই। কেন ? এত জরুরি তলব কিসের ?'

'আমার অসভ্যরকমের মাথা ধরেছে।' মাথা-ধরার একটা ভাব ফুটিয়ে বললে জয়শীলা।

'বুঝেছি। আর একটু বোসো তাহলে। কিছু খাবে ? কোল্ড ড্রিঙ্ক জাতীয় ?'

'না।'

দরকারি কাজগুলি সেরে নিল নির্বানীতোষ। কয়েকটা প্রেসক্রিপশনের কিছু ওষুধ বদলে দিল, আগামী দিনে যে ওষুধগুলো আনা দরকার তারও একটা ফিরিস্তি করল। তারপর কম্পাউণ্ডারকে বুঝিয়ে দিয়ে আর-একটা সিগারেট ধরিয়ে জয়শীলার সঙ্গে পথে নামল নির্বানীতোষ।

'এই ট্যাক্সি—' ছুটন্ত গাড়িটাকে থামিয়ে উঠে পড়ল দুজন। 'এস্প্লানেড—'

নির্বানীতোষের সঙ্গে দেখা হবার আগে মুহূর্তেও ঠিক যে এরকম হাওয়া-খাবার ইচ্ছা ছিল জয়শীলার, তা নয়। মাথা-ধরাটাও তার দুষ্টুমি, কেবল ডাক্তারের মুখোশ-পরা গাম্ভীর্যের আবরণকে নিজের খেয়ালে ভেঙে দেখবার একটু লোভ। আর কিছুটা হয়তো নিজের ক্ষমতার সীমাকে পরখ করে নেবার হিসেবীপনা। চেম্বার ছেড়ে উঠে আসতে কাজের দোহাই পেড়ে যদি আপত্তিও করত নির্বানীতোষ, তাঁহলে হয়তো রাগ হত তার, কিন্তু অখুশি হত না।

কিন্তু এই মুহূর্তে যখন রাত্রির কলকাতাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গাড়ি ছুটছে, চকিতে আলোর উদ্ভাস স্খলিতনক্ষত্রের মতো ছিটকে-ছিটকে পড়ছে, রাজপথের দুধারে বাড়িগুলি যখন রাজানুগৃহীত বিনীত প্রজাকুলের মতো সেলাম করে-করে সরে যাচ্ছে, আর দিগ্‌বধূরা মুঠোমুঠো হাওয়ার ফাগ ছুঁড়ে মারছে তখন অদ্ভুত এক রোমাঞ্চে দুলে দুলে উঠছে সর্বশরীর। মনে হচ্ছে যেন এ-অনন্ত পথ-চলা, প্রতি চরণে অভিসার রঙ্গনটীর নূপুর বেজে উঠছে।

নির্বানীতোষের শরীরে শ্লথ অবিন্যস্ত করে দিল তার দেহভার। চোখ বন্ধ হয়ে আসছে আবেশে, আধো ঘুমের মতো একটা ভাবে অদ্ভুত হাল্‌কা লাগছে নিজেকে।

নির্বানীতোষ একবার জিগ্যেস করল : 'কি হয়েছে তোমার ?'

তর্জনী তুলে ওকে কথা বলতে নিষেধ করল জয়শীলা। কথা নয়। হৃদয় যখন প্রশান্ত গভীর তখন কথার কোলাহল তুলো না। গতিকে অনুভব করো, হৃদয়ের স্পন্দনকে অনুভব করো। চেনো রাত্রিকে, নক্ষত্র-জ্বলা আকাশকে, আর হাওয়ার দুরন্ত প্রলাপকে।

আরো জোরে গাড়ি ছুটল। কাচমসৃণ রাজপথ, আলো, আলোর মিছিল। রেড রোড ধরে অনেকবার ঘুরল গাড়িটা। নির্বানীতোষের কাঁধে জয়শীলার শরীরের ভার, তেমনি আধ-বোজা চোখ আর গভীর মৌন।

রাত্রি এগারোটায় যখন বাড়ির দরজায় গাড়ি থামল, নির্বানীতোষের কাঁধে ভর দিয়ে নামতে-নামতে ফিশফিশ করে জয়শীলা শুধু একবার কোনো রকমে বলতে পারল : 'জানো না আজ আমাদের বিয়ের তারিখ।'

কাপড় ছাড়তে-ছাড়তে কথাটা মনে পড়তে নিঃশব্দে হাসল জয়শীলা। নির্বানীতোষকে বিয়ের তারিখের মতো স্থূল ব্যাপারটা না-বললেও চলত। সত্যি বলতে কি, তারও তো মনে ছিলনা বিয়ের তারিখটা। তবু আজকের নৈশ অভিযানের একটা প্রত্যক্ষ অর্থ তুলে ধরবার জন্যে এবং নিজের আচরণেরও একটা যুক্তি খাড়া করবার জন্যেই কথাটা বলা। জয়শীলার এটা স্বীকার করতে এই মুহূর্তে লজ্জা নেই আজকের রাত্রে যদি তার পাশে নির্বানীতোষ নাও থাকত (সত্যি-সত্যি পাশে মানুষটা ছিল কিনা সেই চেতনাই ছিল না ওর!) তাহলেও কোনো অভাববোধ তাকে পীড়িত করত না। মাসিমার ওখানে ঘরে শুয়ে থেকে অবধি যে আবিষ্টতা হাল্‌কা আমেজের মতো ছড়িয়ে ছিল কোষে-কোষে তারই রেশ টেনে আজ সারারাতই কাটিয়ে দেবে সে।

চৈত্রের শেষাশেষি থেকেই আপিসে তোলপাড় পড়ে গেল। রিক্রিয়েশন ক্লাবের মিটিঙে ঠিক করা হল এবারকার পঁচিশে বৈশাখকে কি করে স্মরণ করা যায়। বাইরের আর্টিস্ট তো আসবেই, গানের, আবৃত্তির। কিন্তু তাদেরই সেকশনের অফিসার সেনসাহেবের প্রস্তাব : আরও নতুন আইটেম চাই। রবীন্দ্রনাথের কোনো বই অভিনয় করুক ছেলে-মেয়েরা। ছেলেমেয়ে কম্‌বাইণ্ড হবে? হ্যাঁ তাই। পরের দুদিন মিটিঙে বই সিলেকশনের ব্যাপার উঠল। অচলায়তন, শোধ-বোধ, না রক্তকরবী। হ্যাঁ রক্তকরবীই!

অভিনয়ের এমন নেশা যে ছেলেমেয়ের অভাব হল না। অভাব হল সত্যিকারের অভিনয় ক্ষমতার। অভিনয় পরিচালনার ব্যাপারে জয়শীলাদের সেকশনের বিকাশের প্রতিভা সর্বজন-স্বীকৃত। কিন্তু, সেও হাল ছেড়ে বসল। ছেলেদের অভিনয় যদিও মোটামুটি চালিয়ে নেবার সম্ভাবনা আছে, স্ত্রী-চরিত্র, বিশেষ করে নন্দিনীর ভূমিকা নিয়েই সমস্যা দেখা গেল।

সেনসাহেব ডেকে পাঠালেন বিকাশকে। 'কি হে নন্দিনী পেলে?'

'না স্যার—'

সেনসাহেব পাইপটা ঠোঁট থেকে নামিয়ে বললেন, 'আমি আগেই বুঝেছিলাম: আবিষ্কারের চোখ তোমার নেই।'

বিকাশ অপ্রস্তুতের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

সেনসাহেব চেয়ারে কাত হয়ে বললেন, 'সেই নতুন মেয়েটিকে অ্যাপ্রোচ করেছ? কী নাম যেন—'

'মিসেস চ্যাটার্জির কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। ওঁকেই ধরো।' হাসলেন সেনসাহেব।

'উনি রাজি হবেন না। কথা হয়েছিল আমার সঙ্গে। কলেজে অবশ্যি তিনি অনেক অভিনয় করেছেন শুনেছি মিস দত্ত বলছিলেন…'

সেনসাহেব বললেন, 'এমন একটা অকেশন। উনি রাজি হবেন না কেন। এতো একেবারে ঘরোয়া ব্যাপার।'

'আপনি একবার বলে দেখুন না স্যার—'

'আমি!' একটু বিস্মিত হলেন সেনসাহেব। 'আচ্ছা দেখি।'

বিকাশ বেরিয়ে যেতেই টিফিনের আগে-আগে জয়শীলার ডাক পড়ল অফিসারের ঘরে।

'এই যে আসুন। আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।' সেনসাহেব স্মিতহাস্য: 'বসুন না।'

জয়শীলা বসল।

'তারপর কী রকম লাগছে কাজকর্ম; বিশেষ অসুবিধে হচ্ছে না তো?' সেনসাহেব সহজ হবার চেষ্টা করছেন। 'অবশ্য কাজ মাত্রই বোরিঙ যদি-না কিছু কিছু আনন্দের মুহূর্ত ছড়িয়ে থাকে তার মধ্যে। আমি যখন শান্তি-নিকেতনে ছিলাম গুরুদেবের চরণের ছায়ায় বসবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তিনি বলতেন: ছাখো গিরিশ, এমনিতেই পৃথিবীটা একটা কারাগার। এই কারাগার সৃষ্টি করেছে মানুষ। তার কারণ কি জানো:

মানুষ কাজের মোটা রশির সঙ্গে বাঁধা। কাজকে পরিশুদ্ধ করতে হবে অনুরাগের উত্তাপ দিয়ে। আমার আশ্রমের সামনে যখন দেখি ক্ষেতের কাজে ব্যস্ত সাঁওতালদের, ওরা ধান বোনে আর গান করে। যেন কাজের মৌমাছির গুনগুনানি। তখন কাজের একটা অর্থ বুঝি। বুঝি আনন্দ ছাড়া কাজ নেই, কাজ ছাড়া আনন্দ নেই। এই দুইয়ের ছাড়াছাড়িতেই সংসারে কারাগার গড়ে উঠছে।'

সেনসাহেবের মুখোমুখি বসে এত কথা শোনবার সৌভাগ্য জয়শীলার আগে হয়নি। সে একটু নড়ে বসল।

সেনসাহেব আবার শুরু করলেন: 'গুরুদেবের সেই বাণী আমি ভুলতে পারিনে। আজকের এডমিনিস্ট্রেটারদের সঙ্গে তাই আমার মতবিরোধ। ওরা আপিসটাকে ভাবে নাৎসি কনসেনট্রেসন ক্যাম্প। আমি একথা কিছুতেই বুঝতে পারিনে যেখানে একটা মানুষকে ঠায় আটঘণ্টা কাটাতে হয় সেখানে যদি মনের খাদ্য না মেলে তাহলে সেকাজের অভিশাপ মানুষকে অন্ধকারে টেনে আনবে। আর হচ্ছেও তাই।' সেনসাহেব পাইপে অগ্নি-সংযোগ করলেন।

জয়শীলাকে নীরব দেখে সেনসাহেব আবার আরম্ভ করলেন: 'গুরুদেব আজ আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু তাঁর বাণী আছে। আমাদের, শুধু আমাদের কেন গোটা ভারতবর্ষেরই পঁচিশে বৈশাখ একটা মহৎ জাতীয় উৎসব। আর রক্তকরবীকে বেছে নেবার উদ্দেশ্যও তাই। কাজের নির্মম পাষাণ থেকে আনন্দের রাজাকে মুক্তি দেওয়া। কিন্তু...' এবার গভীরতর চিন্তিত দেখল তাঁকে।

জয়শীলা বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল অফিসারের দিকে।

'কিন্তু...' পাইপের পোড়া তামাকটা ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন সেনসাহেব: 'যা দেখছি রক্তকরবী হয়তো আমাদের করা হবে না।'

'কেন মিঃ সেন?' এবার কথা না বললে ভালো দেখায় না জয়শীলার।

'কেন আবার! নন্দিনী! নন্দিনীর পার্টে মেয়ে পাওয়া যাচ্ছে না... আপনার তো শুনেছি অভিনয় করবার ন্যাক আছে—'

'আমি! না না—কি যে বলেন। আমার ওসব আসে না।'

সেনসাহেব হাসলেন। 'কলেজে আপনি অভিনয় করেছেন আমি জানি।'

জয়শীলা উত্তরের অভাবে অস্বস্তিবোধ করতে লাগল। কলেজে কতবার কত ফাংশনে অভিনয় করেছে, মেডেল পেয়েছে, পেয়েছে প্রশংসা। কিন্তু

সেসব আজ অবান্তর। সেদিনের মন নেই, উৎসাহ নেই, নেই স্বাধীনতা। আগেকার দিনে ছিল মামাবাবুর সস্নেহ সমর্থন। কতদিন কত অন্যায়, কত দেরিতে ফেরা সব কিছুই স্নেহসুন্দর চক্ষে মামাবাবু মেনে নিয়েছেন। আর তার মনের পেছনে এই বাধাবন্ধহীন স্বাধীনতাবোধ ছিল বলেই বোধকরি তার অপব্যবহার করেনি জয়শীলা। কিন্তু···আজ, স্বপ্নের মতো, মিষ্টি দুঃখের মতো সেসব স্মৃতি মনকে মথিত করে তোলে মাত্র। নির্বানীতোষকে কিছুতেই বলতে পারবে না সে। ওর অনুমতিলব্ধ স্বাধীনতায় স্বাচ্ছন্দ্য আছে, স্বস্তি নেই।

'আমাকে ক্ষমা করুন। আমার পক্ষে অভিনয় করা সম্ভব নয়।' জয়শীলা মুখ নিচু করে বললে।

'সম্ভব নয়! তাহলে···আমার আর বলবার কিছু নেই।' সেনসাহেবের গলায় বেদনা : 'আচ্ছা। আপনি আসতে পারেন।'

নমস্কার করে সুইংডোর ঠেলে ক্লান্ত পায়ে বেরিয়ে এল জয়শীলা।

এত ক্লান্ত লাগছে কেন! ঘন আঠার মতো ক্লান্তি যেন জড়িয়ে ধরছে তাকে। আত্মরক্ষা করতে গিয়ে বড় বেশি আত্মবিসর্জন করতে হচ্ছে নাকি তাকে। নির্বানীতোষ ঘরে-বাইরে এমন করে তাকে আগলে রাখতে চায় কেন। ওর অধিকার আছে বলেই কি সব সময় তাকে বিজ্ঞাপন দিয়ে তার চৌহদ্দি সজাগ রাখতে হবে। জয়শীলা তার স্ত্রী, তার সংসারের একটি ইউনিট। কিন্তু, জয়শীলার জীবনে অন্য কারোরও দাবি না থাকুক, প্রয়োজন থাকতে পারে। আপিসে দশজন নিয়ে যে সমাজ তারও সামাজিকতা আছে। একজনকে সুখী করতে গিয়ে দশজনকে আঘাত দেওয়া কি সত্যিই প্রগতিশীল চিন্তা। কিন্তু এভাবে জোড়াতালি দিয়ে আর কতদিন চলবে। এর চেয়ে চাকরি ছেড়ে দেওয়া ভালো।

রাত্রির গভীর নির্জনতায় স্বামীর বাহুর চাপে অবরুদ্ধ ইচ্ছাটা যেন ছটফট করছিল জয়শীলার। রক্তে দুরন্ত পাখিটা ডানার পাখসাটে যেন মুক্তির দরজায় মাথা খুঁড়ে মরছিল। নির্বানীতোষ, দেহকে নিষ্পেষ্ট করলে দেহ অবশ্যই সাড়া দেবে। কিন্তু এতেই কি তুমি সুখী। তুমি জানো না আমি আরো কত দিতে পারি, আরো কত দিতে চাই। দেবো বলেই তো তোমার কাছে এসেছি। কিন্তু তুমি কেন চাওনা, কেন চাওয়াকে সার্থক করতে পারো না! অনেক পেতে হলে যে অনেক দিতে হবে।

আমার মনের অজস্র ঐশ্বর্য উজাড় করে শুধু তোমাকেই দিতে চাই। কিন্তু তুমি ঐশ্বর্যবান হও, আমার দানকে গ্রহণ করবার যোগ্য হও। আমার মনের দরজায় যে ডবল তালা পড়ল, তোমার উপযুক্ত মনের চাবি দিয়ে তালা খোলো। আমার সুখকে, আমার সর্বস্বকে ডাকাতি করে নাও, তুমি হবে আমার পরমপ্রিয় দস্যু। যা আমার বাইরের, যা আমার একান্ত নয়, সেই স্থূল মিথ্যাকে জড়িয়ে আমার জীবনটাকে মিথ্যা করে দিও না।

নির্বানীতোষ জিগ্যেস করল ঃ 'ঘুমোবে না?'

জয়শীলা বললে, 'ঘুমিয়েই তো ছিলাম। এবার একটু জেগে থাকি।'

'হঠাৎ রাতদুপুরে এমন খেয়াল কেন?' হাসল নির্বানীতোষ।

'খেয়াল বলেই তো তার সময়-অসময় নেই।' জয়শীলাও হাসল।

'তোমার শরীর কিন্তু বেশ খারাপ হচ্ছে।'

'তুমি ডাক্তার সারিয়ে তুলতে পারো না?'

'পারি। কিন্তু ডাক্তারের ওপর বিশ্বাস থাকা দরকার।'

জয়শীলা হাসল। 'ডাক্তারি শাস্ত্রটাও কি বিশ্বাসের ওপর চলছে।'

'চলছে বৈকি। সব শাস্ত্রেরই গোড়ার কথা বিশ্বাস। গোড়াকে বাদ দিলে আর ডালপালা কিছু থাকে না।'

'জানতাম না। জ্ঞান হল। আমি যদি বলি ঃ বিশ্বাসটা সব কিছুরই গোড়ার কথা, তাহলে হাসবে তো?'

'না। হাসব কেন?'

'যদি বলি তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না।'

'এটা রাগের কথা।'

'যদি বলি ঃ কাল আমাদের সেকশনের লোকেরা পিকনিক করছে বোটানিকস্‌-এ। আমাকে যেতে দেবে?'

'সেখানে যদি আমার নিমন্ত্রণ থাকে, দেবো না কেন?'

'সত্যি বলছ?'

'সত্যি।'

'বেশ। যদি বলি পঁচিশে বৈশাখে আমাদের আপিসে রবীন্দ্রনাথের নাটক করার আয়োজন হয়েছে। আর সেই নাটকে আমার অভিনয় করবার কথা। তাহলে নিশ্চয় রাগ করো।'

নির্বানীতোষ একটু চুপ করে রইল। তারপর হেসে বললে, 'তুমি কি আমার অনুমতি চাচ্ছ?'

জয়শীলা বললে, 'যদি বলি তাই।'

নির্বানীতোষ বললে, 'তাহলে জেনো অনুমতি দেবো।'

জয়শীলা অবিশ্বাসীর চোখে তাকিয়ে রইল ওর দিকে।

নির্বানীতোষ হাসল। বললে, 'দেবো নিজেকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে। সেবারে পিকনিকে শুধু আমারই মুখ চেয়ে তুমি যাওনি।'

'কে বললে তোমাকে?'

'তোমার আপিসের রামভদ্রবাবু বিকাশবাবু এসেছিলেন আমার চেম্বারে।'

'কই, সে কথা তো আমাকে বলো নি?'

'না। এতদিন বলিনি বলেই তো সংকোচ ছিল আমার মনে। কিন্তু এবার তুমি আমাকে হারিয়ে দিয়েছ। আর হারতেও আমি চাই।'

'সত্যি বলছ তুমি?'

'হ্যাঁ গো। অভিনয় যদি সুন্দর করতে পারো তাহলে তোমার চেয়ে বেশি আনন্দ আমারই। কী বই করছ তোমরা?'

'রক্তকরবী। পড়েছ?'

'না। আমার সময় কোথায়?'

'কাল তোমাকে পড়ে শোনাবো।'

'শুনিয়ো। একটা সিগারেট দাও তো।'

জয়শীলা ঘুমিয়ে পড়তেই হঠাৎ নির্বানীতোষের মনে হল: সত্যিই কি বড় বেশি উদারতা দেখিয়ে ফেলল নাকি সে। অতোখানি উদারতা দেখানোর মতো পুঁজি সত্যিই কি তার ভাণ্ডারে আছে! নাকি সস্তা মহৎ হবার লোভ সামলাতে না পেরে সাধ্যাতীত একটি কীর্তি করে বসল সে! জয়শীলা ঘুমিয়ে পড়েছে। কী গভীর আরাম আর নির্ভরতায় ওর চোখ দুটো বোজা। ডান বাহুটি এখনো নির্বানীতোষের কোমরে আদরের মতো লেগে রয়েছে। কিন্তু কপালের শিরাদুটো বিনা নোটিশেই আবার হঠাৎ দাপাদাপি শুরু করল কেন! মাথা ধরেছে নির্বানীতোষের। একটা অন্ধ সাপ যেন নির্বিচারে নীল বিষ ঢেলে দিচ্ছে মস্তিষ্কে। হাতের মুঠো শক্ত হয়ে এল, চোখ দুটো ঝাপসা-ঝাপসা। রক্তে অসুস্থ অস্থিরতা। বিড় বিড় করে কি বলল নির্বানীতোষ। উঠে কুঁজো গড়িয়ে ঢকঢক করে জল খেল। কপালে ঘাড়ে জল ছিটল। আবার একটা সিগারেট ধরিয়ে বন্ধ্যা আক্রোশে ঘরময় পায়চারী করতে লাগল সে।

আপিসের দিনগুলিতে যেন উৎসাহের পূর্ণ জোয়ার এল। নিজের মনের মধ্যে দামাল এঞ্জিনের মতো যে এমন উৎফুল্ল-উদ্দীপনা লুকিয়েছিল, ভাবতে পারেনি জয়শীলা। নিজের এই পরিবর্তনে নিজেই অবাক হয়ে যায়। ছুটির পর রিহার্শাল। নন্দিনীর ভূমিকায় তার বাচনভঙ্গী আর চলাফেরা এমন আশ্চর্যভাবে মানিয়ে গেছে যে স্বয়ং সেনসাহেব পর্যন্ত অবাক হয়ে গেছেন। কিশোরের ভূমিকায় নেমেছে এ্যাকাউণ্টসের রজত মুখার্জি। আর রাজার ভূমিকায় বিকাশ।

নাটকের শেষের দিকে রিহার্শালের সময় পার্ট বলতে-বলতে হঠাৎ যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলে জয়শীলা। শ্রোতারা পর্যন্ত অবাক বিস্ময়ে ওর অভি-ব্যক্তির দিকে চেয়ে থাকে। জয়শীলা যখন গলাকে খাদে নামিয়ে রঞ্জনের উদ্দেশ করে বলছেঃ "বীর আমার, নীলকণ্ঠপাখির পালক এই পরিয়ে দিলুম তোমার চূড়ায়। তোমার জয়যাত্রা আজ হতে শুরু হয়েছে। সেই যাত্রার বাহন আমি।—আহা, এই-যে ওর হাতে সেই আমার রক্তকরবীর মঞ্জরি।..." তার কণ্ঠের আর্তিতে হল্‌ঘরটা গমগম করে উঠেছে। তারপর কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করে যখন জয়শীলা আরম্ভ করলঃ "রাজা, এইবার সময় হল।...আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার লড়াই।" তখন তার বাচনভঙ্গির স্পষ্ট ঋজুতায় শ্রোতারা যেন আগামী লড়াইয়ের শিরশিরানি বোধ করল তাদের রক্তে।

অভিনয় প্রতিভার গুণে রাতারাতি জয়শীলা আপিসের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়ল। করিডোরে হাঁটা যায়না, আশেপাশে সামনে প্রশংসা-ভরা দৃষ্টি তাকে বিদ্ধ করে। যাদের সঙ্গে আলাপের কোনো সুযোগ ঘটেনি এমন অনেকে এসে গায়ে পড়ে অভিনন্দন জানিয়ে যায়। কিছু কিছু নবীন উৎসাহী ছেলেরা তার যাওয়ার পথে তারই গলার অনুকরণে শুনিয়ে-শুনিয়ে বলেঃ 'বীর আমার, নীলকণ্ঠপাখির পালক...'

প্রশংসা অভিনন্দন ঠাট্টা—সব মিলিয়ে যেন ভালোই লাগে জয়শীলার। যেখানে সে কেরানি সেখানে সে আরো দশজনের মতোই সাধারণ, কিন্তু অভিনয় ক্ষমতা যেন তাকে দশজনের থেকে আলাদা অনন্য করে তুলেছে।

রিহার্শালে প্রায় দিন বাড়ি ফিরতে দেরি হচ্ছে। এ্যাকাউণ্টসের রজত শ্যামবাজারের দিকে থাকে। ওর সঙ্গেই কোনোদিন ট্র্যামে-বাসে ফেরে। কোনোদিন একলা। কলকাতার পথে তখন রাত্রির ভিন্নরূপ। আলো, অজস্র আলোর ভিড়। পথিক, আর ফেরিঅলার ব্যস্ত হাঁকাহাঁকি। ডবল ডেকারের

জয়শীলা বললে, 'যদি বলি তাই।'

নির্বানীতোষ বললে, 'তাহলে জেনো অনুমতি দেবো।'

জয়শীলা অবিশ্বাসীর চোখে তাকিয়ে রইল ওর দিকে।

নির্বানীতোষ হাসল। বললে, 'দেবো নিজেকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে। সেবারে পিকনিকে শুধু আমারই মুখ চেয়ে তুমি যাওনি।'

'কে বললে তোমাকে?'

'তোমার আপিসের রামভদ্রবাবু বিকাশবাবু এসেছিলেন আমার চেম্বারে।'

'কই, সে কথা তো আমাকে বলো নি?'

'না। এতদিন বলিনি বলেই তো সংকোচ ছিল আমার মনে। কিন্তু এবার তুমি আমাকে হারিয়ে দিয়েছ। আর হারতেও আমি চাই।'

'সত্যি বলছ তুমি?'

'হ্যাঁ গো। অভিনয় যদি সুন্দর করতে পারো তাহলে তোমার চেয়ে বেশি আনন্দ আমারই। কী বই করছ তোমরা?'

'রক্তকরবী। পড়েছ?'

'না। আমার সময় কোথায়?'

'কাল তোমাকে পড়ে শোনাবো।'

'শুনিয়ো। একটা সিগারেট দাও তো।'

জয়শীলা ঘুমিয়ে পড়তেই হঠাৎ নির্বানীতোষের মনে হলঃ সত্যিই কি বড় বেশি উদারতা দেখিয়ে ফেলল নাকি সে। অতোখানি উদারতা দেখানোর মতো পুঁজি সত্যিই কি তার ভাণ্ডারে আছে! নাকি সস্তা মহৎ হবার লোভ সামলাতে না পেরে সাধ্যাতীত একটি কীর্তি করে বসল সে! জয়শীলা ঘুমিয়ে পড়েছে। কী গভীর আরাম আর নির্ভরতায় ওর চোখ দুটো বোজা। ডান বাহুটি এখনো নির্বানীতোষের কোমরে আদরের মতো লেগে রয়েছে। কিন্তু কপালের শিরাদুটো বিনা নোটিশেই আবার হঠাৎ দাপাদাপি শুরু করল কেন! মাথা ধরেছে নির্বানীতোষের। একটা অন্ধ সাপ যেন নির্বিচারে নীল বিষ ঢেলে দিচ্ছে মস্তিষ্কে। হাতের মুঠো শক্ত হয়ে এল, চোখ দুটো ঝাপসা-ঝাপসা। রক্তে অসুস্থ অস্থিরতা। বিড় বিড় করে কি বলল নির্বানীতোষ। উঠে কুঁজো গড়িয়ে ঢকঢক করে জল খেল। কপালে ঘাড়ে জল ছিটল। আবার একটা সিগারেট ধরিয়ে বন্ধ্যা আক্রোশে ঘরময় পায়চারী করতে লাগল সে।

আপিসের দিনগুলিতে যেন উৎসাহের পূর্ণ জোয়ার এল। নিজের মনের মধ্যে দামাল এঞ্জিনের মতো যে এমন উৎফুল্ল-উদ্দীপনা লুকিয়েছিল, ভাবতে পারেনি জয়শীলা। নিজের এই পরিবর্তনে নিজেই অবাক হয়ে যায়। ছুটির পর রিহার্শাল। নন্দিনীর ভূমিকায় তার বাচনভঙ্গী আর চলাফেরা এমন আশ্চর্যভাবে মানিয়ে গেছে যে স্বয়ং সেনসাহেব পর্যন্ত অবাক হয়ে গেছেন। কিশোরের ভূমিকায় নেমেছে এ্যাকাউণ্টসের রজত মুখার্জি। আর রাজার ভূমিকায় বিকাশ।

নাটকের শেষের দিকে রিহার্শালের সময় পার্ট বলতে-বলতে হঠাৎ যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলে জয়শীলা। শ্রোতারা পর্যন্ত অবাক বিস্ময়ে ওর অভি-ব্যক্তির দিকে চেয়ে থাকে। জয়শীলা যখন গলাকে খাদে নামিয়ে রঞ্জনের উদ্দেশ করে বলছেঃ "বীর আমার, নীলকণ্ঠপাখির পালক এই পরিয়ে দিলুম তোমার চূড়ায়। তোমার জয়যাত্রা আজ হতে শুরু হয়েছে। সেই যাত্রার বাহন আমি।—আহা, এই-যে ওর হাতে সেই আমার রক্তকরবীর মঞ্জরি।…" তার কণ্ঠের আর্তিতে হল্‌ঘরটা গমগম করে উঠেছে। তারপর কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করে যখন জয়শীলা আরম্ভ করলঃ "রাজা, এইবার সময় হল।…আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার লড়াই।" তখন তার বাচনভঙ্গির স্পষ্ট ঋজুতায় শ্রোতারা যেন আগামী লড়াইয়ের শিরশিরানি বোধ করল তাদের রক্তে।

অভিনয় প্রতিভার গুণে রাতারাতি জয়শীলা আপিসের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়ল। করিডোরে হাঁটা যায়না, আশেপাশে সামনে প্রশংসা-ভরা দৃষ্টি তাকে বিদ্ধ করে। যাদের সঙ্গে আলাপের কোনো সুযোগ ঘটেনি এমন অনেকে এসে গায়ে পড়ে অভিনন্দন জানিয়ে যায়। কিছু কিছু নবীন উৎসাহী ছেলেরা তার যাওয়ার পথে তারই গলার অনুকরণে শুনিয়ে-শুনিয়ে বলেঃ 'বীর আমার, নীলকণ্ঠপাখির পালক…'

প্রশংসা অভিনন্দন ঠাট্টা—সব মিলিয়ে যেন ভালোই লাগে জয়শীলার। যেখানে সে কেরানি সেখানে সে আরো দশজনের মতোই সাধারণ, কিন্তু অভিনয় ক্ষমতা যেন তাকে দশজনের থেকে আলাদা অনন্য করে তুলেছে।

রিহার্শালে প্রায় দিন বাড়ি ফিরতে দেরি হচ্ছে। এ্যাকাউণ্টসের রজত শ্যামবাজারের দিকে থাকে। ওর সঙ্গেই কোনোদিন ট্র্যামে-বাসে ফেরে। কোনোদিন একলা। কলকাতার পথে তখন রাত্রির ভিন্নরূপ। আলো, অজস্র আলোর ভিড়। পথিক, আর ফেরিঅলার ব্যস্ত হাঁকাহাঁকি। ডবল ডেকারের

বীভৎস গর্জন আর পুরানো ট্র্যামের ঘড়ঘড়ানি। মুঠো মুঠো হাওয়া এসে লাগে কানের পাশে, গালে, চোখের পাতায়। অভিনয়ের পরেও একটা মিষ্টি রেশ লেগে থাকে চেতনায়। 'বীর আমার, নীলকণ্ঠপাখির পালক…' মনে মনে উচ্চারণ করে আর হাসে জয়শীলা। আর ওর হাসিতে রূপ-রস-গন্ধ-ভরা রাত্রি উচ্চকিত হয়ে ওঠে। ওয়াই. এম. সি-এ পার হয়, বিবেকানন্দ রোড, হেদো ছুটে বেরিয়ে যায় ট্র্যাম—খেয়াল থাকে না জয়শীলার। যন্ত্রের মতো কেবল গন্তব্যস্থানে ট্র্যাম থেকে নেমে পড়া। বাড়িতে তখন রাত্রি নেমেছে, সুহাসিনী খাবার ঘরে রাঁধুনিকে উপদেশ দিতে দিতে একবার বলে উঠলেন, 'কে বউমা', শিবতোষ ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখে ছুটে আসবে—'রোজ রোজ এত দেরি করো কেন বৌদি? আমার ঘুম পায়না?' শিবতোষের হাত ধরে ঘরে উঠে আসা—লজেন্স কি টফি। তারপর বাথরুম। চায়ের কাপ, শিবতোষকে পড়া বলে-দেওয়া। আর একটু পরে শিবতোষকে জড়িয়ে ধরে ঘুমে পাগল! নির্বানীতোষ ফেরে আরো পরে তখনো হয়তো ঘুমিয়ে জয়শীলা, কোনোদিন নির্বানীতোষ নিজে থেকে ডাকে, কোনোদিন ডাকে না। খাবার সময় মা-ই ডেকে তোলেন জয়শীলাকে। রাত্রি আসে, ক্লান্তিতে অবসাদে, আর ওর ওই ঘুমে-গলা শরীরের দিকে তাকিয়ে দয়া হয় নির্বানীতোষের।

রিহার্শালে সেদিন অতিরিক্ত দেরি হয়ে গেল। আপিস থেকে বেরুল পৌনে দশটায়। সঙ্গী ছিল রজত। গবর্ণরের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে না-এল ট্র্যাম, না বাস। রজতই বললে, 'চলুন। এস্‌প্লানেডে এগিয়ে যাই।' অগত্যা। দেরির পর আরো দেরি। এসপ্লানেডে এসে শুনল স্ট্র্যাণ্ডরোডে কোথায় এ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে, ট্র্যাম আসতে দেরি হবে।

রজত প্রস্তাব করলে: 'চলুন। ট্যাক্সিতে যাই।'

'ট্যাক্সি!' ক্লান্ত চোখ তুলে জয়শীলা তাকাল রজতের মুখের দিকে।

'এত ভাববার কি আছে। আসুন।'

'একটু দাঁড়ান বাস পাওয়া যাবে।'

'ধ্যাৎ। আপনি বড্ড হিসেবী। আসুন।'

চিত্তরঞ্জন এভিন্যু দিয়ে ট্যাক্সি ছুটে চলল।

গাড়িতে আসতে-আসতে রজত কি বললে না-বললে কিছুই কানে গেল না জয়শীলার। মনের মধ্যে উদ্বেগ আর অস্থিরতা। আর থেকে-থেকে

ভেসে উঠছে নির্বানীতোষের মুখ। এ কদিন রোজই দেরি হয়েছে, কিন্তু আজকের দেরি যেন মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে! অন্য লোক হলে ভাবনা ছিল না, কিন্তু নির্বানীতোষ—ওর মেজাজের স্থিরতা নেই। হয়তো রাগ নাও করতে পারে, আবার রাগ করলেও অবাক হবার কিছু নেই। তার চলা বলা গতিবিধির পথে একটি লোকের যেন কড়া পাহারা, সাধ্য কি সেই রক্তচক্ষুর তাড়নাকে অস্বীকার করবে। এক-এক সময় এই বন্ধনের মধ্যে তার ইচ্ছাগুলো ছটফট করতে থাকে। তখনই আত্ম-বিশ্লেষণ করবার তাগিদ জাগে। বন্ধনকে মেনে নিতে গিয়ে তার পরিনামে লাভ হল কতটুকু। মন নারাজ হয়ে ওঠে। একদিকে স্বামীর উগ্র আত্মাধিকার অন্যদিকে দশজনের প্রশংসায় বন্দনায় যে ব্যক্তিত্বের প্রসারণ—তার বাধাবন্ধহীন আস্বাদ চেতনাকে দ্বিধা বিভক্ত করে ফেলে।

জয়শীলাকে বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে রজত ট্যাক্সি নিয়ে চলে গেল।

নির্বানীতোষের প্রথম সম্ভাষণঃ 'এত দেরি! লালবাজারে খবর দেবো ভাবছিলাম।'

ওর কথার ব্যংগার্থ বুঝতে পারল না জয়শীলা। হেসে বললে, 'এতক্ষণ দাও নি তাহলে?'

নির্বানীতোষ বললে, 'না। তারপর ভাবলামঃ ব্যাপারটা অভিনয়ের রিহার্শাল হলেও দেরি-করাটা তো আর তোমার অভিনয় নয়।'

'মানে?'

'মাতৃভাষাও বুঝতে পারছ না।' হাসল নিবানীতোষঃ 'অভিনয়ে ক্লান্তিও তো আছে, তারপর যদি চা কি কফি খেতে রেস্টুরেণ্টে বসতে একটু দেরিই হয়ে যায়...'

'কী বলতে চাও তুমি?' ঠোঁটে ঠোঁট ঘসে জিগ্যেস করল জয়শীলা।

নির্বানীতোষের মুখের ভাষা কঠোর। 'বলতে চাইঃ লিবার্টি ইজ নট লাইসেন্স। স্বাধীনতা আর স্বেচ্ছাচার এক জিনিস নয়।'

'থাক। আমি ইংরেজি বুঝি। তর্জমা না করলেও চলত। আর কিছু বলবে? বলবে না তো। তাহলে দয়া করে আমাকে একটু ঘুমোতে দাও। আমি ভীষণ ক্লান্ত।'

ওর নিস্পৃহ শীতলতায় আরো জ্বলে উঠবার কারণ খুজে পেল নির্বানীতোষ। 'কই, আমার কথার উত্তর।'

বিছানায় গা এলিয়ে দিল জয়শীলা, আলো এড়াবার জন্তে চোখের ওপর হাত চাপা দিল। আশ্চর্য শাস্ত গলায় বললে, 'তুমি তো কোনো প্রশ্ন করোনি। কী উত্তর দেবো বলো। এ তো তোমার সিদ্ধান্ত।'

'তাহলে আমার প্রশ্নের উত্তর দেবে না?'

'প্রশ্ন করলেই দেবো।' জয়শীলা বললে।

'এ সবের মানে কি···আমি এ সব পছন্দ করিনে···আই ওয়াণ্ট ফ্যামিলি হ্যাপিনেস—'তোতলাতে-তোতলাতে বললে নির্বানীতোষ।

'আমি তোমাকে হ্যাপি করতে পারিনি—এ আমার কপাল। সে-দুঃখ আমারই।' একটু চুপ থেকে আবার জয়শীলা বললেঃ 'কী করবে বলো? বিয়ে যখন হয়ে গেছে তখন একে মেনে না-নিয়ে তো কোনো উপায় দেখছি নে।'

'আই সী। তাহলে তুমি তোমার চাল বদলাচ্ছ না···'

'বদলাতে যদি হয় সেদিন নিজের যুক্তিতেই বদলাব, তোমার উপদেশের দরকার হবে না।'

'এই যদি তোমার উদ্দেশ্য ছিল তবে আমাকে তোমার সঙ্গে জড়াবার কি দরকার ছিল?'

'আমি ভুল করেছি। সেই ভুলের যে কোনো শাস্তি আমাকে দিতে পারো।'

'আমার চেয়ে বড় হল তোমার এ্যাসোসিয়েটস, তোমার স্তাবকেরা। আমি···আমি···' ক্রোধে ভাষা খুঁজে পেল না নির্বানীতোষ।

জয়শীলা বললে, 'ছোটো বড়র প্রশ্ন নয়। তোমার মতো ওঁদেরও তো দাবি আছে। সংসারটা তো শুধু তুমি আমি নিয়ে নয়। ওঁরা যদি স্নেহ করেন ভালোবাসেন তাহলে ওঁদের সেই দানকে কোন্ যুক্তি দিয়ে ফেরাব, বলতে পারো?'

নির্বানীতোষ তীব্র গলায় বললে, 'আই সী। প্রাইভেট লাইফ আর পাবলিক লাইফের মাঝখানে তুমি কোনো পাঁচিল রাখতে চাও না।'

জয়শীলা বললে, 'পাঁচিলটা তো তোমার কল্পনা। সত্যিকারের কোনো বিরোধ আমি খুঁজে পাই নে।'

'পাও না, না?' তিক্ততর গলা নির্বানীতোষের। 'আমি আগেই বুঝে-ছিলাম। পুরুষের গন্ধ না শুঁকলে তোমার ঘুম আসে না।'

'তোমার কালচারকে এমন করে উলংগ করো না। আমার লজ্জা করে। পুরুষের কথা কি বলছিলে? হ্যাঁঃ ঠিকই বলেছ। তোমার সঙ্গে আলাপটাও তো এই স্বভাবের ফলেই।'

'শুধু আমার সঙ্গে কেন। দেবপ্রিয়ের কথা মনে পড়ছে না?'

'পড়ছে। কিন্তু তাতে তো তোমার সমস্যা মিটবে না। এখন কি করবে বলো? বেটার লেট দ্যান নেভার! আমার মতো ফ্লার্ট মেয়ের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার কি-পথ বের করেছ?'

বাইরে থেকে সুহাসিনীর কণ্ঠস্বরঃ 'কই রে তোরা খাবিনে। রাত যে অনেক হল।'

'হ্যাঁ যাই।' নির্বানীতোষ সাড়া দিল।

জয়শীলার ঘুমে শরীর ভেঙে পড়ছিল। শুধু শরীরই নয়, মনও। মাগো, এত ক্লান্তি, এত ক্লান্তি কেন।

ভাতের থালার সঙ্গে তার মাথাটা যেন ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যাবে। সোজা হয়ে বসতে কষ্ট হচ্ছে, মেরুদণ্ডে যেন জোর নেই। নিঃশব্দে খেয়ে চলল জয়শীলা।

সুহাসিনী কখন একবার জিগ্যেস করেছিলেনঃ 'বউমা তোমার কি মাথা ধরেছে?'

জয়শীলা বললে, 'না মা। ভীষণ ঘুম পেয়েছে।'

'ঘুমের কি দোষ বাছা। বিশ্রাম কাকে বলে তাতো তোমার কপালে নেই।' সুহাসিনী সস্নেহে হাসলেন।

'কপালের লিখন। কি করে বদলাব মা!' জয়শীলাও হাসির ভান করল।

খাওয়া দাওয়ার পর বিছানার বুকে কি করে সে ঘুমে গলে' পড়ল, মনে নেই জয়শীলার।

নির্বানীতোষের চোখে ঘুম নেই। কী যেন করতে চায় অথচ পারছে না—নিষ্ফল রাগে গুমরাতে থাকে বুকের ভেতরটা।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই কি যেন হয়ে গেল জয়শীলার, কোনোরকমে শাড়িটা জড়িয়ে বাথরুমে ছুটে গেল সে। বুক থেকে, গলা থেকে কী ঠেলে উঠতে চাইল। বমিতে ভেসে গেল মেঝে।

বমির শব্দে ছুটে এলেন সুহাসিনী। 'কে বমি করছে? বউমা?' জয়শীলার মাথাটা চেপে ধরলেন। সারা শরীর আক্ষেপে ফেটে পড়তে চাইছে জয়শীলার, মাথা ঘুরছে, আর চোখের কোণে জল এসে পড়ছে তার।

মুখ ধুয়ে উঠে দাঁড়াল জয়শীলা। 'ও কিছু নয়। খাওয়ার গোলমাল হয়েছে বোধহয়।'

সুহাসিনী কিন্তু নিপুণ চোখে তাকিয়ে রইলেন জয়শীলার দিকে। কিছু বললেন না।

পরদিন ভাত খাওয়ার পরে আবার বমি।

স্থিরনিশ্চয় হলেন সুহাসিনী। হেসে বললেন শুধু: 'এখন একটু সাবধানে চলাফেরা কোরো বউমা।'

রাত্রে নির্বানীতোষ জিগ্যেস করল: 'মা যা বললেন তাকি সত্যি?'

জয়শীলা ঘুমচোখে বললে, 'সত্যি হলে খুশি হও তুমি?'

নির্বানীতোষ ছোট্ট করে বললে, 'হুই।'

'কেন? আমাকে বাঁধতে পারবে বলে?'

'হয়তো তাই।' নির্বানীতোষ সিগারেট ধরাল।

কিন্তু, হয়তো দিয়ে বোধ হয় সব সমস্যার ছেদ টানা যায় না।

জয়শীলার ছেলে-হবার খবরে প্রথমটায় আনন্দই হয়েছিল নির্বানীতোষের। কিন্তু, আনন্দের ফেনা সরিয়ে নিজের মনের রূপ দিয়ে যখন ব্যাপারটাকে বোঝবার চেষ্টা করল সে, দেখল অনেক ফাঁক, অনেক ফাঁকি। যে সন্দেহ-সংশয়টাকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করছিল, সেই কালো সংশয়টাই গুলিয়ে দিল তার সব চিন্তা। এমনও তো হতে পারে (যদিও স্থিরনিশ্চিত জানে: এমন হওয়া সম্ভব নয়!) জয়শীলার সন্তান-সম্ভাবনায় তার নিজস্ব কোনো দায়দায়িত্ব নেই! এই কথা ভেবে যেন আরাম পেল নির্বানীতোষ। জয়শীলার সঙ্গে যেখানে মূল বিরোধ, সেই বিরোধেরই পক্ষে যেন একটা শাণিত অস্ত্র পেয়ে গেছে সে। যেন জয়শীলাকে এইবার আপন মুঠোয় পেয়েছে। নিষ্কর্মা রাত্রে যতই এই ধরণের চিন্তা জট বাঁধতে চায়, মনের ভেতরটা কালো-কুটিল হয়ে পড়ে।

এর পর সময়ে অসময়ে খোঁচা দেবার সুযোগ হারায় না নির্বানীতোষ।

জয়শীলা আরো শান্ত হয়ে যায়। বলে, 'তোমার মতো আর কেউ তো আমার শরীরের নাড়ীনক্ষত্র চেনে না। আমাকে অপমান করে যদি শান্তি পেতে চাও, আমি বাধা দেবো না।'

নির্বানীতোষ কোনোদিন নরম হয়। সন্ধির প্রস্তাব আনে। কিন্তু, নিজের স্বার্থেই। কিন্তু, সে-সন্ধিও টেঁকে না। আবার সুযোগ বুঝে যুদ্ধ ঘোষণা করে সে।

আর সে-দ্বন্দ্বে জয়শীলার হৃদয়ে রক্ত ঝরে।

এক-একদিন বিদ্রোহ করবার ইচ্ছা যে জাগে না, তা নয়। কিন্তু

ইচ্ছাটাকে টেনে আনতেই না-আনতেই তেল ফুরোনো সলতেটা নিবে যায়। আরো ঠাণ্ডা, আরো শান্ত হয়ে পড়ে সে।

নির্বানীতোষের সেদিন ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল। চেম্বারে যায়নি। শুয়েছিল ঘরে।

আপিসে এসেও মনটাকে স্বাভাবিক রাখতে পারছিল না জয়শীলা। চিন্তা হচ্ছিল নির্বানীতোষের জন্যে। যত ঝগড়া করুক, অপমান করুক, ওর জন্যে আজকাল বড় বেশি চিন্তিত থাকে জয়শীলা।

টিফিনের পরে আর থাকতে পারল না আপিসে। সুপারিনটেনডেণ্টকে বলে ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। ট্র্যামে আসতে আসতে মনে হচ্ছিলঃ কেমন অবাক হবে নির্বান, খুশিতে ভরে উঠবে ওর রুগ্ন মন। হয়তো সে ভেবে বসে আছে আজো তেমনি রিহার্শাল শেষ করে বাড়ি ফিরবে জয়শীলা। মনে মনে খুশিয়াল হয়ে উঠল জয়শীলা। ভাবুক লোকটা, দেখুক একবার চেয়ে যত খারাপ মনে করে তত খারাপ নয় জয়শীলা। কেন মিছিমিছি সন্দেহ করে তাকে নির্বানীতোষ। মন খারাপ লাগে তার। কেন সুখকে সুখ বলে মেনে নিতে পারে না মানুষটা, বেনের মতো বাজিয়ে-বাজিয়ে নেবে সুখের পরিমাণ ওকে যে সব দেবার জন্যেই সে এসেছিল। দেবপ্রিয়কে শিক্ষা দেবার জন্যেও বটে! ছোটো সুখ, ছোটো আনন্দ দিয়ে সহজ একটা সংসারের মধুচক্র গড়ে তুলতে চেয়েছিল। স্বামী আর সন্তান। সবই যদি পেল সে তবে এত অশান্তি কেন! নির্বানীতোষ তাকে এত ভুল বোঝে কেন। ওকে কোনোদিন ঠকাবার কথা ভাবতেই পারে না। এ কথা কেন বুঝতে চায় না নির্বানীতোষ যা সত্য সহজ তাকে কোনোদিন ঠকায়না মেয়েরা। যেখানে আশ্রয় বাঁধে সে স্থানকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবার প্রতিভা মেয়েদের নিজস্ব। মেয়েরা কুয়াশা নিয়ে ঘর বাঁধে না, যা প্রত্যক্ষ নয়, দৃশ্যগোচর নয় তার প্রতি মেয়েদের অবিশ্বাস।

আসন্ন মাতৃত্বের ঐশ্বর্যে সমস্ত মন ভরে ওঠে জয়শীলার।

পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকে একেবারে নির্বানীতোষকে চমকে দেবে ভেবে চৌকাঠের দিকে এঁগিয়ে গেল সে।

কিন্তু ঘরে পা দিতেই পাশ থেকে অতর্কিতে কে যেন তার গালে এক চড় বসিয়ে দিল। বেদনায় পাংশু হয়ে উঠল জয়শীলার মুখের চেহারা। নিঃশব্দে দরজায় হেলান দিয়ে কাঠের মতো শক্ত কঠিন দাঁড়িয়ে রইল সে। তার চোখের সামনে যেন এক বীভৎস নাটকের এক অধ্যায় শুরু হয়েছে।

ভীত ত্রস্ত বর্ণহীন ফ্যাকাশে চোখে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রয়েছে সে। নির্বাক, নিস্পন্দ। তারপর মুখে রক্ত এল, কণ্ঠে জোর এল। তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার উঠল জয়শীলা : 'আমার বাক্সের তালা ভেঙে কি খুঁজছ?'

চমকে উঠল নির্বানীতোষ। অতর্কিতে ধরা পড়ে চোরের হীন লজ্জায় কে যেন কালি ঢেলে দিল তার সারা মুখে। কথা বলবার মতো ভাষাও খুঁজে পাচ্ছে না নির্বানীতোষ।

'তুমি···তুমি এত ছোটো, ছি-ছি-ছি···' ঘৃণায় লজ্জায় থরথর করে কেঁপে উঠল জয়শীলা। আর দাঁড়াল না সে, ধিক্কৃত অপমানিত মনের লজ্জা ঢাকতে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

রাস্তায় এসে সে হাঁপাতে লাগল। তার চোখের সামনে অন্ধকার—পুরু, ঘন, শক্ত। এই জমাট অন্ধকারের তলায় সমস্ত পৃথিবী যেন এক নিমিষে মুছে গেল। টলতে টলতে অন্ধকারে পথ হাতড়াতে হাতড়াতে সে এগিয়ে চলল।

অসময়ে জয়শীলাকে দেখে বিস্মিত হলেন স্নেহলতা : 'একি চেহারা হয়েছে তোর?'

'মাসিমা—মাসিমা গো—' স্নেহলতার কোলে আছড়ে পড়ল জয়শীলা, আর সারা পথে যা করতে পারেনি, অজস্র বেদনায় এবার আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ল সে।

সব শুনে স্নেহলতা স্তব্ধ স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। তার কোলে ক্রন্দনরতা আলুথালু জয়শীলাকে দেখে তাঁর অতীতের শোকাবহ জীবনের ছবি ভেসে উঠল চোখের পাতায়। যেদিন বীরেশ্বরের ওপর বিশ্বাসের শেকড় ছিঁড়ে ছিন্নমূল বিটপীর মতো ভেসে যেতে হয়েছিল অকূল কান্নার সমুদ্রে। সে কান্নাকে বুকের পাষাণে জমাট করে নিঃশব্দে বয়ে বেড়িয়েছেন এই দীর্ঘ জীবনে, আর প্রতি পলে বুঝেছেন তার দাম, দুঃসহ রিক্ততাকে ঢাকতে গিয়ে অনাবশ্যক পত্রপুষ্পে সাজিয়ে রাখতে হয়েছে বাইরের দিকটাকে। আজ জয়শীলার জীবনের এই অপ্রত্যাশিত ট্র্যাজিডিতে শঙ্কায় হিম হয়ে উঠলেন স্নেহলতা। কোনো সান্ত্বনার বাণী তাঁর ভাষায় জোগাল না। একজন অন্ধ আর-একজন অন্ধকে কি করে পথের হদিশ দেবে।

রাত গড়াল। অনেক—অনেক রাত।

শ্বশুরবাড়ি থেকে কেউ আসেনি তাকে ডাকতে। আপিস থেকে তার

নিঃশব্দে বাড়ি ফেরার সাক্ষী তো নির্বানীতোষ ছাড়া কেউ ছিল না। সুহাসিনী হয়তো নিশ্চিন্ত আছেন রিহার্শাল শেষ করে রাত করেই ফিরবে জয়শীলা।

এখন কি করবে জয়শীলা?

স্নেহলতা একবার বললেন, 'আজ না হয় এখানেই থাক। আমি খবর পাঠাচ্ছি।'

জয়শীলা বললে, 'না। আমার ভাগ্যের সঙ্গে তোমাকে আর জড়াতে চাইনে মাসিমণি। আমি সেখানেই ফিরে যাব।'

নিশ্বাস চেপে স্নেহলতা বললেন, 'তাই যা।'

ফেরার পথ অনেক দীর্ঘ মনে হল জয়শীলার। পা-দুটো যেন এগোতে চায় না।

দরজার গোড়ায় ঘুমকাড়া চোখে শিবতোষই একা দাঁড়িয়েছিল। অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে বললেঃ 'কখ্‌কনো কথা বলব না তোমার সঙ্গে। কখক্‌নো না।'

শিবতোষকে কঠিন হাতে বুকে চেপে ধরল জয়শীলা। তারপর ফিসফিস করে বললে, 'আর কখ্‌কনো দেরি হবে না আমার। কেনোদিন না।'

'কে বউমা?' সুহাসিনীর গলাঃ 'এত দেরি করে! আমরা তো ভেবেই অস্থির। শিবতোষ না খাবে না ঘুমোবে। জেদ ধরে দাঁড়িয়ে রইল দরজায়। শরীর ভালো আছে তো বাছা?'

জয়শীলা নীরবে মাথা নাড়ল।

অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙে নির্বানীতোষ দেখলঃ পাশে জয়শীলা নেই। বিবাহিত জীবনের এতগুলি দিনের মধ্যেও কোনোদিন নিঃসঙ্গ বিছানায় কাটেনি নির্বানীতোষের। তার নিজের মনের মতোই, মনে হল, বাইরের জগতটাও তেমনি নিঃসঙ্গ নিঃস্ব হয়ে আসছে। কেন এমন হয়? হঠাৎ কেন মাথার ভেতরের পোকাগুলো এমন কিলবিল করে উঠল। জয়শীলার বাক্স ভেঙে চিঠি হাতড়াবার আগেও, ভাবেনি এমন করবে সে। অসুস্থ বিছানায় শুয়ে-শুয়ে হঠাৎ-ই কেমন নড়বড়ে হয়ে উঠছিল তার চেতনা। আর অন্ধ সাপটা ছোবল বসাচ্ছিল তার রক্তে। নিঃসঙ্গ দুপুর আর উপযুক্ত অবসর তাকে আত্মবিস্মৃত করল। যে সুযোগটার প্রত্যাশায় তার মন রক্তশোঁকা শ্বাপদের মতো অন্ধকারে জিভ চাটছিল এতদিন, সেই পশুটাই যেন তার উৎসাহে তড়িতশক্তি জোগাল। বিছানা ছেড়ে উঠে পায়চারী করতে-করতে মরিয়া হয়ে উঠল নির্বানীতোষ। আলনার তলায় জয়শীলার

ট্রাঙ্কটা গুপ্ত রহস্যের মতো হাতছানি দিচ্ছিল তাকে। হাঁটু গেড়ে বসেছিল নির্বানীতোষ। আর অপেক্ষা করতে পারেনি, চাবির অভাবে ভেঙেই ফেলেছিল তালাটা, ক্ষিপ্র অপটু হাতে বাক্স তছনছ করছিল।···

কিন্তু···জয়শীলা কোথায় গেল?

মাথা তুলে একবার তাকাল নির্বানীতোষ।

মেঝেতে মাতুর পেতে সত্যি সত্যিই বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে জয়শীলা।

অনেকক্ষণ জয়শীলার ঘুমন্ত শরীরটার দিকে অপলকে চেয়ে রইল নির্বানীতোষ। হঠাৎ কেন জানি, কেমন এক হিম-হিম অশরীরী ত্রাসে সর্বশরীর কাঁটা দিয়ে উঠল ওর। যেন অনেক দীর্ঘব্যাধির পর নিদারুণ দুর্বলতায় সারা দেহে ঘামের নদী বইল।

মনে হল: এ মেয়ে সহজ বলেই এত কঠিন।

জয়শীলার দিনগুলি শুকিয়ে এল। অভিনয়কে কেন্দ্র করে হঠাৎ যে উৎফুল্ল হঠাৎ-উৎসাহ জেগেছিল, নিজের মনের থেকে সে উৎসাহে আর প্রাণ পেল না সে। প্রাণপণে নিজের অবস্থাকে চাপতে গিয়ে গুটিয়ে ফেলল নিজেকে। বাড়িতে কথা বলে কম, যতটুকু না-বললে চলে। আপিসে কাজ না-থাকলেও সিট আঁকড়ে পড়ে থাকে। রিহার্শালের ক্লান্তিকর ঘণ্টা-গুলোয় অবশ্য সজীবতা বাঁচিয়ে রাখতে হয়।

সুশীলাদি সেদিন একরকম ধরে বেঁধেই নিয়ে গেল তাকে টিফিন রুমে।

সুশীলাদি'র নিপুণ চোখ্‌কে ফাঁকি দেওয়া শক্ত বড়! আর ফাঁকি দিতেও সে চায় না। সুশীলার সহানুভূতিশীল হৃদয় তার মনের ক্ষতের উপর মলম বুলিয়ে দেয়। কিন্তু সব ঘটনাই কি সকলের কাছে বলা যায়। অন্তত যে-ঘটনার সঙ্গে তার সম্ভ্রমবোধ, আত্ম-সম্মান জড়িয়ে রয়েছে। নির্বানীতোষকে নিয়ে যদি আজ তার জীবন অশান্তিতে ভরেই ওঠে, তার জন্যে দায়ি তো কেউ নয়! দায়ি সে নিজে। একটি লোকের স্পর্ধাকে চুরমার করতে গিয়ে, চুরমার করেছে নিজের জীবনকে। মিথ্যার সঙ্গে হাত মেলাতে গিয়ে মিথ্যা করেছে নিজেকে। জীবনের মতো দুঃসাহসিক বস্তুটিকে নিয়ে মূর্খের মতো বাজি ধরেছে সে। এ তার হার, এ তার পরাজয়। নির্বানীতোষ তাকে কতটুকু অপমানিত করতে পারে যতটা সে করেছে নিজেকে।

'জানো সুশীলাদি—' চায়ের কাপ থেকে মুখ তুলে জয়শীলা বললে, 'আমাকে

অপমান করুক তা আমার সহ্য হয়। কিন্তু ও যখন আমার সন্তান সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে তখন আমি সহ্য করতে পারিনে।'

সুশীলাকে চিন্তিত দেখাল। তারপর প্লেটের উপর কাপটা ঘোরাতে-ঘোরাতে ম্লান হেসে বললে, 'খুব ভাবনায় ফেললি দেখছি। আগে ভাবতাম বিয়ে করাটাই সমস্যা, কিন্তু এখন দেখছি আসল সমস্যা বিয়ের পরেই। আমার মনে হয়ঃ ওকে বুঝিয়ে বলা দরকার—'

জয়শীলা বললে, 'যে বুঝতে চায় না তাকে বোঝাবে কে, সুশীলাদি'। অনেক ভেবেছি, ভেবে-ভেবে আর কূল পাইনে। আমার শরীরটাও যেন এই সময়ে আমার সঙ্গে শত্রুতা করে বসেছে! একলা হলে যা ভাবতে পারতাম, এখন আর তা পারিনে।'

সুশীলা বললে, 'তোর কথা সে না ভাবুক, স্ত্রী আর সন্তানের প্রতি দায়িত্বটুকুও তো পালন করবে নির্বানীতোষ। তোর এখন শরীরের এই অবস্থা…'

জয়শীলা বিশীর্ণ হাসল। 'যেখানে মনের সম্পর্ক নেই সেখানে আর শুকনো কর্তব্য দিয়ে কি হবে, সুশীলাদি।'

'মনের ব্যাপারের চেয়েও এ-সংসারে কর্তব্য যে অনেক বড় রে।'

জয়শীলা চুপ করে যায়।

আর এর পরে কিছু বলবারও থাকে না সুশীলার।

রাত্রি আসে বিষম বিপত্তি নিয়ে। কোনোদিন নির্বানীতোষ আগেই ঘুমিয়ে থাকে অথবা ঘুমের ভান করে। আবার কোনোদিন চিত হয়ে শুয়ে একটার পর একটা সিগারেট শেষ করে যায়। রাত্রি-নামা ঘরটায় ভূতুড়ে নিঃশব্দতা নামে। কথা হয় না। আর কথা না-হওয়ার চেয়েও ভারি নিস্তব্ধতা পীড়িত করে মনকে। মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে রোজকার মতো শুয়ে পড়ে জয়শীলা। একটা বর্ণহীন ধূসরতা পা ফেলে-ফেলে যেন টুটি টিপে ধরে তার! অস্বস্তি আর অস্বাচ্ছন্দ্যে ছটফট করে সে।

খাটের ওপরে কখনো নির্বানীতোষ কেশে ওঠে। কাশির মধ্যে দিয়ে যেন তার অস্তিত্বকে সহসা জাগিয়ে দিতে চায়। আর সেই অস্তিত্ববাহী ইংগিত সংকোচে শরমে আরো সংগুপ্ত করে দেয় তাকে। কখনো ভাববাচ্যে কথা হয়, বেশির ভাগ কথা আসে নির্বানীতোষের তরফ থেকে। যতটা দরকার জবাব দেয় জয়শীলা। এর বেশি নয়। পূর্বেকার স্বাচ্ছন্দ্য আর

ফিরে আসেনা তাদের জীবনে। অথচ বাইরের ঠাট ঠিকই বজায় রাখতে হয়। ভিতর-বাহিরের এই দুঃসাধ্য টানাপোড়েনে হৃদয় ছিঁড়ে খুঁড়ে যায় জয়শীলার। মনের দরজায় সতর্ক পাহারা দিতে-দিতে বাইরের চেহারাটা আরো বেশি স্থির, আরো সংযত হয়ে পড়ে।

সুহাসিনী ভাবতে আরাম পান আসন্ন মাতৃত্বের আমেজে আগে থেকেই বোধ-হয় নিজের ছড়ানো-ছিটনো মনটাকে প্রস্তুত করছে জয়শীলা। স্বভাবে আচরণে যে স্থিতি যে গাম্ভীর্য ছায়া ফেলেছে ওর মনে তা আসন্ন মাতৃত্বেরই পরিপক্ক রূপ।

ধিকিধিকি আগুনটা ধোঁয়াতে-ধোঁয়াতে নিবে যাবার আগে বোধকরি একবার দপ্ করে জ্বলে ওঠে। এ শুধু আগুনেরই ধর্ম নয়, মানুষেরও।

সেদিন অনেক রাত করে বাড়ি ফিরল নির্বানীতোষ। কোথায় নাকি তার রাত্রের নিমন্ত্রণ ছিল। জয়শীলা আর অপেক্ষা করেনি, খেয়ে নিয়ে মেজের বিছানায় নিঃশব্দে শুয়ে পড়েছে। ঘুম আসেনি চোখে।

নির্বানীতোষ সশব্দে দরজা বন্ধ করল। শব্দের মধ্যে দিয়ে আজকের অস্বাভাবিক মানসলোককে যেন বুঝিয়ে দিতে চাইল সে। ট্রাউজার ছেড়ে ত্বরিতে পাজামা পরে নিল। গেঞ্জির তলায় ওর উদ্ধত শরীরটা যেন ফুলে ফুলে উঠছে। কটকী চটিটায় ফটফট আওয়াজ করে খাটের উপর উঁচু হয়ে বসল নির্বানীতোষ। সিগারেট ঠোঁটে চেপে ধরে মোটা বদখত গলায় ঘড়ঘড় করে উঠল সে : 'উঠে এস।'

ওর কণ্ঠস্বরের উগ্রতায় শিউরে উঠবার কথা জয়শীলার। চোখ থেকে হাত সরিয়ে ব্যাপারটাকে বোঝবার চেষ্টায় ভীষণ বিভীষিকায় কেঁপে কেঁপে উঠল সে। কাঠ হয়ে পড়ে রইল মেঝের ওপর। নির্বাক, নিস্পন্দ।

নির্বানীতোষের কণ্ঠস্বর আবার নিঃশব্দ রাত্রিকে চমকে দিয়ে বেজে উঠল : 'কই, খাটে উঠে এস।'

জয়শীলা যেন বহুদূর থেকে উত্তর দিল : 'আমাকে বলছ?'

'হ্যাঁ—' নির্বানীতোষের মুখে আটকানো সিগারেটের আগুনটা যেন বন্য শ্বাপদের চোখ।

'কেন?'

জয়শীলার জিজ্ঞাসার সুরটুকু অতি সহজ, শান্ত, আর শান্ত বলেই কঠিন ক্রোধে নির্মম পুরুষের মতো দেখাল নির্বানীতোষকে।

'আসবে 'কিনা?' নির্বানীতোষ কাপুরুষতাকে কাটাবার জন্যে আরো প্রচণ্ড মরিয়া হয়ে উঠল।

'দরকার আছে কোনো?' জয়শীলা নিরুত্তাপ শীতল।

'আছে। উঠে এস।'

'ওখান থেকেই বলো। আমি শুনতে পাচ্ছি।'

'তুমি আসবে কিনা?' সপ্তমে গলার স্বর যেন ফেঁসে গেল নির্বানীতোষের।

'হুকুম করছ?' জয়শীলা নিচু গলায় বললে।

'যা ইচ্ছে মনে করতে পারো। তুমি উঠে এস।'

'না।' আশ্চর্য সংক্ষিপ্ত আর কঠিন শোনাল জয়শীলার গলা।

'না!' সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল নির্বানীতোষ। ওর ছায়া পড়েছে দেয়ালে, দৈর্ঘে প্রস্থে ওর ছায়াটা অমানবীয় মনে হচ্ছে। 'কই, আসবে কিনা?' নির্বানীতোষের গরম নিশ্বাস পুড়িয়ে দেবে বুঝি জয়শীলাকে। নিথর, স্থাণু জয়শীলা। নির্বানীতোষ আর নিজেকে শান্ত রাখতে পারেনা, দুটো শক্ত হাত দিয়ে ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল জয়শীলার নিস্তেজ, নির্বেদ দেহটাকে। 'ওঠো-ওঠো বলছি।' নির্বানীতোষের নির্লজ্জ উৎপীড়নের চাপে জয়শীলার শরীর যেন লজ্জায় সংকোচে পাথর হয়ে গেল। সহসা হ্যাঁচকা টানে তুলে ধরেছে নির্বানীতোষ ওর অনিচ্ছুক মরে-যাওয়া শরীরের উর্ধ্বাংশকে, টানতে-টানতে নিয়ে এসেছে খাটের কাছে, তারপর একটা অস্থাবর বস্তুর মতোই নিক্ষেপ করেছে খাটের ওপর।

দাঁতে দাঁত এঁটে ওর শরীরের ওপর যন্ত্রণার অত্যাচারটা সহ্য করতে গিয়ে প্রস্তরখণ্ডের মতো স্থির হয়ে রইল জয়শীলা। নাভির অনেক নিচে তলপেট থেকে ব্যথাটা মুচড়ে উঠছে। কাগজের মতো শাদা, পাংশু মুখের চেহারা। দরদর ঘামের লোনায় ভিজে জবজবে হয়ে গেছে শরীর।

ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুম ভেঙে পাশ ফিরে শুতে গিয়ে অস্ফুটে উঃ করে উঠল জয়শীলা। পাঁজরের নিচে কোথায় একটা ব্যথা খচ্‌খচ্‌ করে উঠল। শুধু পাঁজরে নয়, ব্যথাটা চারিয়ে গেছে শরীরের অনেক নিচে কোমরে, জংঘায়। জগন্নাথের অতিকায় রথটা যেন ঘড়ঘড় শব্দে হেঁটে গেছে তার বুকের ওপর দিয়ে। শারীরিক বোধের সঙ্গে মনটাও কেমন থমথমে বোকা-বোকা। এক রাত্রির অভিজ্ঞতা তাকে অনেক অভিজ্ঞ করে দিয়েছে।

নির্বানীতোষ অতো ভোরে উঠে আয়নার সামনে দাড়ি কামাবার তোড়-জোড় করছে।

পিছন থেকে মানুষটার দিকে চেয়ে চোখের পাতা পড়ল না জয়শীলার। কেমন বিকারহীন নিরুদ্‌বেগ চিত্তে গালে সাবান ঘসছে সে।

জয়শীলার কথা নাহয় নাই ভাবল নির্বানীতোষ। কিন্তু, অমন করে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাবার আগে একবারও সে ভাবল না, ডাক্তার মানুষ, বাচ্চাটার কত ক্ষতি হতে পারে!

অবশেষে পঁচিশে বৈশাখ এল।

আপিসে আজ ছুটি। উৎসব সেই সন্ধ্যা ছটায়।

দুপুর গড়িয়ে বিকেলের রোদ যতই চাঁপাফুলের মতো হল্‌দে হয়ে আসছে বুকের ভেতর একটা গুর্‌গুর্‌ পাখোয়াজের আওয়াজ যেন শুনতে পাচ্ছে জয়শীলা। যেন ভুলে যাচ্ছে সব পার্ট, সংলাপ, অঙ্গভঙ্গি। হঠাৎ যদি একটা অসুখ এসে লণ্ডভণ্ড করে দিত তার প্রোগ্রাম তাহলে হয়তো বেঁচে যেত সে। কিন্তু, সে জানে কিছুই হবে না। সময় মতো যেতে হবে তাকে। মুখে পেণ্ট্ ঘসতে হবে, পোশাক চড়াতে হবে গায়ে। আর সাবান-ঘসা ফোলানো-ফাঁপানো চুলে রক্তকরবীর মঞ্জরি এঁটে নিতে হবে।

কথা ছিল রজত এসে নিয়ে যাবে তাকে। কিন্তু, বারণ করে দিয়েছে জয়শীলা। একা যেতে তার অসুবিধে হবেনা কোনো।

ট্র্যামে সারা পথ অন্যমনা হয়ে রইল জয়শীলা। আপিসে পা দিয়ে উৎসবের উচ্ছ্বাসে আপনা থেকেই মন লঘু হয়ে এল। সুশীলাদি, সুধা, নির্ঝরিণী, আর বিজয়া।

'বাবা! তোমার জন্যে কতক্ষণ হা-পিত্যেশ করে বসে আছি—' সুধা কলকল করে উঠল।

নির্ঝরিণী কাব্য করে বললে, 'যাকে বলে পথ চেয়ে আর কালগুনে।'

'তবে এটা ফাল্গুন নয়, বৈশাখ।' সুশীলা বললেঃ 'চল। চট্ করে একটু চা খেয়ে আসি।'

'একী! নন্দিনীকে নিয়ে কোথায় চললেন আপনারা?' করিডোরে ব্যস্ত বিকাশের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তাদের।

'ভয় নেই রাজা, নন্দিনীকে সময়মতোই ফেরত দেবো।'

'বেশি, দেরি করবেন না কিন্তু, প্লিজ।' কাজের তাড়ায় উধাও হল বিকাশ।

ভালো লাগাবার চেষ্টা করছিল জয়শীলা। বুক থেকে ভারি বোঝাটা

হাল্‌কা হবার প্রয়াস পাচ্ছিল। উৎসব যেন ওদের, আনন্দের পালাও। জয়শীলা শুধু ওদের আনন্দের কারণ।

নির্ঝরিণী ছদ্ম গাম্ভীর্যে টেনে টেনে বললে, 'তুমি কিন্তু অমন করে বোলো না ভাইঃ বীর আমার, নীলকণ্ঠপাখির পালক...। বলে আমাদেরই হিয়া দুরুদুরু করে। রজত তো বেচারী ছেলেমানুষ।'

'কেন হার্ট ফেল করবে?' বিজয়া ঠোঁট মুচকে বললে।

'করতেও তো পারে। একে আগুনের শিখা তারপরে মাথায় করবী ফুল...'

'তুই না হয় স্মেলিং সল্ট নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকিস—' সুশীলা পরামর্শ দিল।

খিলখিল হাসির প্লাবন।

উঠে আসতে-আসতে পেছনে একলা পেয়ে হাতে চাপ দিল সুশীলাঃ 'মুখ অমন বিচ্ছিরি করে রাখিস নে। লোকে কি ভাববে!'

ম্লান হাসল জয়শীলা। মন লুকোতে গিয়েই তো মুখে রঙ মাখে মানুষ। ম্যাক্স-ফ্যাক্টর-ঘসা মুখে যখন ফ্ল্যাশ লাইটের আলো ঝলসে ওঠে তখন মনের কান্না ঝরাবার সময় কোথায়। পাষাণগাঁথা বন্দীর রাজত্বে নন্দিনী আলোকের ঝরণাধারা, আনন্দের রাজাকে কারাগার থেকে সে মুক্ত করে আনবে।

নাটক শুরু হল এবার।

কিশোর ডাকতে-ডাকতে মঞ্চে প্রবেশ করলঃ 'নন্দিনী, নন্দিনী, নন্দিনী!'

সংলাপ উচ্চারণ করতে গিয়ে সহসা থমকে দাঁড়াল জয়শীলা। কথা যেন আটকে আসছে। বাতির আলোকে দর্শকদের দৃষ্টি-বিদ্ধ হয়ে কেমন নিস্পন্দের মতো দাঁড়িয়ে রইল সে। উইংসের পাশ থেকে বিকাশ চাপাকণ্ঠে ধমক দিচ্ছেঃ 'বলুন-বলুন। ডায়ালগ বলুন—মিসেস চ্যাটার্জি—' সংলাপটাও আউড়ে গেল বিকাশ।

কিশোর পাকা অভিনেতা; সে যেন বুঝতে পেরেছে জয়শীলার কোথায় যেন কি হয়ে গেছে। নার্ভাশ হয়েছে হয়তো। উপস্থিত বুদ্ধি মাথায় খেলে গেল তার। মৌন জয়শীলার কাছে এগিয়ে গেল সে। আর নতুন করে সংলাপও বলে' গেলঃ 'নন্দিনী, নন্দিনী, নন্দিনী! এত ডাকছি চুপ করে আছ কেন?'

জয়শীলা সম্বিত ফিরে পেল। আর বাধল না সংলাপ। নন্দিনীই যেন প্রাণ ফিরে পেয়েছে! 'আমাকে এত করে ডাকিস কেন, কিশোর। আমি কি শুনতে পাইনে।'

নাটক জমে উঠল। জয়শীলা ভুলে গেল কখন তার ব্যক্তিগত পরিচয়। সে এখন নন্দিনী—যক্ষপুরীর আলোর দূতী।

অধ্যাপকের সামনে আর বাধো-বাধো ঠেকল না জয়শীলার। সকলকে অবাক করে দিয়ে সে তখন বলছে: 'অবাক হয়ে দেখছি, সমস্ত শহর মাটির তলাটার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে অন্ধকার হাতড়ে বেড়াচ্ছে।' সেই অন্ধকার হাতড়ানো শহরটা যেন তার মন, যাকে ছুঁতে পারছে, বুঝতে পারছে জয়শীলা।

মুহূর্ত এগিয়ে চলল।

নাটকের শেষদিকে এবার তার জনপ্রিয় সংলাপটা আশ্চর্য মমতা আর গভীরতার সঙ্গে বলতে লাগল জয়শীলা: 'বীর আমার, নীলকণ্ঠপাখির পালক এই পরিয়ে দিলুম তোমার চূড়ায়। তোমার জয়যাত্রা আজ হতে শুরু হয়েছে। (গলা কেঁপে উঠল জয়শীলার, কেমন প্রাণহীন কঠোর হয়ে আসছে কণ্ঠস্বর, মাথা ঘুরছে, পা টলছে। একটা নিঃসীম শূন্যতা যেন তাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরছে আকণ্ঠ)

নাটকের গতি ঝিমিয়ে আসছিল, বোধহয় শেষ পর্যন্ত শেষরক্ষা হত না। কিন্তু, পার্শ্বঅভিনেতাকে চালিয়ে নিতে জানে বিকাশ।

জয়শীলার সমস্ত দেহ নিঙরে আবেগ যেন দুর্বার হয়ে উঠছে। রঞ্জন যেন তারই নিহত মনের ইচ্ছা। বীর আমার, নীলকণ্ঠপাখির পালক···কিন্তু সে কোন্ বীর, যার গলায় পরিয়ে দেবে জয়মাল্য! ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে যেন দাঁড়িয়েছে জয়শীলা, কান্না, না, বেদনা, না—পচা গলা অস্তিত্বকে পালটাবার জন্যে এ যেন তার নতুন সংগ্রাম।

'রাজা, এইবার সময় হল।' নন্দিনীর কণ্ঠস্বরের ব্যঞ্জনা যেন পক্ষবিস্তারী পাখির মতো বিপুল আকাশে সংগ্রাম ঘোষণা করল।

রাজা বললেন, 'কিসের সময়।'

নন্দিনী বললে, 'আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার লড়াই।' এমন দৃপ্ত সতেজ ভঙ্গিতে গলাটা ছুঁড়ে দিল জয়শীলা, দর্শক তরফ থেকে হাততালিতে ভরে উঠল হল্। লড়াই লড়াই। মনে-মনে উচ্চারণ করল আবার জয়শীলা। হ্যাঁ তার জীবনে এবার লড়াই শুরু হয়েছে। আত্মরক্ষার, আত্মধ্বংসের।

রাজা বললেন, 'আমার সঙ্গে লড়াই করবে তুমি। তোমাকে-যে এই মুহূর্তেই মেরে ফেলতে পারি।'

নন্দিনী বললে, 'তারপর থেকে মুহূর্তে মুহূর্তে আমার সেই মরা তোমাকে মারবে। আমার অস্ত্র নেই, আমার অস্ত্র মৃত্যু।'

নাটক শেষ হয়ে এল।

নন্দিনী বলছেঃ 'একা আমাকেই নিরাপদের নির্বাসনে পাঠাবে। ফাগুলাল, তোমাদের চেয়ে সর্দার ভালো, সেই আমার জয়যাত্রার পথ খুলে দিলে। সর্দার, সর্দার—দেখো, ওর বর্শার আগে আমার কুন্দফুলের মালা দুলিয়েছে। ওই মালাকে আমার বুকের রক্তে রক্তকরবীর রঙ করে দিয়ে যাব।—সর্দার!—আমাকে দেখতে পেয়েছে! জয় রঞ্জনের জয়।' বুক দুলছে জয়শীলার, নাক থেকে গরম নিঃশ্বাস ফেটে বেরোচ্ছে, উদগ্র জ্বালায় জ্বলছে তার চোখের ডিম, দ্রুত ছুটে উইংসের ভেতরে আসতে-আসতে মাথা ঘুরে চোখে অন্ধকার দেখল সে, আর মূর্ছিত হয়ে পড়ে যাবার আগে তার মনে হল কে যেন টেনে নিল তাকে।

জ্ঞান ফিরলে চোখ মেলে দেখল জয়শীলা: তার মুখের সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে গোটা আপিসটা। সেনসাহেব, ব্যানার্জিসাহেব, অন্য সেকশনের অফিসাররা। পায়ের দিকে স্থির দাঁড়িয়ে রজত, বিকাশ ওরা।

'আপনি কি অসুস্থ মিসেস চ্যাটার্জি···' সেনসাহেবের কণ্ঠে উদ্বেগের স্পর্শ।

'না। ভালো আছি। মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল···' ম্লান হাসল জয়শীলা।

'যদি দরকার বোধ করেন, আমার গাড়িতে লিফ্‌ট দিতে পারি।'

'না। আমার কষ্ট হবে না। একায় যেতে পারব।'

একা যেতে হল না। রজতই সাথিত্ব দিল।

গাড়ি ছুটে চলল।

সেণ্ট্রাল এভিন্যুতে পড়তেই রজত জিগ্যেস করল: 'কি হয়েছে আপনার সত্যি করে বলুন দেখি মিসেস চ্যাটার্জি। বড় অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে আপনাকে।'

'কই, না তো।' জয়শীলা হাসল।

'তখন যদি আপনাকে ধরে না ফেলতাম এ্যাকসিডেণ্টই হয়ে যেত!'

'ধন্যবাদ।' জয়শীলা বললে, 'জীবনটাই তো এ্যাকসিডেণ্ট রজতবাবু। একটা এ্যাকসিডেণ্ট এড়াতে গিয়ে আরো হাজারটা এ্যাকসিডেণ্ট মুখিয়ে থাকে।'

'আপনার অভিনয়ের রেশ এখনো যায়নি দেখছি।' রজত হাসল।

জয়শীলা বললে, 'অভিনয়টা তো আর সত্যি অভিনয় নয়! তখন নিজেকে যদি নন্দিনী না ভাবতাম, তাহলে কি আর চরিত্রটি সত্য হত। কটা বেজেছে রজতবাবু?'

'পৌনে এগারো। বাড়িতে বোধহয় ওঁরা চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। কই, মিঃ চ্যাটার্জি তো এলেন না?'

'বোধহয় সময় পাননি।'

'তাই হবে।'

'আপনার স্ত্রীও বোধহয় জেগে বসে রয়েছেন...' জয়শীলা সহজ হবার চেষ্টা করল।

ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ ভালো লাগে না রজতের। শুকনো হেসে বললে, 'ওর এখন দুপুর রাত্রি।'

জয়শীলা বললে, 'সকাল-সকাল ঘুমোলে শরীর ভালো থাকে। ছেলেমেয়ে কটি আপনার?'

'চারটি।' বিরস মুখে বললে রজত।

হঠাৎ মনে হল রজতের: যেন ইচ্ছা করেই এসব ঘরোয়া প্রশ্ন খুঁচিয়ে তুলছে জয়শীলা। যেন পাশাপাশি সিটে বসে থাকলেও ব্যবধানের পাঁচিলটা তুলে দিতে ভোলেনি সে। অপাঙ্গে জয়শীলার শক্ত পাথরের মতো অভি-ব্যক্তিহীন মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে চোখের পাতা পড়ল না রজতের। হঠাৎ হৃদয় পুড়তে লাগল তার। মুর্ছাহত জয়শীলার নরম শরীরের উষ্ণতা যেন এখনো অনুভব করতে পারছে সে।

আবার ঘর। সেই চারদেয়াল। আর রাত্রির ব্যংগ। খাটে নির্বানীতোষের নিদ্রালু দেহ। একটা দীর্ঘনিশ্বাস চাপতে-চাপতে জামাকাপড় ছাড়তে লাগল জয়শীলা।

কয়েকটা মাস গড়িয়ে গেল।

সকালে চায়ের আসরে সুহাসিনী রাগ করে বললেন, 'হ্যাঁরে নিবান, বউমার শরীর তো মোটেই সারছে না। যত্ন করে ওষুধটষুধ দে ওকে। তুই ডাক্তার, ওর ভালোমন্দ তুইই বুঝবি ভালো।'

নির্বানীতোষ চায়ের বাটি থেকে মুখ তুলে বললে, 'যত্নের কমতি দেখলে কোথায়। ওষুধ তো এনে দিয়েছি।'

সুহাসিনী মুখ গোঁজ করে বললে, 'ছাইভস্ম কি দিচ্ছিস তুই জানিস। আমাদের সময়ে শাশুড়িরাই সব জানতেন। কিন্তু বউমার এমন কপাল, আমি কিছুই জানিনে। তা আমি বলি কি: একবার হাসপাতাল থেকে দেখিয়ে আন না।'

নির্বানীতোষ বললে, 'বেশ তো। তোমরা যদি চাও যাব।'

হাসপাতালে একদিন দেখিয়েও নিয়ে এল জয়শীলাকে। কর্ণেল সমাদ্দার বহুদিনের পরিচিত, বিশেষ স্নেহ করেন নির্বানীতোষকে।

পরীক্ষান্তে হেসে বললেন কর্ণেল জয়শীলাকে: 'মিসেস চ্যাটার্জি, আপনি এমন মোরোস কেন? বি মাদার, নট ফিজিকালি, সাইকলজিকালি ট্রু। ফূর্তিতে থাকুন, ভালো চিন্তা করুন, সুন্দর ছবি দেখুন। ঘরের দেয়ালে একটা হেলথি এণ্ড বিউটিফুল বেবির ছবি টাঙিয়ে রাখুন—শোবার সময় শিশুটির মুখ ভাববার চেষ্টা করবেন।' তারপর নির্বানীতোষের দিকে ফিরে নিভৃতে ডাকলেন: 'শোনো ডক্টর—আচ্ছা, মিসেস কি কখনো পড়েটড়ে গেছলেন? বেবি নর্মাল স্টেজে নেই। ডোণ্ট ওরি, একটা আসন দিচ্ছি, করতে বলবে...'

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল দুজনে।

কার্তিকের মাঝামাঝি থেকে আপিসে ছুটি নিল জয়শীলা। দশটা পাঁচটা করতে আর পারছিল না তার স্ফীত শরীর নিয়ে। ট্র্যাম ধরতে আপিসের সিঁড়ি ভাঙতে হাঁপ ধরত। অখণ্ড অবসর শুয়ে-বসে কাটিয়ে দিতে খুব খারাপ লাগল না। খুচরো কাজও কিছু কিছু করে। শিবতোষকে স্নান করিয়ে দেওয়া, পড়া বলা। খাবার ঘরে কখনো কুটনো কুটতে বসা, সকালে চা জলখাবার। সন্ধ্যার দিকে আর পারে না জয়শীলা, বিছানা থেকে আর উঠতে ইচ্ছে করে না। শুয়ে-শুয়ে হাল্‌কা মাসিকপত্র, কি হালের নতুন বাংলা উপন্যাস। ক্লান্তি আর ছোট-ছোট কাজের ভিড়ে দেয়ালে টাঙানো স্বাস্থ্যল হাসিখুশি বেবির মুখ ভুলে যায় সে। হঠাৎ চোখ পড়লে ক্যালেণ্ডারের ছবির মতোই চেয়ে থাকে একদৃষ্টে। চোখ থেকে মস্তিষ্কে কি হৃদয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না। কর্ণেল সমাদ্দারের কথাটা ভোমরার ব্যাজব্যাজ শব্দের মতো এক-এক সময় বিরক্তিকর ঠেকে: সাইকলজিকালি মা হতে হবে। কথাটায় রোমাঞ্চ আছে, কানের কাছে কেউ স্তব করে গেলে যেমন মনে হয়।

কিন্তু, জয়শীলার কাছে এই মাতৃত্ববোধ পীড়াদায়ক। নির্বানীতোষের বিকারহীন শাদা চোখের চাহনিতে লজ্জায় সংকোচে ছোটো হয়ে পড়ে জয়শীলা। যেন উপযুক্ত মূল্য না দিয়ে ফাঁকি দিয়ে নির্বানীতোষের সন্তানের মা হয়ে বসেছে সে।

নির্বানীতোষের চোখের চেহারা বদলে যায় ক্রমশ। যে-চোখে আগে ছিল কুটিল সন্দেহ বন্য ক্রোধ, সে-চোখ এখন কুতূহলহীন উষর হয়ে পড়েছে। ছেঁড়া ছেঁড়া কথা কখনো-সখনো, ওষুধ খাওয়ার নির্দেশ। ডাক্তারের চোখে সে এখন পেসেণ্ট ছাড়া কিছু নয়। স্বামী-স্ত্রীর জীবনের প্রথম অতিথি—সন্তান। সে-সন্তানকে ঘিরে নেই ভবিষ্যতের পরিকল্পনা, নেই সজীব আশাবাদ।

আপিসের মেয়েরা মাঝে মাঝে আসে। সুশীলা, সুধা, নির্ঝরিণী আর বিজয়া। রজত বিকাশও এক রবিবারের সকালে এসেছিল। সেই সময়টুকু ভালো লাগে জয়শীলার, ওদের সাহচর্যে বাইরের জগতের আলো-হাওয়া খুশি ছিটিয়ে দেয় মনে। নির্বানীতোষের সঙ্গে কোনোদিন শিষ্টাচার বিনিময় হয়েছে, প্রায় দিন দেখাই হয়নি আপিসের বন্ধুদের সঙ্গে। দেখা না হয়েছে ভালোই হয়েছে, ভাবে জয়শীলা। তাদের হাল্কা গল্পসল্পের মাঝে নির্বানী-তোষের উপস্থিতিটুকু গুমোট আবহাওয়ার মতো।

সুশীলাদি কোনোদিন একলা এলে অনেক কথা হয়, হৃদয় উপুড় করে দেয় জয়শীলা। সুশীলাদি এমন মানুষ যার কাছে লজ্জা নেই। উপদেশ, দেয়, পরামর্শ দেয়—বন্ধুর মতো, সচিবের মতো।

বলে, 'এমন অনেক সময় দেখা যায়—সংসারে একটি ছেলে এল, আর দাম্পত্যজীবনের অনেক গ্লানি, ভুল বোঝাবুঝি সে মুছে দিল। কাজেই সব চুকে গেছে এমন ভাবিসনে শীলা, হয়তো নতুন আরম্ভও হতে পারে।'

জয়শীলা হাসে। 'প্যাণ্ডোরার কাস্‌কেটে যেদিন আশা নামক বস্তুটি আট্‌কা পড়েছে, সেদিন থেকে মানুষের জীবনে ওটাই একমাত্র সম্বল রয়ে গেছে।'

সুশীলা বলে, 'জীবনটা যখন অনেক বড় তখন আশা ছাড়ার কোনো কারণ দেখিনে। আর তাছাড়া, তোদের ছেলে তো কোনো দোষ করেনি। জন্মে যদি সে দেখে মার গুমরো মুখ আর বাপের কালিঢালা চেহারা, তাহলে সে কি খুব খুশি হবে?'

'আমি কী করতে পারি, বলতে পারো?' যন্ত্রণায় হাত ছুঁড়ে বলে জয়শীলা। 'আমাকে বুঝতে পারবে এমন একটি স্বামী আর ছোট্ট একটি শিশু—এই তো আমি চেয়েছিলাম…'

'যে আসছে তার কথা ভেবেই বুক বাঁধ। নির্বানীতোষ পুরুষ, বাবা হতে না-পারলেও তার উপায় আছে, কিন্তু তুই মেয়ে, মা না-হয়ে তোর যে যো নেই, শীলা।'

সাইকলজিকালি-মাদার! হাসল জয়শীলা। 'তোমার গলার সুর ঠানদিদির মতো শোনাচ্ছে সুশীলাদি। ফুটপাথে রাতকাটায় যে সব মেয়েরা তারাও তো মা হচ্ছে। আমি মিথ্যা মা হতে চাইনে। যে-মাতৃত্বের পেছনে পিতৃত্বের গৌরব নেই, সেই মিথ্যা, ফাঁকি নিয়ে আমার কি হবে!'

সুশীলা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ভেবে বললে, 'মাতৃত্বের চেয়ে

গৌরবের জিনিস আর কি আছে। পিতৃত্ব তাকে নতুন আর কি গৌরব দিতে পারে।'

অভ্রাণের দ্বিতীয় হপ্তায় রাত্রি দুটোয় যন্ত্রণাক্লিষ্ট জয়শীলা হাসপাতালে গেল। ব্যথাটা এক-একবার থেমে যাচ্ছিল। পরদিনও একভাবে কাটল। তার পরদিন ভোরের দিকে সন্তানের জন্ম দিল জয়শীলা। একটুও জ্ঞান হারায়নি সে, ব্যথাটা কখন তলপেট থেকে নিচে নামতে-নামতে একেবারে মিলিয়ে গেল। সারাক্ষণ ছোকরা সার্জন মজার-মজার গল্প করে ভুলিয়েছে তাকে, হেসেছে জয়শীলা, কথার উত্তর দিয়েছে। আর সামান্য চেষ্টা করতেই নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছে সে।

'কি চান আপনি বলুন তো? ছেলে না মেয়ে?' হেসে জিগ্যেস করল সার্জন।

'ছেলে—'

'ছেলেই হয়েছে আপনার।'

লেবর-রুম তখন শিশুকণ্ঠের তারস্বরে মুখর। সার্জন ছুটে গেলেন অন্য প্রসূতির সাহায্যে।

নবজাতকের হাতের টিকিটের নম্বরের সঙ্গে নম্বর মিলিয়ে জয়শীলার হাতে আর-একটা চাকতি বেঁধে দিল নার্শ। রসিকতাও করল: 'দেখবেন চাকতিটা হারিয়ে ফেলবেন না। আসল ছেলে নকল ছেলে চিনতে পারবেন না তাহলে।'

হাসপাতালের দশটা দিন। প্রাইভেট নার্শ রেখেছে নির্বানীতোষ দিনে রাত্রে। মাসিমা এসেছেন, শাশুড়ি প্রায় রোজই। আপিসের বন্ধুরাও দেখা করে গেছে কয়েকদিন। নির্বানীতোষ কাজের মানুষ, তবু জয়শীলার সুবিধা-অসুবিধার প্রতি ওর কর্তব্য জাগ্রত।

আবার বাড়ি। সেই চার দেয়াল, সেই রাত্রি।

নতুনত্ব বলতে শুধু ছেলেটি।

আরো কয়েকটা মাস গড়িয়ে গেল।

আপিসে জয়েন করল জয়শীলা।

সেদিন আপিস থেকে ফিরতেই সুহাসিনী দুম করে খোকাকে জয়শীলার কোলে ফেলে দিয়ে মুখ গোঁজ করে বললেন, 'নাও বাছা, তোমাদের সংসার

তোমরাই দেখে শুনে নাও। তোমাদের ছেলেপুলে মানুষ করতে আমি পারব না…'

জয়শীলা খোকার চুলগুলো সরাতে-সরাতে হেসে বললে, 'কেন মা। সারাদিন আপনাকে জ্বালিয়েছে বুঝি।'

'কেন বাছা, তুমি কি কিছুই জানো না?' অবিশ্বাসী চোখে সুহাসিনী তাকালেন জয়শীলার দিকে।

'কি জানব মা?' জয়শীলা খোকার চোখ থেকে কাজলের কালি মুছতে মুছতে বললে।

'কেন? নির্বান কিছু বলেনি তোমাকে?'

'কি কথা?'

'ও নাকি বার্মায় যাচ্ছে চাকরি নিয়ে…'

চমকে উঠল জয়শীলা। 'কী বললেন?'

'হ্যাঁ মা। আজ দুপুরে খাবার সময় তো নির্বান বললে আমাকে ওই কথা।'

অশরীরী ভয়ে সর্বশরীর কেঁপে উঠল জয়শীলার। বর্তমান ভবিষ্যতের চেহারাটা যেন দুলে উঠল চোখের সামনে। খোকাকে আরো শক্ত করে আঁকড়ে ধরল সে। কান্না নয়, সারা শরীরটা কেমন পাথরের মতো নিরেট, কঠিন। নীরক্ত বিবর্ণ মুখ, পাণ্ডাশে হয়ে আসা ঠোঁটদুটো থরথর করে উঠল জয়শীলার।

সন্ধানী চোখে তাকিয়ে রইলেন সুহাসিনী। তারপর বললেন, 'আচ্ছা বউমা, তোমরা কি ঝগড়া করো দুজনে। নির্বানের হাব-ভাবও যেন কেমন-কেমন। ভালো করে কথাই বলেনা আমার সঙ্গে। অথচ ওতো এমন ছিল না আগে।'

জয়শীলা মূক।

সুহাসিনী আবার বললেন, 'কি জানো মা, সংসার করতে গেলে ঝগড়া একটু-আধটু হয়। মানিয়ে চলতে হয় নিজেদের। আমি বলি কীঃ তুমি একটু বুঝিয়ে বলো ওকে।'

'বলব মা।'

সারা সন্ধ্যা ঘটনাটা যেন তাকে তাড়া করে বেড়াল। বিশ্বাস করবার জোর পায়না জয়শীলা। নির্বানীতোষ তাকে শাস্তি দিতে চায়, কিন্তু সে-যে এমন শাস্তি ভাবেনি জয়শীলা। সে জানে, জয়শীলা এখন মা হয়েছে, তার নানান অসুবিধে,চল তে-ফিরতে অনেক বাধা, অনেক সাবধানতা, আর

এই সময়ে নির্বানীতোষ আঘাত হেনেছে। শাস্তি দেবার উপযুক্ত সময় বটে। ওর চলে-যাওয়াই শুধু শাস্তি নয়, তারপরও, নির্বানীতোষ জানে, জ্বলতে-পুড়তে হবে জয়শীলাকে—সংসারের নানাবিধ জটিলতা, হাজারো প্রশ্ন, কুতূহল। সকলে দোষ দেবে তাকে। বলবে: স্ত্রীর স্বভাবগুণে ছেলেটা বিবাগী হয়ে চলে গেল। নির্বানীতোষ বিদায়ের সময় জয়শীলার সম্ভ্রমবোধ, সম্মান, মর্যাদা-সবকিছু ধূলিলুণ্ঠিত করে চলে যাবে। বাড়িতে সুহাসিনীর চোখে আরো সন্দেহ ঘনাবে, বিষিয়ে উঠবে দৃষ্টি, আপিসের লোকজনের কৌতূহলের পুরু পর্দাটাও একদিন নির্লজ্জ উৎকট হয়ে পড়বে। নির্বানীতোষের অস্তিত্ব যেন একটা নিশ্চিন্ত দুর্গ—তার অবর্তমানে সেই দুর্গ ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে, না-থাকবে আব্রু, না-মর্যাদা।

মার-খাওয়া নিরুপায় শ্বাপদের মতো জয়শীলার চোখ ধিকিধিকি করে জ্বলতে লাগল।

রাত্রে নির্বানীতোষ বাড়ি ফিরতেই জয়শীলা বললে, 'মার কাছে শুনলাম…'

নির্বানীতোষ জামার বোতাম আল্‌গা করতে-করতে বললে, 'হ্যাঁ। ঠিকই শুনেছ। পাঁচ বছরের কনট্রাক্ট সার্ভিস। প্রোমে পোস্টিঙ।'

জয়শীলা নির্বানীতোষের মুখের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে, 'তুমি কি আমার জন্যেই চলে যাচ্ছ।'

'বারে! চাকরি করতে কি আর কেউ দূরদেশে যায়না…'নির্বানীতোষ সহজ অভিনয় করবার চেষ্টা করল।

'কিন্তু…আমার কথা একবারও ভেবে দেখলে না। তোমার ছেলে…'

নির্বানীতোষ শুকনো হাসল। 'মা রইলেন, তুমি রইলে, লোকের অভাব কি! আর মাসে মাসে আমার টাকা তো পাচ্ছই।'

জয়শীলা মৃদু গলায় বললে, 'আমাকে শাস্তি দেবার আগে ভেবে দেখলে না আমি সত্যিই এত কঠিন শাস্তি পাবার যোগ্য কিনা!'

নির্বানীতোষ খাটে বসে পা থেকে মোজা মুক্ত করতে-করতে বললে, 'শাস্তির কথা ওঠে কি করে। ও তোমার বানানো অভিযোগ।'

জয়শীলা সে কথার উত্তর না দিয়ে বলে চলল: 'আমি যদি তোমার কাছে এতই অসহ্য হয়েছি, বললেই পারতে, আমিই বিদায় হয়ে যেতাম।'

নির্বানীতোষ সিগারেট ধরাল। 'আমার পক্ষে ডিসিশন পালটানো সম্ভব নয়।'

'তবে আমাকেও নিয়ে চলো।'

নির্বানীতোষের কপালে চিন্তার রেখা।

'আমাদের ফেলে যেওনা নির্বান। কথা শোনো। তুমি ছাড়া যে আমার কেউ নেই।' জয়শীলার কণ্ঠে আর্তি।

'তা হয়না।' নির্বানীতোষ সংকল্প-দৃঢ়।

জয়শীলা সরে গেল। খুব কাশছে বাচ্চাটা। বিছানা ভিজিয়েছে। কাঁথাটা পাল্‌টে দিল জয়শীলা। খোকার মুখে নির্বানীতোষের আদল। তেমনি ঘন জোড়া ভুরু আর পুরু ঠোঁট। ও যখন বিরক্ত হয়, নির্বানীতোষের মতো অবিকল দেখায়। জন্মে থেকে রোগা। এটাসেটা লেগেই আছে। গা কি গরম হয়েছে? চিন্তা ঘনাল জয়শীলার চোখে।

চোখে ঘুম নেই।

খাটের উপরে নির্বানীতোষ কি সত্যি ঘুমিয়েছে।

আলনার তলায় বোধহয় একটা ঝিঁঝি পোকা লুকিয়ে রয়েছে, বিরামহীন একঘেয়ে ডাক। বিরক্তিকর।

জয়শীলা ডাকল: 'ঘুমিয়েছ?'

'না।' নির্বানীতোষ খাট থেকে জবাব দিল।

'তুমি চলে গেলে একবার ভেবে দেখেছ মা কি ভাববেন, দশজনে কি ভাববে…'

'মা আবার কি ভাববেন! আমি তাঁকে সব বলেছি।'

'তিনি তো ভেবেছেন তুমি আমার সঙ্গে ঝগড়া করে চলে যাচ্ছ।'

'মা যদি ওকথা ভাবেন, আমি কি করতে পারি!'

'ওঁর ভাবনার দোষ কি, সকলেই যে সেই কথা ভাববে।'

নির্বানীতোষ গম্ভীর গলায় বললে, 'তুমি তো জানো আমি সকলের কথায় খুব বিশ্বাসী নই। দাম্পত্য জীবনে আমি গণতন্ত্র-বিরোধী লোক।'

'কিন্তু আমার জন্যেই তুমি চলে যাচ্ছ একথা তো মিথ্যে নয়।'

'ধরো যদি তাই হয়: তাহলে তুমি কি করবে!' হাসল নির্বানীতোষ: 'কই, উত্তর দিতে পারলে না তো। আমি জানি এর উত্তর নেই।' নির্বানীতোষ পাশ ফিরল।

সত্যিই কি উত্তর নেই এর। জয়শীলা চুপ করে পড়ে রইল। সব প্রশ্নেরই উত্তর আছে হয়তো-বা। কিন্তু সে-জবাব কি ভালো লাগবে নির্বানীতোষের। আবার অতীতকে খুঁড়তে হয়, কিন্তু পচা শবের গন্ধের ভয়ে আর প্রবৃত্তি নেই জয়শীলার। একদিন ভেবেছিল: জীবনের অনেক

অপচয়, ব্যর্থতা ভরে তুলবে নির্বানীতোষের সাহায্যে। নির্বানীতোষের সাহচর্য পেল ঠিকই, কিন্তু অপচয় বন্ধ হল না। দেবপ্রিয়ের কথা বড় বেশি করে মনে পড়ছে এই সময়ে। পৃথিবী গোল, আবার যদি কোনোদিন দেখা হয় ওর সঙ্গেঃ কি জবাব দেবে, কি করে বিষণ্ণ পাণ্ডুর মুখ তুলে ধরবে তার দিকে। হাসবে দেবপ্রিয়। বলবেঃ পৃথিবী শুধু সূর্যের চারদিকে ঘোরে। সূর্যের আকর্ষণ যেদিন পৃথিবী হারাবে, সেদিন তার অনিবার্য পতন। গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ঘুরে অবশেষে ক্ষয় হয়ে পড়েছে জয়শীলা। নিজেকে কোথাও জড়িয়ে রাখবার মতো আকর্ষণও বোধহয় রইল না।

আপিসে বেরোবার আগে সুহাসিনী জিগ্যেস করলেনঃ 'নির্বানকে বুঝিয়ে বললে সব?'

'বলেছি।' ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে পা বাড়াল জয়শীলা।

'কি বললে? যাবে না তো ও?'

'যাবে।' আশ্চর্য সহজ গলায় জানাল জয়শীলা।

থ হয়ে চেয়ে রইলেন সুহাসিনী। তারপর মুখ কালো করে বললেন, 'তোমরা আজকালকার ছেলেমেয়েরা কেন যে মেলামেশা করে বিয়ে করো, আর কেন যে তোমাদের এত অমিল বুঝি না বাপু। লেখাপড়ার মানে কি রইল তাহলে—?'

জয়শীলা সদর দরজা ডিঙোতে ডিঙোতে বললে, 'খোকাকে আজ আর দুধ দেবেন না মা। শরীরটা গরম ঠেকছে। বার্লির জল করে দেবেন।'

আপিসের রঙও যেন ফিকে হয়ে আসছে। কোথা থেকে দুর্মর অবসাদ জড়িয়ে ধরছে তাকে। বাচ্চা হওয়ার পর থেকে শরীরটা বোধহয় তেমন করে সারেনি। মেটাটোনের শিশিটা ফুরিয়ে গেছে। আজ ফেরার সময় কিনে নিয়ে যাবে মনে করে।

সুপারিনটেনডেণ্ট বললেন, 'এই যে মিসেস চ্যাটার্জি। আপনি এ্যাকাউণ্টস-এ বদলি হয়েছেন। ওখানে রিপোর্ট করুন।'

আবার নতুন সেকশন। নতুন মানুষ। পরিচিত বলতে রজত।

জয়শীলাকে দেখে খুশিই হল রজত।

সুপারিনটেনডেণ্ট বললেন, 'আপাতত আপনি রজতবাবুকেই এ্যাসিস্ট করুন। কাজ ধাতস্থ হলে আলাদা সিটের ব্যবস্থা করে দেবো এখন।'

টিফিনের সময় পুরানো সেকশনের মেয়েদের সঙ্গে চা খেতে গেল জয়শীলা।

নির্ঝরিণী জিগ্যেস করল : 'বাচ্চা কেমন আছে ? ফোটো তুলেছিস ?'

জয়শীলা হাসল। 'শরীর সারছে না মোটেই। আজও গা গরম দেখে এলাম।'

'সেরে যাবে ভাবিসনে। বাচ্চাদের ছোটখাটো অসুখ-বিসুখ হওয়া ভালো। আমার কিন্তু ফোটো চাই ভাই—'

'আচ্ছা। তোলা হোক আগে।'

'তুমি ভাই কেমন বদলে গেছ একেবারে। মা হলে বুঝি এমনিই হয়। যাকে বলে একেবারে লেডি বনে গেছ।'

'তার মানে বুড়িয়েছি এই তো।' জয়শীলা হাসল। 'বয়েস তো কম হল না।'

'তারপর কি নাম রাখলি ছেলের ? ওর বাবা কি বলে ডাকে।'

গরম চায়ে যেন ফোস্‌কা পড়ল জয়শীলার জিভে। অন্যমনস্ক ভাবটা কাটিয়ে বললে, 'তেমন নামটাম কিছু হয়নি এখনো। তোরা দেনা।'

'আমাদের দেওয়া নাম পছন্দ হলে তো !'

জয়শীলা হাসল। 'সুশীলাদি, তুমি যে বড় চুপ।'

নির্ঝরিণী-ই উত্তর দিল। 'সুশীলাদি কি আর কথা বলবে আমাদের সঙ্গে। ওর গল্প সিনেমা হচ্ছে।'

'সত্যি সুশীলাদি, তুমি যে গল্প লেখো তাতো জানতাম না।'

সুশীলা বললে, 'ওদের কথা ছেড়ে দে। কালেভদ্রে একটা গল্প লিখে-ছিলাম। আমার এক মামার গল্পটা পড়ে খুব ভালো লেগে যায়, কোন্‌ এক প্রডিউসারকে দিয়েছেন পড়তে। এই পর্যন্ত।'

'ভালো গল্প লিখবে, আমি তোমাকে প্লট দিতে পারি !' জয়শীলা হেসে বললে।

সুশীলা উত্তর দিল : 'তোর প্লট নিয়ে গল্প লিখতে পারে এমন সাহিত্যিক আজও বাংলা দেশে জন্মায়নি।'

আবার সেকশন। সামান্য কিছু কাজ এগিয়ে দিল রজত। এ্যাকাউণ্টস্‌ পোস্টিং। কাজের ফাঁকে-ফাঁকে মাঝে মাঝে কথা বলল রজত। হাসল। উত্তরও দিল জয়শীলা। সবই সাধারণ কথা, আটপৌরে।

আপিসের পর স্নেহলতার ওখানে গেল জয়শীলা।

'এখনো তুই একা-একা আসবি ! ছেলেকে নিয়ে এলি না কেন ?' স্নেহলতা সস্নেহ তিরস্কার করে উঠলেন।

জয়শীলা হাসল। 'আপিসে তো নার্শারি নেই যে ছেলে জিম্মা রেখে ফেরার সময় ব্যাগে পুরে নিয়ে আসব।'

'তোর সঙ্গে কথায় পারবার যো নেই বাপু। কথার জাহাজ একেবারে!'

জয়শীলা হাসল শুধু।

'ছেলে মোটাসোটা হল, না তেমনি রোগাই···'

'জন্মেছে তো ছ'পাউণ্ড পাঁচ আউন্স নিয়ে। এত শীগ্রি মোটা হবে, এমন ভাগ্যি আমার।'

'ডাক্তার বাপ সারিয়ে তুলতে পারে না? কেমন ডাক্তার তাহলে?'

'ডাক্তারকে সারাবে কে?'

'সেকি! ওর আবার কি অসুখ হল! শুনিনি তো কিছু···'

'হয়নি। হতে কতক্ষণ।' জয়শীলা হাসল।

'কি যে হেঁয়ালিতে কথা বলিস বাপু। ভালো লাগে না।'

'ভালো কি আমারও লাগে মাসিমা। তবু ভালো লাগাতে হয়।'

জয়শীলার গলার স্বরে কেমন ক্লান্তি জড়ানো, স্নেহলতা ওর মুখের দিকে চেয়ে সন্দেহঘন গলায় জিগ্যেস করলেন, 'কি হয়েছে। সত্যি করে বলতো।'

জয়শীলা তখন বিছানার পরে লম্বা হয়ে পড়েছে। সিলিঙের দিকে চোখ। মাকড়সার জালে উড়তে-উড়তে একটা পোকা এসে পড়ল, ধাড়ি মাকড়সাটা পা দিয়ে দোলাতে লাগল জালটা, পাকে-পাকে জড়িয়ে গেল পোকা।

'কি হয়েছে, এই, অমন চুপ করে আছিস কেন?'

জানালার ফ্রেমে শীতের মরা আকাশ। মাছের চোখের মতো। জীবনটা যেন জলে-ধোয়া পুথি—অক্ষরগুলি লেপেপুঁছে গেছে—কিছু পড়া যায় না, জানা যায় না কিছু।

জয়শীলার গলা হঠাৎ বেসুরো শোনালো: 'জানো মাসিমা, নির্বান বার্মায় যাচ্ছে চাকরি নিয়ে···'

'সে কি! কেন?'

'আমার সঙ্গে ঝগড়া করে।'

মাকড়সাটা গুটি গুটি এগোলো পোকার দিকে। ছটফট করছে পোকাটা। জীবন মৃত্যুর আক্ষেপ।

'তুই, তুই যেতে দিবি ওকে!'

'আমার বারণ শুনছে কে। ওর ডিসিশন ফাইনাল।'

'মুখপুড়ি মেয়ে, ভালো-মন্দ জ্ঞান নেই তোর! ওকে ভালো করে বুঝিয়ে বল্।'

'বুঝিয়েছি।'

'ব্যাস। ওতেই নিশ্চিন্ত আছিস। কী জানি বাপু, কি যে তুই ভাবিস আর করিস…'

'আর ভাবব না মাসিমা, আর ভেবে কিছু করব না…'

'কাব্যি রাখ। ওকে কিছুতেই যেতে দিস্‌নে।'

'কি বলো, পায়ে ধরব ?'

'দোষ কি !'

জয়শীলা ধড়মড়িয়ে সোজা উঠে বসল। 'উপদেশ দেওয়া সহজ। কই, তুমি ফিরে যেতে পারলে মেসোমশায়ের সঙ্গে…'

স্নেহলতা বিবর্ণ, পাংশু।

জয়শীলা মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললে, 'তা হয় না মাসিমা, তা হয় না। মানুষের কনসেশন দেবারও একটা লিমিট আছে। অনেক ছেড়েছি, ছেড়ে-ছেড়ে নিজের জন্যে আর কিছু রাখিনি। ভুল করেছি হয়তো। সে ভুলগুলিকেই সুদেমূলে তুলে নিতে হবে, মাসিমণি। আমি পৃথিবীতে কারু কাছে কোনো দোষ করিনি, ঠকাইনি কাউকে। তবে আমি পড়ে-পড়ে আর মার খাব কেন ?'

বিড় বিড় করে বললেন স্নেহলতা : 'আবার ভুল করবি, শীলা। কিছু করা যায় না, কিছু করবার উপায় নেই রে…'

আবার বিছানায় গা এলিয়ে দিল জয়শীলা।

মাকড়সাটা ততক্ষণে এগিয়ে গেছে পোকাটার কাছে। কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে কি পর্যবেক্ষণ করল। তারপর বারবার মুখ দিয়ে ঠোকরাতে লাগল পোকাটাকে।

জয়শীলা বললে, 'বাঁচবার যার লোভ আছে, উপায় পেতে তার দেরি হয় না। আর কিছু না হোক জ্বলতে পারব তো, জ্বালাতে তো পারব।'

স্নেহলতা ফাঁসা গলায় বললেন, 'জীবনটা কি খড়ের গাদা যে জ্বালাবি। বোকামি করিসনে, শীলা।'

'কিন্তু, কী করতে পারি বলতে পারো।'

'এমনও তো হতে পারে দূরে গিয়ে একদিন ভুল বুঝবে নির্বানীতোষ। ওর ফেরবার পথ তুই বন্ধ করিসনে, শীলা। সময়ের চেয়ে আর বড় আরোগ্য কি আছে !'

'বেশ। দেখা যাক।' জয়শীলা বললে।

আপিসে কাজের তাড়ার ফাঁকে আজ একটি কথাই মনে পড়ছিল জয়শীলার। নির্বানীতোষ আজ পৌনে পাঁচটায় ফ্লাই করছে। গত তিনদিন থেকেই তোড়জোড় শুরু করেছে সে। গোটা তিনেক স্যুট, টাই, হোলড্-অল-ও কিনেছে একটা নতুন। আর স্তব্ধ স্থিরচোখে চেয়ে-চেয়ে দেখেছে জয়শীলা ওর ব্যস্তবাগীশ রূপটা। আজ আর চেম্বারে যায়নি। সকালে বলে রেখেছিল জয়শীলাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে। সী-অফ করতে যদি চায় দমদমেও যেতে পারে। জয়শীলা মৌন মাথা নেড়েছিল। সাড়ে চারটে উৎরে গেছে ঘড়িতে। সেই কথাটাই ভাবছিল জয়শীলা ঃ আজ পৌনে পাঁচটায় ফ্লাই করছে নির্বানীতোষ। ধীর পায়ে বেরিয়ে এল করিডোরে। এ্যাসেম্বিলি হাউসের মাথায় পত্‌পত্‌ করে উড়ছে ফ্ল্যাগটা, ওধারে টাউন হল, হাইকোর্ট। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল জয়শীলা। ভালো লাগছে না। আবার ফিরে এল সেকশনে। আবার এ্যাকাউণ্টস্ পোস্টিং। রজত কানের কাছে কি বলছে, কানে গেল না জয়শীলার। অন্যমনস্কে হাসল শুধু। কাজের তাড়া কমে এসেছে সেকশনের আসন্ন ছুটির প্রস্তুতিতে। আরো কিছুক্ষণ চেয়ারে স্থির হয়ে বসে রইল জয়শীলা। দু'একটা কাগজ ওলটাল। তারপর নিজের শরীরের মধ্যেই কেমন এক অস্থিরতা। ব্যাগটা কাঁধে ফেলে অবশেষে উঠেই দাঁড়াল সে। সুপারিনটেনডেণ্ট হাসলেন ঃ 'কাজ আছে বুঝি? আচ্ছা।' পৌনে পাঁচটা বাজতে সাত মিনিট। করিডোরে এসে দাঁড়াল জয়শীলা। হঠাৎ সারা মনটা কেমন খাবি খেয়ে উঠল ওর। যদি ছুটিই নিল, আরো আগে নিল না কেন সে! এখন মনোরথগতি ট্যাক্সি ছাড়া পৌনে পাঁচটার আগে কিছুতেই দমদমে পৌঁছতে পারবে না জয়শীলা। ঘড়ির দিকে, টিফিনের পর থেকেই, সারাক্ষণ মনোযোগ পড়ে ছিল তার। তিনটের পরে বেরোতে পারলেও হত। তিনটে থেকে সাড়ে চারটে শুধু বসে-বসেই কাটাল সে। তবে কি সত্যিই তার যাবার ইচ্ছে ছিল না। ফালতু সী-অফকে খুব দাম দেয়নি সে। কি হবে গিয়ে! রুমাল উড়বে, যতক্ষণ প্লেনের কাচে মুখ রেখে দেখা যায় রুমাল নাড়বে নির্বানীতোষ, আর নিচে থেকে হাত নাড়বে জয়শীলা। কেমন বোকা-বোকা ব্যাপার। তারচেয়ে ভালোই হয়েছে না গিয়ে। অনর্থক সেন্টিমেণ্টকে প্রশ্রয় না-দিয়ে! কিন্তু···

না আর ভাববে না জয়শীলা। এইমাত্র ঘড়ির কাঁটা পৌনে পাঁচটার সংকেত জানালো। কি করবে জয়শীলা এখন। বাড়ি যাবে? না। খোকার কথা একবার মনে পড়ল। না, তবু এখন বাড়ি ফিরতে পারবে না জয়শীলা। তার জীবন থেকে পৌনে পাঁচটা বিদায় নিয়েছে। আজকের এই সন্ধ্যা

জয়শীলার নিজস্ব—ইচ্ছামতো খরচ করবে তাকে, পাঁচটা—ছটা—সাতটা—যতক্ষণ খুশি। ফিরল জয়শীলা।

'সুশীলাদি—'

'কি রে?'

'চলো—বাড়ি ফিরবে না?'

'চল।'

রাস্তায় নেমে জয়শীলা বললে, 'চলো। তোমাদের ওখানে যাব আজ।'

'হঠাৎ?'

'কেন? বারণ করছ?'

'কী যে বলিস। বারণ করব কেন।' সুশীলা হাসল। 'তোর আবার ছেলের ওপর যা টান, আটকাতে সাহস পাইনে।'

'ছেলে বলে কি আমি কেনা বাঁদী! আজ আমার ছুটি। কতদিন এমন ছুটি পাইনি।' ট্র্যামে উঠতে-উঠতে হাই তুলল জয়শীলা।

রাস্তার দুধারে আলো ছিটকে পড়ছে। হাওয়ায় ক্লান্তি জুড়িয়ে আসছে জয়শীলার। দক্ষিণমুখী ট্র্যাম ছুটেছে উর্ধ্বশ্বাসে। জয়শীলা চুপ করে আছে। অসম্ভব মৌন বেষ্টন করে ধরেছে তাকে। দু'একটা কথা বলে সাড়া না-পেয়ে সুশীলাও চুপ করে গেল।

সুশীলার তক্তপোশে গা এলিয়ে দিয়েও অনেকক্ষণ বোবা হয়ে রইল জয়শীলা। সুশীলা বাথরুম থেকে মুখ হাত ধুয়ে চায়ের ব্যবস্থা করে যখন ফিরল তখনও শুয়ে-শুয়ে কড়িকাঠ গুনছে জয়শীলা। সুশীলার মনে হল: আড্ডার চেয়েও আজ বোধহয় সময় কাটানোরই বেশি দরকার ওর। আজ আর ওর কোনো সাথিত্বের প্রয়োজন নেই, নিজেকে নিয়ে তন্ময় হয়ে থাকতে খুব খারাপ লাগবে না ওর। কিছু খুচরো কাজ সারল সুশীলা, ভাইবোনদের খোঁজ-খবর, মার শরীর, ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল কিনা ভাইটি, কি বলেছে ডাক্তার, নাকি ওষুধ পালটেছে। বারো মাসে তেরো উপোস করে-করে, মা, তোমার এই অবস্থা। শুধু তোমার ঠাকুরের জোরে কি বেঁচে থাকা যায়। ধর্মের কথা আর শুনিও না। ধর্মই বলছে: শরীরমাদ্যম্। মানে বুঝলে? দাদা এসেছিল! হঠাৎ? বৌদির ছেলে হবে! খবরটা কি খুবই জরুরি। না-না, হাসপাতাল থেকে আর এখানে আসার দরকার নেই। দেখা-শোনার লোক কোথায়! মা তো অসুস্থ। অত ঝামেলা সইবে না।

চা নিয়ে ঘরে এল সুশীলা।

'এই মেয়ে—চা—'

জয়শীলা নড়ে বসল। 'বাবা! আমাকে একলা ফেলে কোথায় ডুব মেরেছিলে এতক্ষণ!'

'খুব যে বিরহ-যন্ত্রণা হয়েছে, মুখ দেখে মনে হয় না!'

জয়শীলা বললে, 'ভাবছিলাম…'

'কি ভাবছিলি?'

'ভাবনার কি আর শেষ আছে সুশীলাদি। আচ্ছা বলো তো সুশীলাদি, আমার কেন কান্না আসছে না?'

'কী ব্যাপার বল্ তো?' সুশীলার সন্দেহের গলা।

'ব্যাপার আর কি। পৌনে পাঁচটায় নির্বান বার্মা চলে গেল। অবাক হয়ে দেখছ কি! চাকরি করতে কি কেউ বিদেশে যায় না? পাঁচ বছরের তো কণ্ট্রাক্ট সার্ভিস। দেখতে-দেখতে কেটে যাবে।'

'কই, বলিসনি তো সেকথা!'

'বলিনি তোমাকে সারপ্রাইস দেবো বলে।' জয়শীলা হাসিতে মুখ রক্তবর্ণ করে ফেলল। 'যাকগে। কিছুদিন ছুটি। ভাবছি এবার এম. এ. পরীক্ষাটা দিয়ে ফেলব।'

জয়শীলার কথাগুলি অত্যন্ত অগভীর, অসার ঠেকল সুশীলার কাছে।

আরো অনেক বকবক করে গেল জয়শীলা। এতক্ষণকার নীরবতার সে য ন সুদেমূলে শোধ তুলে নিচ্ছে। বর্তমানকে ভুলতে চেষ্টা করে অসম্ভব অর্থহীন ভবিষ্যতের একটা কাল্পনিক ছাঁচ গড়ে তুলতে চাচ্ছে জয়শীলা। স্বরগ্রামের সমঞ্জসে যদি কানের পরদা বাঁধা থাকত জয়শীলার তাহলে বুঝতে পারত তার স্বরভঙ্গ বেসুরোগলা শ্রোতাদের কানে কেমন বিরক্তির গরম শীসে ঢেলে দিচ্ছে।

সুশীলাই ঠেলে জাগিয়ে দিল ওকে। 'বাড়ি যাবি না?'

'কটা বাজল?'

'আটটা—'

উঠবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না জয়শীলার। আরো কিছুক্ষণ আকাশ-পাতাল বকে গেল সে। শুকনো ঝরাপাতার মতো ওজনহীন কথাগুলো হাওয়ায় ভাসল, উড়ল, তারপর হারিয়ে গেল অন্তহীন উদ্দেশ্যহীনতায়।

ক্লান্ত দেহে যখন বাড়িতে পৌছলো, তখন নটা বেজে গেছে।

দরজা খুলে দিলেন সুহাসিনী। 'আজকাল কি তোমাদের রাত্রেও কাজ হয় বৌমা?'

হাসল জয়শীলা। পা টেনে-টেনে এগিয়ে গেল ঘরের দিকে। আলো জ্বলল। হঠাৎ আলোর উদ্ভাসে সমস্ত ঘরটা কেমন কান্নার মতো মনে হল জয়শীলার। রোজকার দেখা রাত্রির ঘরটা যেন বদলেছে। নীরক্ত বিবর্ণ নিরবয়ব শূন্যতায় দুলে উঠল হৃদয়। পৌনে পাঁচটা! তার জীবন থেকে পৌনে পাঁচটা বিদায় নিয়েছে। কিন্তু এখন নটার পরেও পৌনে পাঁচটার কথাই কেন মনে পড়ছে জয়শীলার। ঘড়ির কাঁটাকে পিছনে হাঁটিয়ে সময়কে তুমি ফেরাতে পারো! ব্যাগটা কাঁধ থেকে খশিয়ে আলনার গায়ে ঝুলিয়ে রাখল জয়শীলা। আপিসের জামাকাপড় ছাড়তেও যেন ভুলে গেল সে। জানালার গরাদ ধরে আকাশের দিকে স্তম্ভিত প্রতিমূর্তির মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

'নির্বান পৌনে চারটে পর্যন্ত বাড়িতে অপেক্ষা করেছিল তোমার জন্যে—' সুহাসিনী কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। 'ছুটি পেলে না বুঝি। বলেছে: পৌঁছেই টেলিগ্রাম করবে…'

জয়শীলা যেন নতুন করে আকাশ দেখছে। প্রাণপণে আঁকড়ে ধরল জানালার গরাদগুলি।

খোকাকে নিজের ঘর থেকে এনে জয়শীলার বিছানায় শুইয়ে দিলেন সুহাসিনী। 'নাও। রাত হল। খাবার বাড়ছি। জামাকাপড় ছেড়ে এস।'

সারা রাত ভাবনার খাতা খুলে বসল জয়শীলা। কোথাও অপটু কাঁচা হাতের আঁকিবুকি পাখির মতো, কালি ধেবড়েছে, লেখা পড়া যায়না। আবার কোথাও পাকা হাতের মুন্সিয়ানা, রঙ চড়েছে লেখায়। স্পষ্ট প্রখর উজ্জ্বল। কোথাও স্মৃতি দ্রীপ্র, কোথাও নিষ্প্রভ। কিন্তু, কত আর উল্টোবে একই খাতার পাতা। কতোবার কতোরকমে পড়া হয়ে গেছে লেখাগুলি। এক-ঘেয়ে, একটানা।

ঘুমের ঘোরে খোকা ককিয়ে উঠল। স্বপ্ন দেখেছে বুঝি। পাশ ফিরিয়ে পিঠ চাপড়ে দিল জয়শীলা।

দিন কাটল।

নির্বানীতোষের অভাববোধটুকুও একদিন রক্তে সয়ে এল জয়শীলার। বাড়িতে খোকাকে কেন্দ্র করে একই বৃত্তে ঘুরতে লাগল তার সাধ, ইচ্ছা। নির্বানীতোষ চলে গিয়ে সংসারের দায়িত্বের বোঝা বাড়িয়ে দিয়েছে জয়শীলার

কাঁধে। বাড়ির সময়গুলি ঠাসবুনোন। আপিসে আরো দশজনের মধ্যে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজে পাবার চেষ্টা করে।

অনেক কথার ফাঁকে রজতই সেদিন জিগ্যেস করল: 'কই, মিস্টার চ্যাটার্জি বার্মা গেছেন, বলেননি তো এতদিন।'

জয়শীলা হাসল। 'খবরটা কি আপনার পক্ষে খুব জরুরি। কেন, সঙ্গে যেতেন নাকি?'

রজত বললে, 'আপনারা মেয়েরা এক-একটি শামুক-প্রকৃতি। কবির ভাষায় রত্নগর্ভাও বলা যেতে পারে।'

'হ্যাঁ। শুধু রত্নই নয়, হাঙরও আছে।' জয়শীলা হাসল।

আরো দিন কেটেছে। মাস কেটেছে। টেলিগ্রাম প্রোমে পৌঁছেই করেছে নির্বান: 'রিচড্ সেফলি।' এয়ার মেলে চিঠিও এসেছে জয়শীলার নামে। কাজের মানুষের ব্যস্ত তাড়ায় লেখা চিঠি। খোকার শারীরিক বার্তা, জয়শীলার কুশল-জিজ্ঞাসা। মনিঅর্ডারও সময় মতো এসেছে সুহাসিনীর নামে। তারপর আর চিঠি না, শুধু মনিঅর্ডারই। অনেক রাত অনেকদিন ক্ষয় হয়ে গেছে।

সেদিন আয়নার সামনে গালে পাউডার ঘসতে-ঘসতে হঠাৎ মনে হল জয়শীলার: তার কপালে সূক্ষ্মচুলের মতো কয়েকটা ভাঁজ পড়েছে। ওই ভাঁজগুলি হয়তো আগেও ছিল কিন্তু এমন করে আয়নার কাচে প্রতিফলিত হয়নি আগে। ওই ভাঁজগুলি বয়েসের, অভিজ্ঞতার। আধুনিক মানুষের বয়েস লেখা আছে তার অভিজ্ঞতায়। পৃথিবীতে যেদিন কোনো মানুষই বেঁচে থাকবে না সেদিন আর কিছু না থাক, থাকবে তার অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর।

আপিসে সেদিন সুপারিনটেনডেণ্ট আসেন নি।

কাজ করতে-করতে অনেকক্ষণ উশখুশ করছিল রজত। একসময় থাকতে না-পেরে ফিসফিস করে বললে, 'মিসেস চ্যাটার্জি—'

জয়শীলা কলম তুলে হেসে জিগ্যেস করল: 'কাজে মন নেই দেখছি। ব্যাপার কি? কি বলছেন?'

'চলুন না আপিস-পালাই?'

'হঠাৎ? এ ধরণের অভ্যেস তো আপনার ছিল না রজতবাবু।'

'অভ্যেস কি সব সময় এক থাকে। পালটাতেও তো পারে!'

'আপনার এই মহৎ কাজে আমাকে সাথি হতে হবে কেন?' জয়শীলা ভুরুর ঢেউ তুলল।

'মেট্রোতে একটা ভালো ছবি হচ্ছে। ফ্রেগুলি পারস্যুয়েশন। চলুন না দেখে আসি।'

'এতক্ষণে বুঝলাম।' জয়শীলা গম্ভীর হবার ভান করে বললে, 'তা আপনি কি করে ধরে নিলেন আমি আপনার সঙ্গে সিনেমায় যাব।'

'ধরে না নিলে প্রস্তাব করবার সাহস পাব কোথায়, বলুন।'

জয়শীলা দাঁত দিয়ে কলমের মাথাটা চিবোতে-চিবোতে বললে, 'আপনার প্রস্তাবে রাজি হতে পারি এক শর্তে। সিনেমা দেখাব আমি।'

'না না—তা হয়না—'

'তাহলে আর হল না।'

রজত একটু থেমে মাথা চুলকে বললে, 'আচ্ছা। ঠিক আছে। তাই হবে চলুন।'

বেরিয়ে পড়ল দুজনে।

খুব যে ছবি দেখবার ইচ্ছে ছিল জয়শীলার তা নয়। তবে মন-মেজাজ এমনিতেই বিচ্ছিরি হয়েছিল, বাড়িতে আপিস আসবার মুখে কথা কাটাকাটি হয়েছে সুহাসিনীর সঙ্গে। কেন চিঠি দেয় না নির্বানীতোষ—তার জবাবদিহি নাকি জয়শীলাকেই করতে হবে। চুপ করে থাকতে পারেনি সে, বেরোতে-বেরোতে জবাব দিয়ে এসেছে: 'আপনার ছেলেকে আপনিই বেশি বোঝেন। জবাব যদি চাইতে হয় তার কাছেই চান।' রাস্তায় আসতে-আসতে জয়শীলার সেই কথাটাই মনে পড়ল। এমন যে হবে, সে যেন জানতই। সুহাসিনী যে ক্রমশ নিষ্ঠুর হবেন সেটুকু দূরদৃষ্টি ছিল জয়শীলার। বাড়ির জগতটায় যত আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধন পড়ছে, বাইরের জগতে ততই অবাধ খেলা-মেলা হবার প্রয়াস জয়শীলার।

সিনেমা-হলে পাশাপাশি চেয়ারে বসতে-বসতে রজত বললে, 'এত কি ভাবেন বলুন তো। মুখখানাকে গির্জের মতো করে রাখলেই দার্শনিক হওয়া যায় না, বুঝলেন। পৃথিবীতে হিসাব নিয়ে দেখুন না: কটা মানুষ সুখে আছে।'

'আমি অ-সুখে আছি তাই বা ভাবলেন কি করে রজতবাবু। তাহলে কি কি আর আপনার সঙ্গে সিনেমায় আসতাম।'

'চালাকি রাখুন। ঢের ঢের দেখেছি আপনাদের। আপনারা সব এক-একটি···'

'থাক। ওতেই যথেষ্ট হবে রজতবাবু।'

'এই যে দেখুন না আমাকে। কোনোদিন মুখ গোমড়া করতে দেখেছেন।

তাছাড়া শুধু ভাবনা দিয়ে যখন এ-সংসারের কিছুই দূর হচ্ছে না, তখন চিন্তা-ব্যাধিতে জর্জর হব কেন।'

'আপনার অসুখটাই বা কি। স্ত্রী ছেলেমেয়ে। গোটা একটা সংসারের একচ্ছত্র নায়ক আপনি!' জয়শীলা হাসল।

'স্ত্রী আর ছেলেমেয়েই কি সুখের মাপকাঠি, জয়শীলা। মনে কিছু করবেন না: আপনার নাম ধরে ডেকে ফেললাম। আসল ব্যাপারটা কি জানেন: সুখের স্বরূপই আমরা চিনিনা। এই সর্বগ্রাসী মনটা কি যে চায় আর কি যে চায় না। জানেন মিসেস চ্যাটার্জি, আমাদের মনের চাওয়ার রূপটা যদি ফোটোগ্রাফিতে ধরা যেত তাহলে সংসারটা অরণ্যভূমি হয়ে পড়ত।'

ছবি শুরু হল।

সিল্কের মতো পাতলা অন্ধকার, ছোঁয়া যায়, ঘ্রাণ নেওয়া যায়। সমগ্র চেতনার পর এই অন্ধকার যেন পেলব মসৃণতা। মাথাটা চেয়ারের গায়ে হেলিয়ে দিল জয়শীলা। রঙের জগতে তার মন উড়ে গেছে। চোখকে ছবি-দেখার কাজে লাগিয়েও মুখকে অবকাশ দেয়না রজত। ফিশফিশ আলাপন আর চাপা হাসি। আসলে ছবি দেখাটা উপলক্ষ্য, ছবিকে সহকারী রেখে মানসিকতাকে চালু রাখা। আর জয়শীলার মুহ্যমান চেতনায় ওর কথার বৃষ্টি ভালো লাগছিল।

'আপনার কী মনে হয় জীবনের এত শান্তরূপ সম্ভব?' জয়শীলা ছবির উপর চোখ রেখে জিগ্যেস করল।

রজত বললে, 'আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে ক্ষতি কি। বুদ্ধদেব থেকে গান্ধিজী পর্যন্ত এই মতেরই অনুগামী। অস্ত্র দিয়ে কি অস্ত্রকে চিরকালের মত রোখা যায়।'

জয়শীলা হাসল। 'কিন্তু এপেনডিসাইটিস হলে গঙ্গামাটি লেপে রোগ সারাবেন।'

রজত হাসল। আপনারা মেয়েরা বড্ড...'

জয়শীলা বললে, 'কথায়-কথায় মেয়েদের জাত তুলে কথা বলা আপনাদের মতো পুরুষদের এক ধরণের রোগ।' কথায় রাগ ছিল জয়শীলার, বিরক্তিও। 'কজন মেয়ে আপনি দেখেছেন রজতবাবু?'

'আপনি রাগ করছেন তাহলে আর কথা হয় না।'

সিনেমা থেকে বেরিয়ে রজত বললে, 'আপনাকে কিন্তু এখনিই ছাড়ছিনে।'

'মানে?'

'টিকিট কেটে জব্দ করেছেন আমাকে। এবার জব্দের পালা আপনার। চলুন—একটু চা খাব।'

'না। আজ আর নয় রজতবাবু। সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে।'

'চুলোয় যাক। চলুন—এই কাফে ডি মনিকোয় ঢুকে পড়ি।'

ক্যাবিনে মুখোমুখি বসে মেনুকার্ডের উপর চোখ বুলোতে-বুলোতে রজত জিগ্যেস করল: 'কি খাবেন? ড্রাই? মাটন কাটলেট আর চার পিস্ টোস্ট। চা পরে।'

রজত সিগারেট ধরিয়ে হেসে বললে, 'কেমন লাগল?'

'কি?'

'আজকের সন্ধ্যাটা—'

'মন্দ কি?' জয়শীলা হাসল।

'হিসেবের সময় থেকে কিছু সময় চুরি করে নিয়ে খরচ করতে, আর যাই বলুন, থ্রিল আছে!'

'হ্যাঁ চুরি-করার থ্রিল!'

'গৃহস্থ সজাগ থাকলে চুরির ভয় নেই—'

'মানে?'

'সব কথার মানে খুঁজতে গেলে কথা বলার আনন্দ থাকে না!'

'যে কথার মানে নেই সে কথা বলেন কেন!'

'কথা-বলার ওই তো দোষ···'

বয় খাবার নিয়ে পৌঁছল।

রেস্টুরেণ্ট থেকে যখন বেরুল দুজনে, সাতটা বেজে গেছে। নির্বানীতোষ চলে যাওয়ার দিন ছাড়া এত দেরি করে আর কোনোদিন বাড়ি ফেরেনি জয়শীলা। আর এক মুহূর্ত দেরি করল না। রাস্তা পার হয়ে ট্র্যাম ধরল সে।

'কে বউমা?' দরজা খুললেন সুহাসিনী।

'কি, অমন অবাক হয়ে চেয়ে আছেন আমার দিকে?' জয়শীলা হাসল। 'আমাকে চিনতে পারছেন না?'

'দেখছি তোমাকে।' সুহাসিনী গম্ভীর গলায় বললেন।

'দেখুন। খোকা ঘুমিয়েছে?' জয়শীলা ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

'কচি ছেলের মা, এত দেরি করে ফেরা কি ভালো বাছা?'

'আপনি তো আছেন।'

'আমি তো আর ওর মা হতে পারিনে বাছা।' সুহাসিনী মুখ গোঁজ করে বললেন।

'দেরি হয়ে গেল, কী করব মা।'

'দেরি করলে আর দেরি হবে না বাছা। আগের মতো কি আর হই হই করা তোমার পোষায় বউমা।'

'হই হই!' ব্যাগটা আলনায় ঝুলিয়ে ফিরে দাঁড়াল জয়শীলা। 'আপনার কি ধারণা আপিসটা হই হই করার জায়গা।'

'কি জানি বাছা, আপিসে তো আর যাইনি।' লম্বা পা ফেলে চলে গেলেন সুহাসিনী।

একটা ভোঁতা যন্ত্রণায় সারা শরীর কুঁকড়ে এল জয়শীলার। রাগতে গিয়ে বোবা হয়ে গেল সে। তার জীবনযাত্রার পরে সুহাসিনীর এই বাঁকা কটাক্ষ তাকে স্তম্ভিত করে দেয়। নির্বানীতোষের অভাব আজ এই নির্জন রাত্রে বেশি করে বোধ করতে পারছে জয়শীলা। নির্বানীতোষের অস্তিত্বটা এতদিন ছিল সুদৃঢ় বাঁধের মতো, বাইরের বেনোজল থেকে আত্মরক্ষা করার প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু আজ সে-বাঁধ ভেঙে গেছে, উদ্দাম বেনোজলের তোড় তার অস্তিত্বটুকুও কুটোর মতো ভাসিয়ে নেবে বুঝি। সুহাসিনী যে তার দেরি করে ফেরার জন্যে কোনোদিন কৈফিয়ত তলব করতে পারেন, কল্পনা করেনি সে।

ঘুমের ঘোরে শিবতোষ বিড়বিড় করে উঠল। খাট থেকে একটা হাত ঝুলে পড়েছে ওর। নির্বানীতোষ চলে যাবার পর থেকে শিবতোষের পাকাপাকি রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা হয়েছে তার ঘরে। একটা নিশ্বাস ফেলে জয়শীলা শিবতোষের ঝোলা হাতটা খাটের পরে তুলে দিয়ে পাশ-বালিশের আড় করে দিল। ওর চুলে হাত বুলোতে-বুলোতে ব্যথায় খচ করে উঠল বুকের ভেতরটা। নির্বান যাবার পর থেকে শিবতোষকে তেমন করে দেখাশোনা করতে পারে না সে। নিজের ভাবনার বৃত্তে এমন ভাবে জড়িয়ে গিয়েছে, সংসারের আরো দশজনের উপর তার যে দায়িত্ব, পালন করতে পারেনি সুষ্ঠুভাবে। সকালে উঠে শিবতোষকে নিয়ে পড়তে বসতে হবে। নিজের ভবিষ্যতের চাকাটা আটকে গেছে বলেই অপরের ভবিষ্যতকে অবহেলা করবার কোনো অর্থ নেই।

'বৌদি, আমাকে একটা মেকানো কিনে দেবে?' ভোরবেলায় ঘুম ভাঙতেই জয়শীলার গলা জড়িয়ে ধরল শিবতোষ।

'মেকানো কি করবি?' জয়শীলা হেসে বললে।

'আমি এঞ্জিনিয়ার হব। সন্তুর বাবা ওকে একটা মেকানো কিনে দিয়েছে। বলেছেঃ বড় হলে সন্তু মস্ত এঞ্জিনিয়ার হবে। বাড়ি তৈরি করে, বাগান তৈরি করে সন্তু, জানো বৌদি এরোপ্লেন তৈরি করতে আজো পারে না…'

'এরোপ্লেন তৈরি করে কি করবি?'

'তোমাকে দাদার কাছে নিয়ে যাব।'

'বাহাদুর ছেলে! তাহলে তো মেকানো কিনে দিতেই হয়।'

'আজই দেবে, বৌদি।'

'দেবো। এখন ওঠো। মুখ হাত ধুয়ে নেবে। কতদূর পড়াশোনা শিখেছ দেখব—'

আবার দু' একদিন আপিস থেকে সময় মতো ফেরে জয়শীলা। শিবতোষকে নিয়ে পড়তে বসে। বাকি সময় খোকার পরিচর্যায় ব্যয় হয়। সুহাসিনীর মনে যে অসন্তোষ ধূমিয়ে উঠেছিল জয়শীলার স্বাভাবিক ব্যবহারে তাও মিইয়ে এল। একদিন স্নেহলতাও এসেছিলেন, ছেলেকে নিয়ে আদর করলেন, জয়শীলাকে উপযুক্ত উপদেশ দিলেন। কিন্তু…তবু ভেতরে-ভেতরে ছটফট করে জয়শীলা। বাড়ির চার দেয়ালে চাপা পড়া মনটা তার খাবি খেতে থাকে। মনে হয় সব কিছু ছলনা, মনকে চোখের ইশারায় ভুলিয়ে রাখা। সংসার-কারখানার আসল ইস্ক্রুই ঢিলে, সংসারী হবার মিথ্যা সাধনা ঠাট্টার মতো লাগে। আর সবচেয়ে বিশ্রী লাগে যখন ওরা সহানুভূতির ছদ্মবেশে অনুকম্পা জানাতে আসে। আপিসের বন্ধুদের মধ্যে সুশীলাই ঘনঘন হাজির হয়। রজত বিকাশও আসে। ইচ্ছা থাকলে নিজেকেও সরিয়ে রাখতে পারেনা জয়শীলা। ওরা ভালোবাসে, স্নেহ করে—মন দিয়ে মন স্পর্শ করে। তার জীবনের মেঘলা স্যাঁতসেতে বর্ষায় ওদের উপস্থিতি রামধনুর রঙ।

রজত এমনই মানুষ যে সব সময় তার অস্তিত্বকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবে সে। আপিসে নিজের ব্যক্তিগত চিন্তারও অবকাশ পায় না জয়শীলা। উগ্র রোদের মতো তার আবির্ভাবে জয়শীলার মনের ভাবনার ছায়াগুলো পর্যন্ত পিটটান দেয়। এক-এক সময় রজতকে বিরক্তিকর লাগে। কিন্তু রজতকে প্রশ্রয় দিতে হয় না, ওর মনোভাব জবরদখল কলোনির উদ্বাস্তুদের মতো। কথার উৎস ফুরিয়ে গেলেও, উৎসাহকে বাঁচিয়ে রাখতে অন্ধ স্তাবকতা করে রজত। আপিস থেকে বেরোতে রজত, চায়ের কাপে রজত, ট্র্যামে-কি-বাসে রজত দাঁড়িয়ে তার সিটের সামনে। আর আকাশধর্মী

মেয়েদের মনোজগতটা এমনি যে বেশি দিন শূন্য থাকতে পারেনা। রজতকে আশ্রয় করতে-করতে কখন যে তার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল জয়শীলা, বুঝতেও পারল না। দরকারে অ-দরকারে, সাংসারিক অনেক জল্পনা-কল্পনাতেও রজতের পরামর্শ গ্রহণ আবশ্যিক হয়ে পড়ল।

ম্যুন্সিপাল মার্কেট থেকে খোকনের জন্যে কয়েকটা ফ্রক কিনে বেরুল জয়শীলা রজতের সঙ্গে। সন্ধ্যার হাওয়া লুটোপুটি খাচ্ছে রাজধানীর আকাশে।

রজত হেসে বললে, 'মেয়েদের সঙ্গে মার্কেটিঙ করার চেয়ে সকালে উঠে এক ডজন বুকডন করা সহজ।'

জয়শীলা বললে, 'কি ক্ষতিপূরণ দিতে হবে শুনি?'

'বিশেষ কিছু নয়। এক কাপ চা।'

'তবে চলুন। হিন্দুস্থান-এ যাই—'

আকাশে এতক্ষণ কালো মেঘের সঞ্চয় শুরু হয়েছিল। ঠাণ্ডা হাওয়ায় বৃষ্টির খবর।

জয়শীলার দিকে চোখ ফিরিয়ে রজত বললে, 'আপনাকে কিন্তু বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে। শরীর কি ভালো নেই জয়শীলা?'

জয়শীলা বিনুনিটা পিঠের দিকে সরিয়ে বললে, 'আমাকে ক্লান্ত দেখতে বোধহয় আপনার খুব ভালো লাগে। কিন্তু বিশেষ সুবিধে হবে না রজত, ক্লান্ত হলেও আমি জাগ্রত আছি।'

রজত হেসে বললে, 'আপনাদের মতো বুদ্ধিশীলা মেয়েদের জন্যেই সৃষ্টি এখনো রসাতলে যায়নি।'

'আপনার স্ত্রীর অসুখ হয়েছিল, কেমন আছেন এখন?'

'ভালোই। অসুখ ওকে কাবু করতে পারে না।'

'সেইটেই আপনার ভরসা।' জয়শীলা হাসল।

সিগারেট ধরাল রজত। চায়ের কাপে ধোঁয়া উড়ছে।

হঠাৎ মুখ তুলে রজত জিগ্যেস করল: 'আচ্ছা জয়শীলা, টেনিসনের এনোক আরডেন কবিতাটি আপনি পড়েছেন?'

'হঠাৎ আপনাকে কবিতায় পেল কেন, বলুন তো।'

'জানিনা। আপনার কি মনে হয়, পৃথিবীতে একজন লোকের স্থান আর একজন নিতে পারে?'

জয়শীলা কিছুক্ষণ অবাক চোখে চেয়ে রইল রজতের দিকে। তারপর কি ভেবে বললে, 'এসব তত্ত্বকথা নাইবা আমাকে জিগ্যেস করলেন।'

'জীবনের সারাংশ কেন্দ্রীভূত হয়েই তো তত্ত্ব হয়। আপনার কি মনে হয়ঃ আপনার জীবনে এই তত্ত্বের অনুসন্ধান ঘটেনি।'

জয়শীলা বললে, 'জীবন যাদের থেমে গেছে তত্ত্ব-বাখ্যায় তাদেরই মাথা-ব্যথা বেশি। তত্ত্ব নিয়ে আমার কি হবে রজত।'

'আমার প্রশ্নের জবাব পেলাম না জয়শীলা।'

'জবাবটা খুবই জরুরি? আমার তো মনে হয় সংসারটা এইভাবেই চলছেঃ ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছেয় হোক—একজনকে পথ ছেড়ে দিতে হচ্ছে, পথ করে দিতে হচ্ছে।'

রজত সিগারেটের টুকরো এ্যাশট্রেতে নিক্ষেপ করে বললে, 'আমাদের জীবনের ট্রাজিডিই এইখানে। আমরা জীবনের গতিবাদে বিশ্বাসী নই। ঘড়ির কাঁটায় আঙুল চেপে রেখে আমরা সময়কে স্তব্ধ করতে চাই, শুধু সময় কেন জীবনের স্বাভাবিক গতিবেগকে অস্বীকার করতে গিয়ে অস্বাভাবিক অবৈজ্ঞানিক স্থিতিবাদকে আঁকড়ে ধরেছি। সময় এগোচ্ছে, অভিজ্ঞতা, বয়েস সবকিছু বাড়ছে, কেবল পরিবর্তিত হবে না মনের জগতটা—এর মতো হাস্যকর চিন্তা আর কিছু নেই।'

জয়শীলা বললে, 'আপনার বক্তৃতা এবার থামাতে হয়। রাত্তির হচ্ছে। চলুন উঠি।'

করিডোরের মাঝখানে আপিসে সেদিন জয়শীলাকে আটকাল নির্ঝরিণী।

'শোনো—কী ব্যাপার আজকাল তোমার যে দেখাই পাওয়া যায়না…'

'দেখা করা না-করা তো উভয়পক্ষের ব্যাপার।'

নির্ঝরিণী এক পাশে টেনে নিল তাকে। 'শোন্। চোখের মাথা না হয় খেয়েছিস, কানের পরদাও কি নেই তোর?'

'কেন? কী হয়েছে?'

'কিছুই জানিসনে, না? আপিসে যে কানাকানি পড়ে গেছে। কী লাগিয়েছিস তোরা!'

এবার গম্ভীর হল জয়শীলা। 'মানে? কী বলতে চাও?'

'রজতের সঙ্গে এত মাখামাখির কি মানে? জানিস ও বিবাহিত।'

'তাতে কি হয়েছে। বিবাহিত তো আমিও।'

'তোর ভালোমন্দ তুই বুঝবি। তবে তোকে সাবধান করে দিচ্ছি এর ফল ভালো হবে না।' নির্ঝরিণী খুরতোলা জুতোর আওয়াজ তুলে উধাও হল।

থ হয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল জয়শীলা। নির্ঝরিণী হুড়মুড় করে কি বলে গেল, কি তার মানে কিছুই যেন বোধগম্য হলনা তার। আপিসে কানাকানি শুরু হয়েছে—রজত আর তার মেলা-মেশা নিয়ে। কিন্তু এ তো তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। তা নিয়ে আপিসী মানুষগুলির অন্যায় মাথাব্যথা কেন। আর লুকিয়ে-লুকিয়ে তো আর মেশে না রজতের সঙ্গে—তার সিনেমায় যাওয়া কি রেস্টুরেন্টে খাওয়া কি মার্কেটে যাওয়া—সে তো সবাই জানে। পাশাপাশি টেবিলে কাজ করলে ঘনিষ্ঠতা স্বাভাবিক। রজত না হয়ে যে কেউ হলে তাই হত।

টিফিনের সময় সুশীলাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এল জয়শীলা হাইকোর্টের সামনে কৃষ্ণচূড়ার ছায়া-ছায়া লন্‌টায়।

'তুমি···তুমি···' আবেগে ফুলে ফুলে উঠছিল জয়শীলার সারা শরীর।

'কি হয়েছে। অমন করছিস কেন রে?'

'তুমিও আমাকে সন্দেহ করো সুশীলাদি।'

'সন্দেহ! কি বলছিস মাথামুণ্ডু!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ তোমরা সবাই এক। নির্বান থাকতেও তো আমি ছেলেদের সঙ্গে মিশতাম, সেদিন তো এত কোলাহল ওঠেনি।'

'ও এই কথা!' সুশীলা হাসল। 'আমি ভাবি কী-না কী। তবে তোর অনুমান ঠিক শীলা। নির্বান এখানে থাকলে হয়তো এত কথা উঠত না। এমনও তো হতে পারে নির্বান নেই বলেই সুযোগ নিচ্ছে রজত।'

'ভুল, ভুল সুশীলাদি। মেয়েরা যদি সুযোগ না-করে দেয় তাহলে কোনো পুরুষই তাদের উপর সুযোগ নিতে পারে না।'

'রজতকে তুই যতখানি চিনিস তার চেয়ে বেশি আমরা দেখেছি ওকে। অন্তত, আমাদের আপিসের মেয়েদের কারুরই ওকে চিনতে বাকি নেই।'

'বেশিদিন দেখেছ বলেই যে বেশি চিনেছ একথা জোর করে' বলা যায় না।'

'আমাদের এতদিনের জ্ঞানটা যদি ভুল হয় তাহলে আমাদের চেয়ে সুখী হবে কে। তবে তুই একটু ভেবে দেখলে পারতিস।'

'ধন্যবাদ। তোমাদের উপদেশ মনে থাকবে।'

আপিস থেকে একলা ফিরল আজ জয়শীলা। যে-ঘটনার মধ্যে ওতপ্রোত-ভাবে মিশিয়ে দিয়েছিল নিজেকে—আকণ্ঠ তার ভেতরে ডুবেছিল বলেই বোধকরি আজ ঘটনা থেকে নিজেকে বিমুক্ত রেখে আদ্যোপান্ত যাচাই করে দেখতে চায় জয়শীলা। রজতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাকে সে স্বাভাবিকভাবেই

গ্রহণ করেছিল, ভাবেনি এর জন্যে দশজনের কাছে কোনোদিন জবাবদিহি করতে হবে। যত আগাগোড়া ঘটনাকে বুঝতে চেষ্টা করে ততই মনের মধ্যে গোলমাল হয়ে যায়। কবে, কি করে রজতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সূত্র গড়ে উঠল আজ তার হদিশ নেওয়া অর্থহীন। প্রথম আলাপ বুঝি অভিনয়ের মাধ্যমে। কিশোর আর নন্দিনীর সংলাপের ফাঁকে-ফাঁকে। আর সেই ফাঁকা-ফাঁকা আলাপকে ভরিয়ে তুলল রজত ওর সেকশনে বদলি হয়ে আসার পর থেকে। নির্বান চলে যাওয়ার পর জয়শীলার মন তখন শূন্য ধুধূ—আর এই শূন্য রুক্ষ দিগন্তে হঠাৎ এক ফালি নীল ছায়া ফেলে তার চোখ জুড়িয়ে দিল রজত। সত্যি বলতে কি, ওর ছায়ায় দু' দণ্ড শান্তির বিশ্রাম খুঁজেছিল জয়শীলা। তারপর আলাপ-পর্ব পুরানো হয়েছে, গভীর হয়েছে। কোনোদিন সিনেমায়, কোনোদিন রেস্টুরেণ্টে রজতের সাহচর্য তার যে খারাপ লেগেছে, এমন মিথ্যা বলবে না সে। আজ এতদিন পরে, রজতের সুযোগ গ্রহণের কথা অবান্তর। কিন্তু, সমস্ত ঘটনাকে যুক্তির আলোকে বিচার করতে গিয়েও স্থানে স্থানে সূত্র খুঁজে পায় না জয়শীলা। রজতের দু' একটা কথার স্পষ্ট অর্থাভাস হয় না। 'গৃহস্থ সজাগ থাকলে—' সিনেমা দেখার পর রেস্টুরেণ্টে বসে বলেছিল রজত ঃ 'চুরির ভয় নেই।' কিংবা এই তো সেদিন—'পৃথিবীতে একজন লোকের স্থান কি আর একজন নিতে পারে!' সে-কথার ইংগিত ধোঁয়াটে লেগেছে জয়শীলার।

কিন্তু তবু, হয়তো অকারণে, তার বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে। যুক্তি দিয়ে ভূতের ভয়কে দূর করা যায়না। আর, আজকাল সবচেয়ে ভয় করে জয়শীলা তার নিজের মনকেই। তার মনের সাম্রাজ্যে যুক্তির চেয়ে আবেগেরই স্থান পাকা। নির্বানীতোষ বার্মায় যাওয়ার প্রায় দু'বছর হল। এই দুই বছরে তিলে তিলে নিজের মনকে ভেঙেছে-গড়েছে, দেবপ্রিয়—নির্বানীতোষ—একদিন দুজনকে ভেবেছিল দুই প্রতিপক্ষ, যেন এপার-ওপার, কিন্তু সবই কল্পনার ইন্দ্রজাল, আজ দুটো নামই যেন এক পারে গলাগলি তালগাছের মতো নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে। আর অন্য পারে নিঃসঙ্গ জয়শীলার হতবাকচৈতন্য। জল পড়ে, পাতা নড়ে। অনেক জল-পড়া, অনেক পাতা-নড়া। দুই পারে একটিমাত্র সেতু ঃ খোকন। কিন্তু, সে-সেতুও অশক্ত, নড়বড়ে। তার জীবনে খোকন মিথ্যা নয়, মিথ্যা শুধু তার সূত্র ধরে জীবনের জাল-বোনা। কর্নেল সমাদ্দারের কথাটা মনে পড়ে যায়। সাইক-লজিকালি মাদার হতে হবে! জয়শীলা যে মা হয়েছে, এ তো মিথ্যা নয়। দশমাস দশদিন গর্ভ যন্ত্রণার সমস্ত প্রক্রিয়া তাকে যে কোনো সৎ মার মতোই

পালন করতে হয়েছে। লেবররুমে সন্তানের মুখ চেয়ে তার এতদিনকার ব্যথা-যন্ত্রণা যে কর্পূরের মতো উবে যেতে পেরেছিল তা শুধু মাতৃত্বলাভের গৌরবেই। ফাঁকি দিয়ে তো আর মাতৃত্ব লাভ করেনি সে। নির্বানীতোষের অবশ্য ধারণা উলটো। আর আজকাল জয়শীলারও মনে হয় মাতৃত্বের পেছনে এত জয়ঢাক, পবিত্র ধুনোর গন্ধ ছড়িয়েছে পুরুষেরাই। মাতৃত্ব অত্যন্ত জৈবিক ব্যাপার, আর এই জৈবিকতার গায়ে আধুনিক সভ্যতা ভদ্রগোছের পলেস্তারা চাপিয়েছে। এ-একটা সংস্কার ছাড়া কিছু নয়। তার দু'বছরের ছেলে কুণালকে যত্ন করবার পেছনে মায়ের অন্ধ স্নেহ জড়ানো আছে কিনা জানেনা জয়শীলা, শুধু এইটুকু বোঝে তাকে ছাড়া কুণালের নির্ভর করবার কেউ নেই। শিবতোষকেও তো সে সমান যত্ন করে। কুণাল অবশ্য তার রক্তের প্লাবনের মধ্যে, নাড়ী ছিঁড়ে হাসপাতালের নার্শের সাহায্যে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। তার শরীরেরই অঙ্গ বলে তার ওপর স্নেহ স্বাভাবিক। ওকে 'মা' বলে ডাকতে কেউ শেখায়নি, হয়তো জন্মের সঙ্গেই এই বোধটুকু সঙ্গে করে পৃথিবীর আলোতে চোখ মেলেছিল সে। আর যে বেশি স্নেহ করে যত্ন করে তাকে মা বলতে শিশু-মনের আপত্তি নেই। শিবতোষের বৌদি ডাক আর কুণালের মা-ডাকের ব্যঞ্জনা একই।

কিন্তু···রজত। এই সামান্য মেলামেশার ব্যাপারটাকে এত ঘোলাটে করে দেখছে কেন আপিসের লোকেরা! রজতেরও তো সংসার আছে, স্ত্রী-পুত্র। নিজে সংসারী বলেই তার স্বভাবে জড়িয়ে রয়েছে ঘরোয়া স্নিগ্ধ আবহাওয়া। ওর কথাগুলি অনুভূতির গভীর রঙে রাঙানো। উত্তাপ আছে, সজীবতা আছে। আর মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারে তো এই উত্তাপই চাই, এনিমিক রিলেশনের চেয়ে তা ঢের ভালো। ওর নিত্যকার ব্যবহারের সচল প্রবাহে কাদা জমতে পারেনা। সুশীলাদিরা ভাবেঃ রজতকে খুব বেশি চেনে। সময়ের দৈর্ঘ দিয়ে পাশের লোকটিকেও চেনা যায়না, সে কথা তারা জানেনা। যে কোনো লোককে বিচার করতে হবে একই সমতলে নেমে এসে। পাহাড়ের চুড়ো থেকে সমতলকে অনেক ধোঁয়াটে, কুহেলিকাময় দেখায়। আর মানুষ দেবতাও নয়, পশুও নয়। রজতের পশুত্ব হয়তো তারা দেখেছে, যা একপেশে, অসম্পূর্ণ, কিন্তু তার দেবত্বের দিকও যে থাকতে বাধ্য—এ কথা তারা ভেবে দেখে না কেন! আসল কথা, রজত আর তার বন্ধুত্বকে তারা ঈর্ষা করে। জয়শীলা মেয়ে বলেই যত ঝামেলা। কোনো মেয়ের সঙ্গে এমন বন্ধুত্ব হলে কারুর কিছু বলবার থাকত না। কিন্তু, সত্যি কি কোনো মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা

যায়—তেমন মেয়ে তো আপিসে চোখে পড়ল না জয়শীলার। হয় শাড়ির গল্প, নয় গয়না, অফিসারের কেচ্ছা, কোন্ কেরানির সঙ্গে কোন্ মেয়ের ঢলাঢলি। বিবাহিতা মেয়েরা আরো এক কাঠি সরেস। যেমন অশ্লীল তেমনি আদিরসাশ্রয়ী। পৌরানিক যুগ থেকে এদের সমস্যার যেন কোনো ইতর বিশেষ হয়নি। তবু, এদের মধ্যে ভালো লাগে সুশীলাদিকে। ওর পুরুষালি দৃঢ় স্বভাব আর ব্যক্তিত্বকে।

আপিসের সমালোচনাকে তীব্রভাবে অস্বীকার করতে গিয়ে জয়শীলা আরো বেশি প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। তার জীবনযাত্রার উপর কোনোদিন কারুর হস্তক্ষেপ সে সহ্য করেনি, যত বাধা এসেছে, জেদে ততই মরিয়া হয়ে উঠেছে সে। একসঙ্গে আপিসে আসা, টিফিনে একসঙ্গে সুইট-হোম্-এ বেরিয়ে যাওয়া, ছুটির পর গল্প করতে-করতে গভর্ণমেণ্ট প্লেসকে ডাইনে রেখে এ্যাসেম্বিলি হাউসের পাশ দিয়ে রঞ্জি স্টেডিয়াম বরাবর স্ট্রাণ্ড-রোডে, ইচ্ছে হলে আউটরাম বুফেতে তু' পেয়ালা চা, অথবা বসেছে তৃণশয্যায় ময়দানে, চিনেবাদামের খোসায় অনেক অবসিত অপরাহ্ন, সোজা হাঁটতে-হাঁটতে কোনোদিন অজন্তায়, কোনোদিন বা কফি হাউসে। বেলুর মঠে কিংবা চন্দননগরের স্ট্রাণ্ডে ছুটির দিনের দূরপাল্লার যাত্রায় আপিসের লোকেদের নিপুণ চোখকে তারা এড়াতে পারেনি। তারই রেশ টেনে আপিসে গুলতানি জমে উঠেছে, কানাকানির আবর্ত ঘুলিয়ে উঠেছে। আর শরীরকে ধারালো তলোয়ারের মতো খাড়া রেখে দৃপ্ত ভঙ্গিতে চলাফেরা করেছে জয়শীলা।

তবু···আঘাত এল অপ্রত্যাশিত ভাবে। সেদিন আপিসে পা দিয়ে সেকশনে বসতে না-বসতে রজত শুনল তাকে এ্যাকাউণ্টস থেকে এস্টাব্লিশমেণ্টে বদলি করা হয়েছে। জয়শীলাও শুনল সে-কথা। শুনে হাসি চাপতে পারল না। রজতের গোমড়া মুখের দিকে চেয়ে বললে, 'ভালোই হল। আমাদের মেলা-মেশাকে যে ওরা সহ্য করতে পারেনি তাতেই আমাদের জিত।' রজত কি- উত্তর দিল, জানা গেল না। জয়শীলার ভালোই লাগছে ব্যাপারটা। যেন মজা পেয়েছে সে। লালমুখো আপিসবাড়িটা যে তার কড়া পোশাক ছেড়ে গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপের আসর হয়ে পড়েছে এই নির্বোধ পরিবর্তন হাস্যকরই বটে।

আপিসে আসার সময়, টিফিনে, আপিস থেকে বেরোবার পরও তাদের মেলামেশা অবাধ রইল। আরো বেশি করে লোক-দেখানো ভূমিকা নিল তারা।

সুশীলা একদিন নিজে থেকেই সাবধান করে দিল: 'জেদের বশে ভুল করিসনে শীলা। আপিসে যখন আছিস তার সমাজকেও মেনে চলা দরকার।'

জয়শীলা হেসে উত্তর দিয়েছিল: 'ছেলেমানুষ আমি নই সুশীলাদি। যে বয়েসে মেয়েরা ভুল করে সে-বয়েস, আশা করি, আমি পেরিয়ে এসেছি। আর একথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারিনে: ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আপিস নাক গলাতে আসবে কেন!'

সুশীলা বললে, 'নাক গলাতে আসত না যদি-না এধরণের কিছু অভিজ্ঞতা আপিসের থাকত। যেখানে সুখে হোক দুঃখে হোক, ব্যক্তি এসে জমা হয়, ব্যক্তিগত ব্যাপার সেখানে গড়ে উঠা অত্যন্ত স্বাভাবিক। আর পরিণামে আপিসকেই এই দায় বইতে হয়। এই তো বছর দুয়েক আগে হৃদয়ঘটিত ব্যাপারে একজন কেরানি তেতলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করল...'

'কেন? আপিসকে দায় বইতে হবে কেন? আত্মহত্যার দায়িত্ব নিশ্চয়ই সেই কেরানিটি আপিসের ওপর চাপিয়ে দিয়ে যায়নি।'

'আপিস-আওয়ার্সে এমপ্লয়িদের কোন কিছু ঘটলে আপিসকেই তার দায়িত্ব বইতে হয়।'

জয়শীলা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'সামান্য তিলকে যে কেন তোমরা তাল করো বুঝিনে বাপু। পুরুষদের সঙ্গে সমান অধিকার দাবি করব, আর সব সময় ভাবব আমরা মেয়ে এর মতো বিড়ম্বনা আর কিছু নেই।'

সুশীলা বললে, 'তবু আমরা যে মেয়ে একথা তো ভোলবার কোনো কারণ নেই, শীলা। সৃষ্টিকর্তা যে আমাদের কিছু ব্যাপারে কানা করে রেখেছেন—এ তো মিথ্যে নয় রে।'

জয়শীলা বললে, 'তবু...একথা তো মানতেই হবে নারী-প্রগতিই বলো আর স্বাধীনতাই বলো সে-আন্দোলনের উদ্যোগ এসেছে পুরুষের কাছ থেকেই। পুরুষকে যেদিন মেয়েরা ভয় করতে শিখবে সেদিন নিজের হাতেই তারা বেড়ী পরবে।'

সুশীলা বললে, 'সব পুরুষই তো বিদ্যাসাগর নন, রজতেরাও আছে।'

জয়শীলা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল। 'রজত, রজত, রজত। কি করেছে রজত বলতে পারো?'

'পারি।' সুশীলার মুখ থমথমে: 'আমাদের আপিসের সুধীরাকে জিগ্যেস

করলেই জানতে পারবি। ওয়াই. এম. সি-এ রেস্তোরাঁয় তাকে জরুরি দরকারে ডেকে নিয়ে গিয়ে রজত প্রস্তাব করেছিল : দার্জিলিঙে তার সঙ্গী হবার।'

ঠোঁট কামড়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল জয়শীলা। তারপর বললে, 'প্রস্তাবের ভালোমন্দ নির্ভর করে ঘনিষ্ঠতার ওপর। আমিও তো ওর সঙ্গে কতবার সিনেমায় গেছি, তোমরা কি বলবে…'

সুশীলা আর দাঁড়ায়নি। সুপারিনটেন্ডেণ্ট-এর জরুরি ডাকে চলে গিয়েছিল।

আরো দিন গড়াল।

রজত সম্পর্কে তার ধারণাকে জয়শীলা না-করল পুনর্বিচার, না-ঘাটতি পড়ল তাদের মেলামেশার। হয় তো এর কোনোটাই সে করতে পারত না। আলাপ পর্বের আদিযুগটা প্রথমত মেয়েদের হাতেই থাকে, কিন্তু দিন যায়, তারা নির্ভর করে, বিশ্বাস করতে ভালোবাসে, আর-একসময় কখন অজান্তেই আপন ব্যক্তিত্বকে জলের মতো মিশিয়ে দেয় পুরুষের অস্তিত্বের সঙ্গে।

রজত আজকাল বাড়িতেই আসে। সন্ধ্যে সাতটা থেকে রাত্রি নটা-দশটা অবাধ রাজত্ব তার জয়শীলাদের ওখানে। কোলাপুরী স্যাণ্ডেলে ওর পায়ের আওয়াজ শদর ডিঙিয়ে সোজা এসে থামে জয়াশীলার ঘরের দোরগোড়ায়। খাবারঘর থেকেই ওর উপস্থিতি, ওর আসা, চলে-যাওয়া বুঝতে পারেন সুহাসিনী। কোনোদিন দেখা হয়েছে সামনাসামনি, দু' একটা সম্ভাষণ, কোনোদিন তাও না। অর্থাৎ এ-বাড়িতে সে যে জয়শীলার জন্যেই আসছে, তার কাছে আর সব কিছুই যে অবান্তর, এটা ভেবেই সুহাসিনীর মন ক্ষুব্ধ থাকত। দরজার পর্দা ঠেলে প্রথম-প্রথম আসতে পারি বলত রজত। কিন্তু সেই মৌখিক ভদ্রতা-টুকুও একদিন লোপ পেল। পর্দা ঠেলে কোনো কিছু জিগ্যেস না-করেই এবার থেকে ঘরে পা দিত রজত। জয়শীলা কোনোদিন রোগা ছেলেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকত, কোনোদিন-বা বাথরুমে। রজত চেয়ারে বসত না, জানালার দিকেও না। সোজা খাটের উপর বালিশে হেলান দিয়ে পা তুলে বসত। মাথার ওপর পাখার হাওয়া সত্মস্নানকরা চুলগুলি উচ্ছৃংখল করে দিতে পারত না। ঘন ঘন চুলে হাত বুলোত রজত, আর চোখে। বাথরুম থেকে ভিজে চুলে কোনো-দিত ফিরত জয়শীলা, গালে লেগে থাকত শাদা শাদা সাবানের ফেনা, কপালের নুয়ে-পড়া চুলে মোটামোটা জলের ফোঁটা। মন অকারণে গুনগুন করে উঠত রজতের। আয়নায় চুল আঁচড়াতে যা দেরি জয়শীলার। সেটুকু

সময় সিগারেট ধরিয়ে চেয়ে থাকত রজত। হাসত। খুনসুটি করতেও ছাড়ত না। ফিতেটা দাঁতে চেপে চুলগুলো এলো করে দিতে দিতে চোখে ভর্ৎসনা আঁকত জয়শীলা। ভাবটা ঃ 'মার খাবে।'

রজত বলে ঃ 'বিকেলে বেড়োনো ছেড়ে দিলে তাহলে।'

জয়শীলা বলে ঃ 'ভালো লাগে না। কলকাতা শহরটা ভীষণ ছোটো হয়ে গেছে। লোক, লোক আর লোক। ভিড়ের মধ্যে ভিড় হতে মোটেই সুখ নেই।'

রজত হাসে। 'কুঁড়েলোকের যুক্তি।'

'তা নয় রজত। বাইরে বেরুনো মানেই তো শেষ পর্যন্ত কোনো রেস্তোরাঁ-হোটেলে আশ্রয়-নেওয়া। কতক্ষণ আর হাঁটা যায়! আর কী দুর্ভাগ্য দেখো ঃ রেস্টুরেণ্টের বয়গুলো থেকে সমস্ত পরিবেশটাই মুখস্থ হয়ে গেছে। একঘেয়ে বিরক্তিকর সব কিছু। সেই চারদেয়ালের তলায় যখন সময়গুলো কাটাতে হবে, বাড়ি তাহলে কি দোষ করল।'

বাড়ির আড্ডায় মাঝে মাঝে আপিসের মেয়েরাও আসে। সুশীলাদি আজকাল আর আর তেমন ঘনঘন আসে না। রজতও থাকে। আর যায় সবশেষে। রজতের উপস্থিতিতে আসর তেমন জমে উঠবার অবকাশ পায় না। হালকা আলাপের প্রবাহে রজতের উপস্থিতি ভারি পাথরের মতো। চায়ের পর চা, ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই জয়শীলার। সিগারেটের ধূম্রজালে ঘরের বাতাস মন্থর হয়ে ওঠে। অনেক রাতে যখন বিদায় নেয় রজত তখন বাড়ির লোকের দুপুর-রাত্রি। সুহাসিনী ঘরে শুয়ে পড়েছেন। শিবতোষ আর কুণাল অনেকক্ষণ বকবক করে জেগে-থাকবার চেষ্টায় পা ছড়িয়ে তখন ঘুমে কাদা। শদর দরজায় দাঁড়িয়েও ওদের কথা শেষ হয়না। রাত্রির আকাশে তারা চকচক করে, হাওয়া এলোমেলো। চুলে হাত চালাতে-চালাতে কথা বলে রজত, উত্তর দেয় জয়শীলা। হাসে। আবার কথা, কথার টুকরো, আর হাসির ফুলঝুরি। 'চলি—' বলবার পরও চলা হয়না রজতের, আবার কথা, হাসি। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হাই তোলে জয়শীলা। তারপর রজত যখন সত্যিসত্যিই চলে যায় দরজা বন্ধ করতে-করতে সর্বাংগ ক্লান্তির অবসাদে নিঃস্ব মনে হয় জয়শীলার।

'বউমা তোমার খাবার ঢাকা আছে। খেয়ে নাও।' ঘরের মধ্যে থেকে জানান দিলেন সুহাসিনী।

'আপনি খাবেন না মা?' জয়শীলা দাঁড়াল।

'না বাছা। আমার শরীরটা ভালো নেই—'

জয়শীলার দীর্ঘশ্বাস রাত্রির অন্ধকার গ্রাস করে ফেলল।

আজ রাত্রে নির্বানীতোষের কথা মনে পড়ছে। কিন্তু, ক্লান্তির পাহাড় ডিঙিয়ে কি ওকে স্পর্শ করা যাবে। গোধুলির সূর্যাস্তের করুণ বিষণ্ণতায় সমস্ত মন ছেয়ে গেছে জয়শীলার। 'আমাকে মুক্তি দাও, মুক্তি দাও।' কোন্ ঈশ্বরের উদ্দেশে আবেদন জানাল সে। প্রোমে এখন কত রাত্রি। কী করছে নির্বান। থরথর করে উঠল অধর, অস্ফুট কি-বলতে চায় সে। কিন্তু, বলা যায়না, কলকাতা আর প্রোমের দূরত্বকে কোন্ সেতু দিয়ে বাঁধবে জয়শীলা। কেন চিঠি লেখেনা নির্বান। তার কথা না-হয় না-ই ভাবল, কিন্তু কুণাল, সে তো কোনো দোষ করেনি। ঘুমের ঘোরে কুণাল কেঁদে উঠল। উঠে দাঁড়াল জয়শীলা। শিবতোষের ঘুমন্ত হাতটা কুণালের বুকের ওপর এসে পড়েছে। সরিয়ে দিল জয়শীলা। তিন বছরের ছেলে, কিন্তু এত রোগা। হাড়গুলো গোনা যায়, মুখে অস্বাস্থ্যের চিহ্ন। রজত বলছিল একজন স্পেশালিস্টকে দেখাতে। তাই দেখাতে হবে।

পৃথিবী ঘোরে।

'আড্ডা, আড্ডা, আড্ডা—' রাত্রির বিছানা থেকে বিড়বিড় করে উঠলেন সুহাসিনী।

রজতকে শদর দরজা থেকে বিদায় দিয়ে ফিরছিল জয়শীলা। থমকে দাঁড়াল শাশুড়ির ঘরের সামনে।

'কিছু বলছেন মা?'

'কি আর বলব বাছা। এর পরও আর কি বলবার আছে।'

'মানে?'

'এত রাত্রে আর মানে-টানে কিছু বলতে পারব না বাপু। নির্বান যেদিন গেছে সেই দিন থেকে এবাড়ির সব কিছু গেছে। কপাল, সবই পোড়া কপাল। নইলে আমার অমন সোনার ছেলে কিনা পর হয়ে যায়।'

আক্ষেপটা সুহাসিনীর নতুন নয়, সম্প্রতি সুযোগ পেলেই তিনি কথাগুলো ছুঁড়ে মারেন জয়শীলার গায়ে। কারণ অমন সোনার ছেলে কত দুঃখে যে পর হয়ে গেল—সে তো শুধু জয়শীলার জন্যেই। আর বউমার যে দোষটা

তিনি এতদিন বুঝতে পারেননি, ইদানীং তাও আবিষ্কার করে ফেলেছেন। আড্ডা, আড্ডা, আড্ডা। শদর আর অন্দর আজ একাকার হয়ে গেছে। কোন পুরুষ মানুষ তা সহ্য করতে পারে! আর সবচেয়ে অসহ্য লাগে ওই রজত ছোঁড়াটাকে দেখে। ওর আসারও যেমন সময় নেই, যাওয়ারও।

'আড্ডার কথা কি বলছিলেন মা?' জয়শীলা যেন আজ প্রস্তুত হয়েই ময়দানে নেমেছে।

সুহাসিনী ঘর থেকেই গজগজ করে উঠলেন : 'তা এত রাত্রে কি তোমায় জবাবদিহি করতে হবে বাছা?'

জয়শীলা বললে, 'বাড়ির কর্ত্রী যখন আপনি, আপনার বাড়ির যাতে শান্তি ভঙ না হয়, দেখতে তো হবে আমাকে।'

'কে ওসব মানে বাছা। আজকাল আর বুড়ো শাশুড়ীদের ধার কে ধারে। আমরা সেকেলে হয়ে গেছি, বউমা।'

'আপনার অসুবিধে হচ্ছে বললেই তো পারতেন মা। ওদের আসতে বারণ করে দিতাম।'

সুহাসিনী চুপ।

জয়শীলা বললে, 'বাইরে বেড়িয়ে ফিরতে দেরি হলেও আপত্তি, বাড়িতে বন্ধুবান্ধব এলেও আপনার আপত্তি। তাহলে আমি কি করি, বলতে পারেন মা, কী করে আমার দিন কাটে।'

সেদিন রাত্রে আর কোনো কথা হল না।

কিন্তু, কয়েকদিন পরে যে এমন করে সারা বাড়িটা বারুদের মতো ফেটে পড়বে, জয়শীলা ভাবেনি।

রজত রাত্রে বেরিয়ে যেতেই ঘর থেকে ক্রুদ্ধ সাপের মতো বেরিয়ে এলেন সুহাসিনী। ক্রোধের এই নগ্ন কালো মূর্তি দেখে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল জয়শীলার।

'শোনো বউ মা—'

জয়শীলা দাঁড়াল।

'আমরা বুড়ো হয়েছি। আমাদের ধর্মাধর্ম ন্যায়-অন্যায়ের সঙ্গে তোমাদের মিল হবেনা, হতে পারে না। চোখ বন্ধ করে থাকব ভেবেছিলাম, কিন্তু পারলাম না বাছা।'

'কি হয়েছে মা?'

'আমি অত্যন্ত ধর্মভীরু শান্তিপ্রিয় মানুষ বউমা। আমি চাইনে রজত এ বাড়িতে আসুক। আর তোমার সঙ্গে মেলামেশা করুক।'

বজ্রাহতের মতো স্তম্ভিত জয়শীলা। তার মনে হল লালমুখো আপিস বিল্ডিঙটা হঠাৎ উড়ে এসে এই বাড়ির উঠোনে ছায়া ফেলেছে। বনের লুকোনো চোরাফাঁদে অসহায় শ্বাপদের মতো যেন জড়িয়ে পড়েছে জয়শীলা। আপিস বাড়ি—সবখানেই যদি এক সংগ্রামের ঘোষণা ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে কোথায় গিয়ে জমি পাবে সে, আশ্রয় পাবে। রজত, রজত, রজত। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডটা যেন রজতফোবিয়ায় ভুগছে।

'কেন? রজত কি করেছে? তার দোষটা কি?' জয়শীলা আঘাতের ধাক্কা কাটিয়ে শক্ত হচ্ছে।

'বাড়িতে বৌ ছেলেপুলে থাকতেও যে লোকটা ঘণ্টার পর ঘণ্টা আর একজন পরস্ত্রীর সঙ্গে আড্ডা মারতে সময় পায়, সে-লোক আর যাই হোক, ভালো নয়।'

'মা!' চিৎকার করে কি বলতে চাইল জয়শীলা।

'আমাকে বাধা দিওনা বউমা। তোমরা শিক্ষিত ছেলেমেয়ে। শিক্ষার ছটা দিয়ে আমাকে তাক লাগাতে পারো, কিন্তু তাতে আমার ধারণার ইতরবিশেষ হবে না।'

'আপনি, আপনি…' কথা হারিয়ে গেল জয়শীলার। তার চোখের সামনে অজস্র মানুষের মুখ। সারা আপিসের কেরানিরা যেন এই নাটকীয় দৃশ্য কৌতুকতার সঙ্গে উপভোগ করছে। খোলা উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে পরিত্যক্ত পরিবর্জিত জয়শীলা যেন হি-হি করে কাঁপছে। হঠাৎ ইস্পাতের বিদ্যুতাভাসের মতো নির্বানীতোষের মুখ, দেবপ্রিয়। না, আর ভাবতে পারছে না জয়শীলা। আঘাতটা সম্পূর্ণ করে বুক পেতে নেবার জন্যে ঋজু হয়ে দাঁড়াল সে।

'আমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে লাভ নেই বউমা। আড়ি পাতা আমার স্বভাব নয়। বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিলাম বলে চোখে পড়ে গেল। তোমার হাত চেপে ধরে কী বলছিল ছোঁড়াটা—?'

সমস্ত ঘটনাটা পরিষ্কার হয়ে উঠল এতক্ষণে।

কিন্তু, কখন হাত ধরেছিল রজত। এতক্ষণ এত কথার মধ্যে কখন কোন সময়ে হাত ধরেছিল রজত, এখন আর মনে নেই জয়শীলার। আর ওর হাত ধরার পেছনে এত অর্থ থাকতে পারে, কল্পনাও করেনি সে। বোধহয় সিনেমায় যাওয়ার ব্যাপারে যখন জয়শীলা ঘনঘন আপত্তি জানাচ্ছিল, সেই সময়ে একবার হয়তো হাত ধরে অনুরোধ করেছিল রজত।

কিন্তু, সেটা এমন সামান্ত ব্যাপার! মেয়েদের হাত ধরলেই তার সতীত্ব হানি হয় আজকের দিনে এমন বিশ্বাসী কেউ থাকতে পারে! আর হাত ধরলেই যদি মেয়েদের চরিত্র নষ্ট হয়, তাহলে দিনের প্রায় প্রতি ঘণ্টায় মেয়েরা অসতী হচ্ছে। ট্র্যামে-বাসে, আপিসে কোথায় না তাদের স্পর্শঘটিত অপরাধ ঘটছে! মেয়েদের হাতে চাপ দিলেই যে মনের হাতে চাপ দেওয়া হয়—একথা কি করে ভাবতে পারলেন সুহাসিনী।

সারারাত অতন্দ্রচোখ উষর দিনের মতো জ্বলতে লাগল জয়শীলার। সারা সংসারটা মনে হল বিরাট রঙ্গভূমি। বাঁচতে হলে লড়াই করতে হবে, প্রতিমুহূর্ত অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রাম। এতদিন তাও নির্ভাবনা ছিলঃ অন্তত একটা জায়গায় তার আশ্রয় আছে। বাহির সংসারের যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত মনের দু'দণ্ড জিরোবার অবসর। কিন্তু, সে মিথ্যা বিশ্বাসও আজ ধুলিসাৎ। আজ এই কথাই মনে হলঃ ব্যক্তিমানুষের মধ্যে এমন একটি নির্জন কোণ আছে যার দোসর নেই। তার দুঃখ, তার বেদনাবোধ একান্ত তারই নিজস্ব বলে সংগ্রামের রকমটাও ব্যক্তিগত। জীবনের পাঠাশালা থেকে আরো একটা জ্ঞান আহরণ করল জয়শীলা। সেটা সমাজনামক স্থূল বস্তুটির সঙ্গে একক-মানুষের সংগ্রাম। তুমি সমাজে বাস করে মনের পাখিকে উধাও দিগন্তে মেলে ধরতে পারো, কিন্তু পায়ের শেকল অহরহ তোমার বন্দিদশাকে মনে করিয়ে দেবে।

কিন্তু…এমন সমস্যায় কোনোদিন পড়তে হয়নি জয়শীলাকে। এইভাবে তার স্বচ্ছন্দ গতিবিধিকে কেউ খর্ব করতে পারে, ভাবতে পারেনি। এখন আর তৃতীয় পথ নেই—হয় ফিরতে হবে, না হয় এগোতে হবে। রজতের প্রশ্নটা অবান্তর—এর মধ্যে জড়িয়ে রয়েছে তার আত্মাধিকার, আত্মবিস্তারের সংগ্রাম। হয় গৃহপালিত নিরীহ জন্তুর মতো নিজেকে গুটিয়ে আনতে হবে অথবা পাঁচিল ভাঙতে হবে। লাভলোকশানের খাতা নিয়ে আজ হিসেব করতে বসল জয়শীলা। জমাখরচের দুই পৃষ্ঠার অংকই শূন্য। কিছুই হারাবার নেই তার, তাই ছাড়বারও কোনো ভয় নেই। চারদিক থেকে বাধার পাক খেয়ে-খেয়ে মনে হচ্ছে রজতের সঙ্গে মেলামেশার পেছনে শক্ত কোনো সত্য আছে, কিন্তু সত্যের আসল চোহারাটা কি! তার মনের জগতটা হাতড়াতে লাগল জয়শীলা। কিন্তু রজতের সত্যিকার পরিচয়টুকু তাতে আভাসিত হয়ে উঠল না। দশজনের কথা ছেড়ে দিলেও একবার ভেবে দেখা দরকারঃ রজতের সঙ্গে তার সম্পর্কের ভিত্তিটি কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এই আলাপ-চর্চার

পরিণতি কি। শুধু বন্ধুত্ব। কিন্তু বন্ধুতারও তো হৃদয়গত কোনো জায়গায় মিল থাকা দরকার। চিন্তায় দর্শনে অনুভূতিতে কোথাও রজতের সঙ্গে সমমর্মিতা নেই তার। দেবপ্রিয় যা ছিল, নির্বানীতোষেরও যা ছিল, রজতের তার কিছুই নেই। এক-একসময় তার সান্নিধ্য বিরক্তিকর, যন্ত্রনাদায়ক। ওর মনের আকাশ কেমন স্থূলত্বের সীমায় বাঁধা। বড় রকমের প্রতিবিম্ব সেখানে পড়ে না। মৃৎপিণ্ডবৎ! তবু ওর চরিত্রের যেটা আকর্ষণীয়ঃ ওর স্বভাবের ঘরোয়া আদল। যাকে ধরা যায়, স্পর্শ করা যায়, বোঝা যায়। জীবনের চেহারাটা যেখানে অস্পষ্ট ধূসর হয়ে-হয়ে ফ্যাকাসে, নীরক্ত, সেখানে এমন একটা স্থান থাকা দরকার যা স্পষ্ট প্রতিভাত। মরুভূমির মাঝে যদি মাঝে মাঝে খেজুরের ছায়াটানা বন না থাকত তাহলে মরু তার ঊষর বুক ফাটিয়ে কবে আর্তনাদ করে মরত। রজতের সঙ্গ হয়তো চেষ্টা করলেই বর্জন করা যায়। কিন্তু, সংসারের তাতে লাভ থাকতে পারে, তার কি লাভ! তবু, বাড়ির মালিক যখন সুহাসিনী, তাঁর আদেশ মেনে চলতে হবে। কিন্তু, যদি-না মানে! কী ক্ষতি হয়। চলে যেতে হবে এখান থেকে। সেটা কি খুবই কষ্টের ব্যাপার হবে! কিন্তু, কোথায় যাবে! মাসিমার ওখানে? না। একটা ছোটখাটো বাসা। আর একটা ঝি পেলেই চলে যাবে। সুবিধা-অসুবিধায় রজত রইল দেখাশোনা করবার।

সব শুনে স্নেহলতা বললেন, 'তোর সবটাতেই বাড়াবাড়ি। কোনোদিন কি সহজ সুস্থ ভাবে কিছু ভাবতে শিখবি নে।'

জয়শীলা গম্ভীর গলায় বললে, 'আমি অত্যন্ত সুস্থ আছি মাসিমা।'

'ছাই! সারা জীবন নিজের চালে চলতে গিয়ে কি কেবলই ভুল করে বসবি রে। নির্বান যদি ফিরে আসে, একদিন তো আসতেই হবে তাকে, কি জবাবদিহি করবি ওর কাছে?'

'জবাবদিহি আর কারুর কাছেই করব না আমি। তোমার কি ধারণা নির্বান ফিরে আসবে, আর ফিরে এলেই মিল হবে আমাদের! জীবন থেকে পাঁচ-দশটা বছর—পারো তুমি তাদের ফিরিয়ে দিতে। জীবনটা নাটক নয় মাসিমণি যে দশ-কি-বিশ বছর পরেও নায়িকা মালা গাঁথবে আর নায়ক ফিরে এলেই তার গলায় টুপ্ করে মালা পরিয়ে দেবে!'

জয়শীলার কথায় একটা গোপন কাঁটা ছিল যা উসকে দিল স্নেহলতার

পুরানো ক্ষতকে। চুপ করে রইলেন তিনি। কী করবেন, কীই-বা করতে পারবেন স্নেহলতা। মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় শত্রু তার মন।

'কিন্তু...' স্নেহলতা বললেন, 'কুণালের কথা ভেবে দেখেছিস। তোর খেয়ালে ওর জীবন নষ্ট করবি কেন। ওসব পাগলামি ছাড়, শীলা। বেশ তো। কদিন না হয় আমার এখানেই থাক। ত্মাখ না কী হয়।'

জয়শীলা বললে, 'কুণালের ভবিষ্যত চিন্তা করি বলেই তো ওবাড়িতে থাকা চলে না আমার। ছোটবেলা থেকে মিথ্যাকে সত্য বলে জেনে সে যেন ভুল না করে।'

'অমন কথা বলিস নে শীলা—'

'বলতে হবে মাসিমা। ওদেশের ছেলেমেয়েরা মায়ের নামে তাদের পরিচয় দেয়। এতে ওদের অধঃপতন কিছু ঘটেছে বলে আমি মনে করিনে।'

'ছি ছি শীলা...' স্নেহলতা শিউরে উঠলেন সর্বাংগে।

'পিতৃত্বকে তো আমি অস্বীকার করছিনে মাসিমণি, ওদেশও করেনি। অনর্থক তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করাতেই আপত্তি। কুণালের কাছে ওর বাবা একটা স্মৃতি মাত্র, ও যদি ওর বাবাকে ভালোবাসতে না-পারে, সেটা কি খুবই অস্বাভাবিক হবে, মাসিমণি।'

স্নেহলতা চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর যেন একটা যুক্তি পেয়েছেন নিজের দিকে এইভাবে বললেন, 'কিন্তু রজতকে নিয়েই বা এত বাড়াবাড়ি করবার কি আছে তোর, বুঝতে পারিনে।'

জয়শীলা বললে, 'আজ বিশ্বশুদ্ধ লোক রজত-আমার সম্পর্ককে বিষনজরে দেখছে বলেই ভয় পেয়ে আজ যদি ওর সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলি তাহলে মিথ্যারই জয় হয়, আমার গৌরব কিছু বাড়ে না তাতে।'

'তবু...একজন বাইরের লোকের জন্যে—' স্নেহলতা বোঝাতে চাইলেন। 'নিজের জীবনে অশান্তি ডেকে আনা কি ভালো হবে?'

'বাইরের লোক কাকে বলো মাসিমা। ঘরে থেকেও যে বাইরের লোক সে বাইরেই থাকে। আমার কাছে, ঘরবাহির সমান। জীবনে যদি শান্তি পাই বাইরের লোকের কাছেই পাব।'

স্নেহলতা আর কথা বলেন নি। চুপ করে গিয়েছিলেন।

আপিসের সারা সময়টা অশান্ত আবেগে কাটল জয়শীলার। দুরন্ত খেপামিতে ভরে উঠেছে মস্তিষ্ক। থৈ থৈ চিন্তা স্রোত। কাজের ভিড়ে চিন্তাটা যতই দু'হাতে ঠেলতে চায় ততই যেন পেয়ে বসেছে তাকে। কলম ছেড়ে অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল জয়শীলা। সব কিছু বন্ধন ছিঁড়ব বলে ছেঁড়া যায় না। বন্ধন গড়ে উঠতে যেমন সময় লেগেছে, তেমনি ছিঁড়তেও সময় নেবে। বহুপথ অতিক্রম করে শ্রান্তপথিক যেমন পেছনের দিকে তাকিয়ে পথচলার হিসেব নিতে চেষ্টা করে তেমনি ফেলেআসা জীবনের স্তরগুলি নিপুণ চোখে পর্যবেক্ষণ করতে লাগে জয়শীলা। যখনই জীবনের এক মোড় থেকে অন্য মোড়ে ভাসিয়ে দিয়েছে জীবন, প্রতি নতুন মোড়ে ফিরে ফিরে চেয়েছে জয়শীলা। মেয়েলী অভ্যেস। মেয়েরা পিছন ফিরতে ভালোবাসে। নির্বানকে গ্রহণ করবার সময় পিছন ফিরে দেবপ্রিয়ের পথের উদ্দেশে তাকিয়ে নিতে ভোলেনি সে। আজ যখন নির্বানীতোষের পারিবারিক শাসন ভেঙে আপন স্বাধীন-সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করবার উদগ্রতায় মেতে উঠেছে তখনো ভুলতে পারছে না নির্বানীতোষের দেওয়া সংসারবন্ধনকে। বন্ধনকে ভাঙতে গিয়ে সে কি আর একটি বন্ধনের চাকায় জড়িয়ে পড়ছে না! বৃত্ত থেকে বৃত্তান্তরে। সমগ্র চৈতন্য যেন ঘুলিয়ে ওঠে। হয়তো জীবনের এই নিয়ম। সংসার-পারাবারে একটি বুদ্‌বুদ ফেটে পড়ে শুধু অন্যত্র আর একটি বুদ্‌বুদকে জাগিয়ে তুলতে। বুদ্‌বুদের গতি বৃত্তের মতো। জীবনটাই হয়তো তাই।

কাল সারারাত থেকে আজ সকাল পর্যন্ত সুহাসিনীর মনের যে চেহারা দেখেছে তাকে অস্বীকার করবার সাহস নেই জয়শীলার। রজত যদি তবু আজ বাড়িতে যায়ই, জয়শীলা স্থিরনিশ্চিত জানে, সুহাসিনী তাকে অপমান করবেন। কর্তালির অহমিকাকে ছাড়তে পারবেন না তিনি। আর সে-অপমান রজতের নয়, জয়শীলার।

ছুটির পর কফি হাউসে দেখা হল রজতের সঙ্গে।

'শোনো—আমার একটা উপকার করে' দিতে হবে···' দেখামাত্র চেয়ার টেনে বসতে-বসতে বললে জয়শীলা।

রজত বললে, 'কি, ব্যাপারটা কি শুনি?'

জয়শীলা বললে, 'আমার জন্যে একটা বাসা দেখে দিতে হবে। একখানা ঘর আর ছোট্ট এক ফালি বারান্দা হলেই চলবে।'

রজত হেসে বললে, 'ঠাট্টা করছ না তো। বাসা নিয়ে তুমি কি করবে।'

জয়শীলা গম্ভীর গলায় বললে, 'আমি থাকব।'

'যাঃ—' অবিশ্বাসী গলায় হাসল আবার রজত।

'আমি সিরিয়াসলি বলছি রজত। বাসা আমার চাই।'

রজত কিছুক্ষণ অবাক চোখে চেয়ে রইল। তারপর ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করে বললে, 'দাঁড়াও—দাঁড়াও। কি হয়েছে, ব্যাপারটা খুলে বলো দেখি।'

জয়শীলা রাগ করে উঠল। 'ব্যাপার না বললে বুঝি বাসা খুঁজে দেখবে না তুমি।'

'আহা! বাসা খুঁজতে বলেছ তা না হয় দেখব। কিন্তু, শ্বশুরবাড়ি ছাড়ছ কেন সেটা তো জানা দরকার।'

'সেটা না-জানলে বাসা-খোঁজা আটকাচ্ছে কি! যদি বলি তোমার জন্যে বাড়ি ছাড়তে হচ্ছে, কী করো তাহলে?'

রজতের খবরটা শুনে চমকানো উচিত ছিল, কিন্তু কোনো ভাবান্তর হল না তার। শান্ত গলায় বললে শুধু: 'কিন্তু···কাজটা ভালো হবে কি? নানা নিজের জন্যে ভাবছিনে, তোমার দিক থেকেই ভাবছি ব্যাপারটা—'

'ধন্যবাদ। আমার ভাবনা তোমাকে না ভাবলেও চলবে। দয়া করে আমাকে একটা বাসা দেখে দিলেই আমি বাধিত হব।'

'আচ্ছা দেখি।' রজত সিগারেট ধরাল।

আচ্ছা দেখি বলে আপাতত জয়শীলার উত্তেজনার মুখে সাময়িক বাঁধ দিয়ে ওকে প্রশমিত করবার চেষ্টা করল। সমস্যাটা তো শুধু জয়শীলার একার নয়, তাকে কেন্দ্র করেই যখন আবর্তের সৃষ্টি হয়েছে, নিজের দায়িত্বকে হাল্‌কা করতে পারেনা রজত। এতদিন সংসারের চন্দ্রাতপের তলায় তাদের মেলামেশা চলত বলে বাড়তি ভাবনার কিছু ছিল না রজতের। কিন্তু, চন্দ্রাতপ যেদিন সত্যিই সরিয়ে ফেলতে হবে, গোটা আকাশটা তার হাজারো নক্ষত্রের কৌতুক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে তাদের মাথার ওপরে। সে-আকাশের হাজারো চোখে অজস্র কুতূহল। কাজেই সব কিছু ভেবে নেবে একবার রজত। কিন্তু, ভাবতে চেষ্টা করেও ভাবনা এগোয় না তার। জয়শীলার উপস্থিতিটুকু এত প্রত্যক্ষসত্য যে তাকে ছাড়িয়ে চিন্তার নতুন কোনো ব্যঞ্জনা আসেনা রজতের মনে। জয়শীলার সামনে সব চিন্তাই গুলিয়ে যায়। ভেবে কোনো কাজ করবার প্রতিভা নেই রজতের। এক-একদিন রজতও ভাববার চেষ্টা করে: জয়শীলার সঙ্গে তার সম্পর্কের মূল ভিত্তি কোথায়।

কী-আকর্ষণ রজতকে সন্ধ্যে হলেই আকর্ষণ করে জয়শীলার বাড়ির দিকে। রোজকার আলাপের আকাশটা একই রঙের, একই কথা, নতুনের রোমান্স নেই বিন্দুমাত্র। খাটের কাছে জয়শীলার মোড়া টেনে বসা, চায়ের কাপে চিনি নেড়ে দেওয়া থেকে অঙ্গভঙ্গি, কথার কায়দা পর্যন্ত মুখস্ত রজতের। ওর সান্নিধ্যে উগ্রতা নেই, উত্তেজনা নেই। তবু মিষ্টি বকুলগন্ধের মতো একটা সূক্ষ্ম অনুভব জড়িয়ে ধরে রজতকে। এক-একসময় মনে হয় জয়শীলার ঘরের মধ্যেই জাদু আছে। যে-জাদুর লোভে যুগযুগ ধরে যাযাবর মানুষের গৃহরচনার কল্পনা, তার অসীম তৃষ্ণাকে সীমার মধ্যে বন্দী করে উপভোগ করবার শান্তি। রাত্রির নির্জনতায় মুখোমুখি আরো-একটি হৃদয় অনুভবে সিক্ত। কিন্তু···মিথ্যে বলবে না রজতঃ জয়শীলার সঙ্গে আলাপের আদি-পর্বে তার নিজের মধ্যে একটা লোভ ছিল। থিয়েটারের রাত্রে তার বুকের ওপর জয়শীলার বেপথু দেহের স্পর্শ অনেক নির্জন রাত্রে তার রক্তে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। তার কারণ হয়তো এই হবে পরস্ত্রী জয়শীলার শরীরের নিষিদ্ধ স্পর্শ। আর নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতিই পুরুষের লোলুপতা বেশি। তারপর প্রতিদিনকার মেলামেশায় সেই লোভকে জয় করেছে রজত। কারণ জয়শীলার স্পর্শ আর তার কাছে নিষিদ্ধ থাকেনি। তার স্বভাবের সহজতা দিয়ে রজতের সংস্কারকে তিলেতিলে লোপাট করে দিয়েছে জয়শীলা। তবু···এক-এক-সময় রক্তে ছোবল মারে, সরীসৃপ ইচ্ছারা কিলবিল করে দাপাদাপি করতে থাকে দেহের কোষে কোষে। কিন্তু···রজত জানেঃ দেহের কামনাকে জ্বালাতে পারে যে মনের আগুন, হাওয়ার প্রশ্রয় না-পেলে সে প্রদীপ্ত হতে পারে না।

কফিহাউস থেকে বেরিয়ে আজ আর কোনো কথা জমল না দুজনের মধ্যে। অত্যন্ত গম্ভীর-গম্ভীর জয়শীলা। রজতকে চিন্তিত দেখায়।

বাড়িতে ফিরতে সন্ধ্যে উৎরে গেল আজো।

সুহাসিনী একবার চোখ তুলে জয়শীলার দিকে তাকালেন। কোনো সম্ভাষণ না করে বুঝিয়ে দিলেন যথেষ্ট রেগে রয়েছেন তিনি।

জয়শীলা ঘরে পা দিতে সুহাসিনীর গলা পৌঁছল পিছন থেকেঃ 'বার্মা থেকে তোমার চিঠি এসেছে। ড্রেসিঙ টেবিলে চাপা দেওয়া আছে।'

হঠাৎ হৃদ্‌পিণ্ড বিকল হয়ে এল যেন। স্তম্ভিত হতবুদ্ধি জয়শীলা। আজ পাঁচ বছর পর কি সত্যিই তাহলে ফিরে আসছে নির্বান। এতবড় আশাতীত ঘটনায় মুখ শুকিয়ে এল জয়শীলার। বহুদিন পর প্রবাসী স্বামী ফিরে

আসছে আর সেই খবরে কালো হয়ে উঠল ওর মুখ—যে কেউ দেখলে কি ভাববে তাকে, এই চিন্তায় ভীরু লজ্জায় কাঁপন জাগল ওর ভেতরে। নির্বানীতোষ ফিরে আসছে। হাজারো চিন্তার ভিড়ে গানের ধুয়ার মতো একটি সুরই রিনরিন করে উঠছে তার কানের পরদায়। কিন্তু এতদিন কোনো খবর না দিয়ে হঠাৎ এই নাটকীয় আবির্ভাব কেন নির্বানীতোষের। জীবনের স্রোতে পাঁচটা বছর কেবল কি ক্যালেণ্ডারের পৃষ্ঠার হিসেব! এই পাঁচ বছর মানে, পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা। এই পাঁচ বছরে একটু-একটু করে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে রজত, সরিয়ে নিয়ে গেছে জয়শীলার মন থেকে। আজ হঠাৎ দখলের তকমা-এঁটে নির্বান এসে অধিকার চাইলেই কি নিজের সমস্ত স্বত্ব ছেড়ে দিতে পারে জয়শীলা! এই পাঁচ বছরে পৃথিবীর রঙ পালটেছে সমাজ এগিয়েছে, মনেরও বয়েস বেড়েছে। মাথার ভেতরটা যেন বোবা যন্ত্রণায় ফেটে পড়তে চায়। আজ দীর্ঘ পাঁচ বছরের বিরহের নদী উজিয়ে নির্বান এসেছে, দাঁড়িয়েছে তার চোখের সামনে—এই দৃশ্য ভাবতেই কেমন শীতল অস্বস্তিতে দুর্বল মনে হয় নিজেকে। এই দীর্ঘদিনে গড়ে-উঠা পাঁচিলটাকে কি করে ভাঙবে জয়শীলা।

ঘুমের ঘোরে বিড়বিড় করে উঠল কুণাল। হাতদুটো বুকের ওপর জোড়া। জয়শীলা ওকে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দিল। কুণালের দিকে চেয়ে চোখ পড়ে না ওর। প্রায় পাঁচ বছরের ছেলেটার গায়ে একটুও মাংস লাগেনি, লম্বা হয়েছে শুধু। পেটের অসুখ লেগে আছে বারো মাস। কিন্তু, কী আশ্চর্য, পাশ-বালিশ আঁকড়ে শোয়ার কায়দাটা হুবহু বাপের মতো নকল করেছে ছেলেটা, বড় হলে কি সেও ওর বাপের মতো হয়ে উঠবে!

'বউমা—'

সুহাসিনী।

'মা?'

'কি লিখেছে নির্বান। কবে আসছে?'

'চিঠি দেখিনি মা—'

'এখনো দেখনি! কী যে এত ভাবো বাছা, তুমিই জানো।'

ড্রেসিঙ টেবিলের সামনে উঠে গিয়ে চিঠি খুলল জয়শীলা। চিঠির অক্ষরগুলি যেন পড়তে পারছে না। আলোর দিকে এগিয়ে গেল। হঠাৎ ব্লটিঙ্ কাগজের মতো নীরক্ত পাংশু হয়ে উঠল জয়শীলার মুখের চেহারা। থরথরিয়ে উঠল ঠোঁট। মানুষের প্রবল ইচ্ছাশক্তি কি অপরকে

প্রভাবিত করতে পারে! সহসা মনে হল তার দেহটা ক্রমশ শূন্য হতে-হতে বিন্দু হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে নীল আকাশের গায়ে।

'ও বউমা—বোবা হয়ে গেলে নাকি বাছা। কী লিখেছে খোকা, কবে আসছে—'

জয়শীলা ক্লান্ত গলায় বললে, 'আবার পাঁচ বছরের জন্যে কনট্রাক্ট করেছে ও।'

'কিসের কনট্রাক্ট ? ও কি ফিরছেনা বউমা ?' সুহাসিনী যেন হাঁপাচ্ছেন।

'না মা। আরো পাঁচ বছরের চাকরির কনট্রাক্ট পেয়েছে সে।'

সুহাসিনী মুখ কালি করে সরে গেলেন।

অনেকক্ষণ পাথরখণ্ডের মতো দাঁড়িয়ে রইল জয়শীলা। হাতের মুঠোয় শক্ত করে আঁকড়ে ধরা চিঠিটা ঘামে ভিজছে। জাদুকরের ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে হঠাৎ তার মুঠোর কাগজটা যেন আগুনের ডেলার মতো দাউ-করে জ্বলে উঠল। হাতের চেটো থেকে আগুনের প্রদাহ মনিবন্ধে, বাহুমূলে, বুকে সর্বশরীরে ছড়িয়ে পড়ল।

এই মুহূর্তে মনে হল জয়শীলার ঃ এইভাবে তাকে শাস্তি না দিয়ে যদি সত্যিই ফিরে আসত নির্বান, তাহলে যত দামেই হোক গ্রহণ করত জয়শীলা। কিন্তু জয়শীলা জানে, এ্যাকসিডেণ্ট ঘটিয়ে জীবনের মূল সমস্যাকে দূর করা যায় না! মানুষের জীবনের ট্র্যাজিডিই এই ঃ বেঁচে থাকার পরম লগ্নকে চরম প্রাপ্তির মধ্যে সে ভরে তুলতে জানে না। এতক্ষণ নির্বানীতোষের আশংকায় তার যে মন শংকিত হয়ে উঠছিল, নির্বানীতোষের না-আসার খবরে সে মন এখন বিন্দুমাত্র উল্লসিত হল না। আসলে কী যে চায় আর চায় না তার মন—এই বোধটুকুই হারিয়ে গেছে জয়শীলার চৈতন্য থেকে। জয়শীলা অদৃষ্টবাদী হয়ে পড়েছে।

নির্বান যদি সত্যিই আর না ফেরে তাহলে কিসের আকর্ষণে, কিসের জোরে পড়েথাকা এই বাড়িতে। চিঠিটা যদি নির্বানের ফিরে আসার খবর বহন করে আনত, তাহলে হয়তো এত তাড়াতাড়ি কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছত না সে। অপেক্ষা করত, দেখত, লক্ষ্য করত ঘটনাপরম্পরা। নির্বানীতোষের উপস্থিতি হয়তো তার জীবনের অন্য মোড় এনে দিত। হয়তো—না থাক। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল জয়শীলা। বেলগাছিয়া রেলওয়ে ব্রীজের ওপর দিয়ে ট্র্যামে করে আসতে-আসতে দেখত পেছন থেকে এঞ্জিনের ধাক্কায় মালগাড়িগুলি ছুটতে আরম্ভ করেছে, সেই গতি মালগাড়ির নয়, এঞ্জিন থেকে ধার-করা। নিজের জীবনের দিকে তাকিয়ে জয়শীলারও মনে

হয় তার গতিটা মালগাড়ির মতোই ধার-করা, সেইযে কবে এঞ্জিন ধাক্কা মেরেছে সেই থেকে ছুটছে আর ছুটছেই, ক্ষান্তি নেই।

পরদিন বিকেলে ট্র্যামে ফিরতে-ফিরতে রজত বললে, 'শোনো। একটা বাসার খোঁজ পেয়েছি। দেশবন্ধু পার্কের কাছাকাছি। ভাড়া পঁয়তাল্লিশ টাকা।'

জয়শীলা কোলের ওপর হাত রেখে তাকিয়েছিল বাইরের দিকে। অন্য-মনস্কে উত্তর দিল: 'আচ্ছা।'

'কী ভাবছ?'

'উঁ?'

'বাসার কথা বলছিলাম—'

'শুনেছি।' জয়শীলা হাসল। 'তাড়াতাড়ি কি। একদিন দেখে এলেই হবে।'

রজত চুপ করল। জয়শীলার নিস্পৃহতাই যেন চুপ করিয়ে দিল তাকে।

কিন্তু কয়েকদিন পরেই যে এমন করে' সুহাসিনী আক্রমণ করবেন, কে জানত। নির্বানীতোষের না ফেরার খবরের প্রথম ধাক্কায় মূক পাথর হয়ে গিয়েছিলেন বুঝি। যেন ঘটনার পরিণতির চেহারাটা স্পষ্ট করে ধরা পড়েনি তাঁর চোখের পাতায়। তারপর ক্রমে-ক্রমে যখন নির্বানের অবর্তমানের রূপটা জমাট কালো অন্ধকারের পর্দার মতো বীভৎসভাবে ঝুলে রইল নাকের গোড়ায় তখন আতংকিত হয়ে উঠলেন সুহাসিনী। প্রবাসী সন্তান যে আর কোনোদিন ফিরবে, এই ক্ষীণ সম্ভাবনাটুকুই লোপ পেয়ে গেল তাঁর মন থেকে। আর এই ভয়ংকর ঘটনার জন্যে দায়ি করলেন একমাত্র জয়শীলাকে। নির্বান চলে যাবার পর থেকে, জয়শীলার স্বভাব-চরিত্র গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন সুহাসিনী। আর প্রতিপদে দোষ পেয়েছেন, খুঁত পেয়েছেন ওর। জয়শীলার হই-হই স্বভাব নির্জনতাপ্রিয় নির্বানকে তিলে তিলে দগ্ধে মেরেছে। যাকে বলে ঘরের শান্তি, সে রক্ষা করার বালাই ছিলনা জয়শীলার। ঘর বাহির সব সমান তার চোখে। আপিসে ঢোকবার পর থেকে জয়শীলার মনের গড়ন বাহিরমুখো হয়ে পড়েছে, আড্ডা আড্ডা আর আড্ডা, রাত করে বাড়ি ফেরা, পুরুষবন্ধুদের সঙ্গে মস্করা—সবই তো চেয়ে দেখেছেন সুহাসিনী। কোন্ ছেলে এই মেয়ে নিয়ে ঘর করতে পারে, পারে সুখী হতে! সোনার ছেলে নির্বান, আড্ডা নয়, হই-হই নয়। বাড়ি আর মা ছাড়া কিছু চিনত না। সেই ছেলে এমন বাউণ্ডুলে হবে, কে জানত! জয়শীলার ওপর এতদিন

অভিযোগ গুমরে-গুমরে উঠছিল, এবার বিস্ফোরণ শুরু হল। নির্বানের মাসে মাসে টাকা পাঠানোর নিশ্চিন্তিটুকু যখন সুহাসিনীর রয়েছে তখন আর জয়শীলাকে অত খাতির কিসের। শুধু জয়শীলা কেন, ওর বাপ মা বেঁচে থাকলে তাঁদেরও খাতির করতেন না, অভাবে মামা-মাসি! স্বভাবে ব্যবহারে মেয়েকে পুরুষালি ক'রে গড়ে তুলেছেন, পারেননি সুগৃহিনীর তালিম দিতে! ইংরেজি লিখতে কইতে পারলেই যে মেয়েদের শিক্ষা পূর্ণ হল না, পতিসেবা এবং সন্তানপালনও যে অবশ্যশিক্ষনীয়—এই জ্ঞানটুকু তাঁরা দিতে পারেননি জয়শীলাকে। অমন শিক্ষাকে ধিক! ঝগড়া হতে পারে, অভিমান হতে পারে, সংসার করতে গেলে খিটিমিটি কোথায় না লাগে, দুটো বাসন পাশাপাশি থাকলেই তো শব্দ হয়, তাই বলে' ভুলে যেতে হবে, স্বামী যদি চিঠি না-দেয়, তাহলে হাত পা ছেড়ে নিশ্চিন্তে বসে থাকতে হবে—এমন বৃত্তান্ত ভুভারতে শোনা যায়নি বাছা! চিঠি লেখো, হাত পা ধরো, একটু কান্নাকাটিই করলে, তাতে কি মান খোয়া যায়, মেয়ে! স্বামী ছাড়া আর মেয়েদের কি রইল। তাছাড়া, তোমরা শিক্ষিত ছেলে-মেয়ে, ভাব করে বিয়ে করেছ, বাপমাকে তো দায়ি করতে পারবে না। নিজের ভাগ্যের গিঁট বেঁধেছ নিজেই, নিজের হাতেই ছাড়াতে হবে তাকে। ছেলেটা যে রোগাভোগা রইল, না-ভালো ডাক্তার, না-পথ্যি। আর বাপের স্নেহ না পেলে কি ছেলেপুলে মানুষ হয় বাছা! এসব ভেবেচিন্তে কোথায় সংসারকে গোছগাছ করে' তুলবে, তা না রজতকে নিয়ে সারাক্ষণ গুজগুজ ফিশফিশ।

'অসহ্য-অসহ্য-অসহ্য। বাড়িতে তিষ্ঠোতে পারেনা জয়শীলা। কত আর গঞ্জনার শিলাবৃষ্টি মুখ বুজে সহ্য করবে। সুহাসিনীর যদি ধারণা হয়ে থাকে নির্বানের এই ঘরছাড়ার মূলে জয়শীলাই একমাত্র দায়ি এবং নির্বান যে ফিরতে পারছে না কেবল জয়শীলা এ বাড়িতে আছে বলে', তাহলে তো তার এ বাড়িতে থাকার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এ-বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক নির্বানীতোষকে কেন্দ্র করে, সেটাই যদি মিথ্যা হয় তাহলে আর কিসের দাবিতে থাকবে সে এখানে। একটা মিথ্যাকে জড়িয়ে ধরে নিজের জীবনকে আর মিথ্যা করতে চায়না জয়শীলা। যে-সম্পর্ককে নিজের হাতে ছিন্নভিন্ন করে গেছে নির্বানীতোষ তাকে পূরোপূরি অস্বীকার করাই ভালো। তাহলে হয়তো এই মিথ্যা নির্বানীতোষের স্ত্রীর অভিনয় করে যেতে হবে না তাকে। কোনোমতে স্ত্রী বনে-থাকাই যাদের গৌরবের মাপকাঠি তাদের দলের মেয়ে নয় জয়শীলা। বরং যদি পারত এক কথায় তার বিবাহিত জীবনের সমস্ত

অভিজ্ঞতাকে জলের দাগের মতো মুছে ফেলতে, কপালের সিঁদুর আর সোনাবাঁধানো লোহার সংস্কারকে জয় করতে, নামের শেষে তুলে ফেলতে হাস্যকর চ্যাটার্জি পদবীটাকে! কিন্তু, কুণালের ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে অতবড় দুঃসাহস দেখাতে পারে না জয়শীলা।

আপাতত কিছুই যদি না-পারে সে, তবু ছাড়তে হবে এই বাড়িটাকে। দম বন্ধ হয়ে আসছে তার। মেয়েমানুষের জীবনের এত বড় অপমান আর বেদনা আর নেই।

দেশবন্ধু পার্কের ধারের বাসাটাই ঠিক করল রজত। মাঝবয়েসী একজন বিধবা মেয়েকেও খুঁজে পেতে জোগাড় করে দিল রজত। আপিস থেকে সেদিন ছুটি নিয়েছিল জয়শীলা। রজতও এল বিকেল চারটে নাগাদ। আগের দিন রাত্রেই সুহাসিনীকে জানিয়েছিল জয়শীলা। সব শুনে কিছু বলেননি তিনি। নিজের বলতে জয়শীলার বিশেষ কিছু ছিল না। কয়েকটা জামা কাপড় যা ট্রাঙ্কের মধ্যেই ধরে গেল। হোল্ড অলের মধ্যে বিছানা বালিশ, কুণালের আর ওর কয়েকটা ময়লা জামা কাপড়। স্টোভ একটা সেকেণ্ড হাণ্ড মার্কেট থেকে জোগাড় করেছে রজত। রান্নার জন্যে এনামেলের বাসনকোসন, কাচের গ্লাস, কুঁজো ইত্যাদিও কেনাকেটা হয়েছে। ট্যাক্সি ডাকল রজত। এক-এক করে মালপত্তরগুলিও তুলে দিল গাড়িতে। কুণালের হাত ধরে রজত গিয়ে গাড়িতে বসল। শিবতোষ যাবার সময় কান্নাকাটি করতে পারে এই ভয়ে সুহাসিনী তাকে পরেশনাথ মন্দিরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ট্যাক্সির হর্ন ভেসে এল। জয়শীলা এতক্ষণ ঘরের জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে ছিল স্তব্ধ হয়ে। ঘোরঘোর আচ্ছন্নতা ভেঙে এবার সজাগ হল সে। বাইরে বেরিয়ে এসে সুহাসিনীকে প্রণাম করল। সুহাসিনী সরে গিয়ে অস্ফুটস্বরে কি বললেন, বুঝতে পারল না জয়শীলা। শদর পার হতে গিয়ে যেন পা চলতে চায় না। গাড়ি থেকে ঘনঘন হর্নের শব্দ। পিছন ফিরে তাকাতে গিয়ে জয়শীলার মনে হল : এ বাড়িটা অনেক পুরানো, দেয়ালে হলদে ছোপ পড়েছে। জীবনটা শুধু এক বাড়ি থেকে আর-এক বাড়ি পরিবর্তনের ইতিবৃত্ত। সুবিপুল নিস্তব্ধতা যেন কবরখানা থেকে উঠে এসেছে।

আর দাঁড়াল না জয়শীলা। এঞ্জিনের ধার-করা গতিবেগ তাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলল।

ছোট্ট দোতলার ঘরের দক্ষিণমুখো সংকীর্ণ বারান্দার রেলিঙ ধরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল জয়শীলা। কৃষ্ণচূড়া গাছের মাথায় সূর্যটা লাল হতে-হতে জলে-ধোয়া লাল রঙের মতো পশ্চিমাকাশকে ডুবিয়ে দিয়ে এক-সময় গলে হারিয়ে গেল। কয়েকটা ব্যস্তবাগীশ কাকের গাছের মাথায় জটলা। দেশবন্ধু পার্কে ছেলেদের খেলার জায়গাটা এবার খালি। অন্ধকারকে ব্যঙ্গ করে বাতিগুলো অনেকক্ষণ আলোর চোখ-ইশারায় মেতে উঠেছে। উদ্দাম হাওয়ায় চোখের পাতা জুড়িয়ে আসছে কুণালের। মা আর রজতকাকুর সঙ্গে এতক্ষণ ট্যাক্সিতে আসতে মন্দ লাগেনি। নতুন বাসাটার একোণ ওকোণে বীরদর্পে ঘুরে বেড়িয়েছে। নতুনশেখা ছড়া বলেছে বক-বক করে। তারপর একসময় দক্ষিণধারী বারান্দাটায় ছুটে গিয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অবাক লেগেছে কুণালের। কিন্তু, সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসতেই মনের ভেতরটা চুমরে গেল তার। এখানকার সন্ধ্যাটা বড় নিঃসঙ্গ।

'মা—ও মা—'

স্টোভে দুধ গরম করছিল জয়শীলা। বললে, 'কি রে?'

'বাড়ি চলো।'

কুণালের কথায় চমকে উঠল জয়শীলা। এক মুহূর্ত। তারপর কোনো রকমে নিজের দুর্বল অবস্থাটাকে বিস্রস্ত শাড়ির মতো গুছিয়ে নিয়ে হেসে বললে, 'কেন? এ বাড়ি খারাপ কোথায়?'

'ছাই! ফুলকাকু কই, ঠাকুমা কই? ছাই ছাই বাড়ি।'

জয়শীলা স্টোভের সামনে থমকে স্থির হয়ে গেছে। নিজের সমস্যার সহজ সমাধান করতে গিয়ে জয়শীলা বোঝেনি যে কুণালেরও একটা জগৎ আছে, তার ফুলকাকু আছে, ঠাকুমা আছে। কেমন অসহায় মনে হল নিজেকে। কিন্তু, এছাড়া উপায়ও কি ছিল। শাশুড়িকে বললে হয়তো কুণালকে রাখা যেত তাঁর কাছে। কিন্তু তার মানে, জয়শীলাকেও থাকতে হত ও বাড়িতে। কুণালকে ছেড়ে নতুন বাসায় পা দেওয়ার কথা ভাবতে পারে না সে।

দু'টুকরো পাঁউরুটি সেঁকে নিয়ে দুধের বাটি হাতে জয়শীলা এসে বসল কুণালের কাছে। 'দুধটুকু খেয়ে নে।'

কুণাল অবাধ্য মাথাটা ঝাঁকিয়ে বললে, 'না। আমি খাব না। কিছ্ছু খাব না। আমি ঠাকুমার কাছে যাব।'

জয়শীলা কুণালকে কোলের কাছে টেনে নিল। 'লক্ষ্মীসোনা, খেয়ে ফেলো দুধটুকু। রবিবারে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাব তোমাকে।'

'ন্‌না। সব মিথ্যে কথা তোমাদের। আমি ঠাক্‌মার কাছে যাব।' জেদি ঘোড়ার মতো ঘাড় বেঁকিয়ে রইল কুণাল।

স্টেশনারি টুকিটাকি নিয়ে ফিরল রজত হাতিবাগান বাজার থেকে।

'কী হয়েছে? কী বলছে কুণালবাবু?'

কুণাল সটান এসে হাত ধরল রজতের। 'রজতকাকু, আমাকে ঠাক্‌মার কাছে রেখে এস—'

রজত কী-উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই জয়শীলার গম্ভীর থমথমে মুখের দিকে চেয়ে মূক হয়ে গেল সে। কুণাল যে এ নিয়ে তাকে জ্বালাতন করেছে, বেশ বোঝা যাচ্ছে। সমস্ত পরিবেশকে হাল্‌কা করবার জন্যে কুণালকে কাঁধে তুলে নিল রজত। 'বাড়ি যাবে বৈকি। নিশ্চয় যাবে। আগে খাবারটুকু খেয়ে নাও।'

ছোটোরা এখনো বড়দের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস রাখে, এই ভরসা। কুণাল খাবার খেয়ে নিল।

অপরিচিত পরিবেশে রাত্রি গড়িয়ে আসে।

ক্লান্ত হয়ে এক সময় বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ে কুণাল।

দক্ষিণের বারান্দার দিকে এগিয়ে গেল জয়শীলা। চাঁদ উঠেছে মারহাট্টা ডিচের ওপারে গাছগুলোর মাথায়। পার্কে এখন নিস্তব্ধতা, মাঝে মাঝে ছেঁড়া ছেঁড়া কথা, ভ্রমণার্থিদের ছায়া-শরীর। ফেরিঅলার কণ্ঠস্বর। ঘোমটা-টানা বাতিগুলি অন্ধকারের মৌন হুঁশিয়ার।

বাসা বদলের ধকলে সারা গা জুড়ে অবসাদ নেমেছে জয়শীলার। ঘুম পাচ্ছে। এলোমেলো হাওয়ায় গা-শিরশিরানি।

'কী ভাবছ?'

রজত।

জয়শীলা চোখ ফেরাল না, তার নিঃসাড় শরীরে কোনো ঢেউ নয়, খোঁপার আল্‌গা বাঁধনকে উপহাস করে চোখেমুখে কয়েকটুকরো চুলের ইলিবিলি।

পাশে রজত। তার সারা শরীরে সিগারেটের উগ্র গন্ধ। মাথা ঝিমঝিম করে জয়শীলার। আকাশে একটা তারা খশে পড়ল, আকাশটা একটুও কাঁপল না। কাঁপল না জয়শীলা, স্তব্ধ, স্থির।

কথা বলতে গিয়ে আজ বাধো-বাধো ঠেকে রজতের। জয়শীলার ঘরে কত রাত্রির নির্জনতাকে তারা কথার মুখরতায় উচ্চকিত করে তুলেছে। কিন্তু,

ছোট্ট দোতলার ঘরের দক্ষিণমুখো সংকীর্ণ বারান্দার রেলিঙ ধরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল জয়শীলা। কৃষ্ণচূড়া গাছের মাথায় সূর্যটা লাল হতে-হতে জলে-ধোয়া লাল রঙের মতো পশ্চিমাকাশকে ডুবিয়ে দিয়ে এক-সময় গলে হারিয়ে গেল। কয়েকটা ব্যস্তবাগীশ কাকের গাছের মাথায় জটলা। দেশবন্ধু পার্কে ছেলেদের খেলার জায়গাটা এবার খালি। অন্ধকারকে ব্যঙ্গ করে বাতিগুলো অনেকক্ষণ আলোর চোখ-ইশারায় মেতে উঠেছে। উদ্দাম হাওয়ায় চোখের পাতা জুড়িয়ে আসছে কুণালের। মা আর রজতকাকুর সঙ্গে এতক্ষণ ট্যাক্সিতে আসতে মন্দ লাগেনি। নতুন বাসাটার একোণ ওকোণে বীরদর্পে ঘুরে বেড়িয়েছে। নতুনশেখা ছড়া বলেছে বক-বক করে। তারপর একসময় দক্ষিণধারী বারান্দাটায় ছুটে গিয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অবাক লেগেছে কুণালের। কিন্তু, সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসতেই মনের ভেতরটা চুমরে গেল তার। এখানকার সন্ধ্যাটা বড় নিঃসঙ্গ।

'মা—ও মা—'

স্টোভে দুধ গরম করছিল জয়শীলা। বললে, 'কি রে?'

'বাড়ি চলো।'

কুণালের কথায় চমকে উঠল জয়শীলা। এক মুহূর্ত। তারপর কোনো রকমে নিজের দুর্বল অবস্থাটাকে বিস্রস্ত শাড়ির মতো গুছিয়ে নিয়ে হেসে বললে, 'কেন? এ বাড়ি খারাপ কোথায়?'

'ছাই! ফুলকাকু কই, ঠাকুমা কই? ছাই ছাই বাড়ি।'

জয়শীলা স্টোভের সামনে থমকে স্থির হয়ে গেছে। নিজের সমস্যার সহজ সমাধান করতে গিয়ে জয়শীলা বোঝেনি যে কুণালেরও একটা জগৎ আছে, তার ফুলকাকু আছে, ঠাকুমা আছে। কেমন অসহায় মনে হল নিজেকে। কিন্তু, এছাড়া উপায়ও কি ছিল। শাশুড়িকে বললে হয়তো কুণালকে রাখা যেত তাঁর কাছে। কিন্তু তার মানে, জয়শীলাকেও থাকতে হত ও বাড়িতে। কুণালকে ছেড়ে নতুন বাসায় পা দেওয়ার কথা ভাবতে পারে না সে।

দু'টুকরো পাঁউরুটি সেঁকে নিয়ে দুধের বাটি হাতে জয়শীলা এসে বসল কুণালের কাছে। 'দুধটুকু খেয়ে নে।'

কুণাল অবাধ্য মাথাটা ঝাঁকিয়ে বললে, 'না। আমি খাব না। কিছ্ছু খাব না। আমি ঠাকুমার কাছে যাব।'

জয়শীলা কুণালকে কোলের কাছে টেনে নিল। 'লক্ষ্মীসোনা, খেয়ে ফেলো দুধটুকু। রবিবারে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাব তোমাকে।'

'ন্‌না। সব মিথ্যে কথা তোমাদের। আমি ঠাক্‌মার কাছে যাব।' জেদি ঘোড়ার মতো ঘাড় বেঁকিয়ে রইল কুণাল।

স্টেশনারি টুকিটাকি নিয়ে ফিরল রজত হাতিবাগান বাজার থেকে।

'কী হয়েছে? কী বলছে কুণালবাবু?'

কুণাল সটান এসে হাত ধরল রজতের। 'রজতকাকু, আমাকে ঠাক্‌মার কাছে রেখে এস—'

রজত কী-উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই জয়শীলার গম্ভীর থমথমে মুখের দিকে চেয়ে মূক হয়ে গেল সে। কুণাল যে এ নিয়ে তাকে জ্বালাতন করেছে, বেশ বোঝা যাচ্ছে। সমস্ত পরিবেশকে হাল্‌কা করবার জন্যে কুণালকে কাঁধে তুলে নিল রজত। 'বাড়ি যাবে বৈকি। নিশ্চয় যাবে। আগে খাবারটুকু খেয়ে নাও।'

ছোটোরা এখনো বড়দের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস রাখে, এই ভরসা। কুণাল খাবার খেয়ে নিল।

অপরিচিত পরিবেশে রাত্রি গড়িয়ে আসে।

ক্লান্ত হয়ে এক সময় বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ে কুণাল।

দক্ষিণের বারান্দার দিকে এগিয়ে গেল জয়শীলা। চাঁদ উঠেছে মারহাট্টা ডিচের ওপারে গাছগুলোর মাথায়। পার্কে এখন নিস্তব্ধতা, মাঝে মাঝে ছেঁড়া ছেঁড়া কথা, ভ্রমণার্থিদের ছায়া-শরীর। ফেরিঅলার কণ্ঠস্বর। ঘোমটা-টানা বাতিগুলি অন্ধকারের মৌন হুঁশিয়ার।

বাসা বদলের ধকলে সারা গা জুড়ে অবসাদ নেমেছে জয়শীলার। ঘুম পাচ্ছে। এলোমেলো হাওয়ায় গা-শিরশিরানি।

'কী ভাবছ?'

রজত।

জয়শীলা চোখ ফেরাল না, তার নিঃসাড় শরীরে কোনো ঢেউ নয়, খোঁপার আল্‌গা বাঁধনকে উপহাস করে চোখেমুখে কয়েকটুকরো চুলের ইলিবিলি।

পাশে রজত। তার সারা শরীরে সিগারেটের উগ্র গন্ধ। মাথা ঝিমঝিম করে জয়শীলার। আকাশে একটা তারা খশে পড়ল, আকাশটা একটুও কাঁপল না। কাঁপল না জয়শীলা, স্তব্ধ, স্থির।

কথা বলতে গিয়ে আজ বাধো-বাধো ঠেকে রজতের। জয়শীলার ঘরে কত রাত্রির নির্জনতাকে তারা কথার মুখরতায় উচ্চকিত করে তুলেছে। কিন্তু,

এ-রাত্রির স্বাদ আলাদা। এখানে সময়ের ছেদ নেই, শাসনের তর্জনী নেই, বাঁধ নেই, বন্ধন নেই বলে অনুভূতি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারে না—একটানা একঘেয়ে খালের কালো জলের মতোই তার শান্ত ব্যঞ্জনা।

'জয়শীলা—'

'উঁ ?'

'রাত হল। আমি এবার যাই—'

'আরো একটু থাকো—'

এখন কত রাত ? দশটা। পৃথিবীতে শান্তির প্রলেপ। গ্রোম আর চীনে ঘুমের ঢেউ। দেবপ্রিয় নির্বান। সুহাসিনী এখনো জেগে আছেন। শিবতোষ সন্ধ্যেয় বাড়িতে ফিরে জয়শীলাকে দেখতে না-পেয়ে খুব কেঁদেছে! কুণাল, কুণালের ঠাকুমা, তার ফুলকাকু। আর জয়শীলার সামনে ধোঁয়া-ধোঁয়া শূন্যতা। আরো রাত ক্ষয় হবে, আরো দিন। তারপর ? জীবনের ইতিহাসে কি তারপর আছে!

'আমি এবার যাই—' রজত আবার বললে। কেমন দুর্বল-দুর্বল গলায়। ছায়া-ছায়া অন্ধকারপটে জয়শীলার সম্বুদ্ধ মুখের প্রোফাইল, কপালে হাওয়া-লাগা চুলগুলির খেপামি, উন্নত কপালের নিচে টিকোলো নাক—ওর অস্তিত্বের ওপর চন্দ্রালোকের বিবর্ণিমা প্রত্যক্ষঅতীত কল্পনামেদুর আবেশ ছড়ায়। সারা শরীরে বোবা যন্ত্রণা অনুভব করে রজত, শরীরের দুর্গম অন্তস্তলে অন্ধকূপে বন্দী একটা লোমশ দৈত্য গজরায়। আর সেই সময়ে, জয়শীলাও ফিরে দাঁড়িয়েছে তার দিকে, হয়তো তার চোখের উৎকট প্রদাহেই কিছুক্ষণ ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইল জয়শীলা হঠাৎ আলোর অজস্রতায় চোখ ধাঁধানো দিশাহারা পথিকের মতো। তারপর নরম হাসল সে। হাত ধরল রজতের: 'চলো তোমায় এগিয়ে দিয়ে আসি—' একটা পংগু অথর্ব ইচ্ছা আপন রক্তের মধ্যে পাক খেয়ে খেয়ে খানিকটা বুদ্‌বুদ সৃষ্টি করে নিষ্ফল আক্রোশে ফেটে পড়ল রজতের শরীরে। জয়শীলার হাতের স্পর্শ সাপের নির্মোকের মতো, আর্তিতে ভীরু মনটা কেঁপে ওঠে রজতের। শদর দরজায় আর দাঁড়াল না, পিছন না ফিরে হনহন করে এগিয়ে গেল সে।

বাড়ি ফিরে ঢাকা-দেওয়া রাতের খাবার খেল-কি-খেল না রজত। সারা শরীর জ্বরের মতো বিশ্রী এক অনুভূতিতে গুমগুম করছে তার। ঘরে ঢুকে আলোর বোতাম টিপতেই হঠাৎ সারা ঘর উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আর

সেই আলোয় চোখে পড়ল মেঝের বিছানাতে ছেলেপিলেদের বিবশ নিদ্রাকাতর দৃশ্য। সুষমা শুয়েছে আজ রজতের খাটে। বোধহয় অপেক্ষা করতে-করতে জেগে-থাকার দুঃসহ চেষ্টায় এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছে সে। সুপ্তির মধ্যেও ওর জাগরণের ক্লান্তি ধরা পড়ে। আলুথালু বেশবাস, ভারি কোমরের লোভানি, হাঁটুর উপরে শাড়িটা স্থানচ্যুত হয়ে লেস্‌-দেওয়া পেটিকোটের নীল উঁকি। জরজর অনুভূতিটা সারা শরীর থেকে মস্তিষ্কের কারখানায় দব্‌দব্‌ শুরু করেছে। আলোটা নিবিয়ে দিয়ে খাটের দিকে এগিয়ে গেল রজত।

স্বামীর আলিঙ্গনে ঘুমন্ত শরীরটা সরীসৃপের মতো নড়ে উঠল সুষমার। রজতের পুরুষশরীরটা আজ হঠাৎ তার শীতল দেহটা নিয়ে কী নেশায় মেতে উঠল! জরজর প্রদাহটা তখন চারিয়ে গেছে রজতের সমগ্র অস্তিত্বে। উত্তেজনার খররৌদ্রে প্রখর। সুষমার সঙ্গে পুরানো দাম্পত্য সম্পর্ক আজ প্রকট করতে গিয়ে আশ্চর্য রোমাঞ্চ বোধ করছে রজত। সুষমা না বুঝুক, রজত তো জানে এ-উত্তেজনার আগুন সে বয়ে নিয়ে এসেছে জয়শীলার বাসা থেকে, তাদের বিবাহিত জীবনের নিরুত্তাপ জান্তব প্রবৃত্তিটা যদি আজ উত্তেজনার পুলকে বিকশিত হয়ে ওঠে, ক্ষতি কী!

বালিশে মাথা দিয়ে ঘুম আসেনা জয়শীলার। নিচের তলায় ভাড়াটেদের সংসারটা এবার নিস্তব্ধ। গোটা বাড়ি সারাদিনের ক্লান্তির পর ঝিমোতে আরম্ভ করেছে। নিঃশব্দ। থেকে-থেকে পার্কের ধার থেকে কুলপী বরফের তীক্ষ্ণ চিৎকার আর রসিক ফেরিঅলার বেলফুলের আরজি।

চিন্তার আকাশটা কে উপুড় করে দিয়েছে এই রাত্রে। থৈথৈ চিন্তার শ্রাবণধারায় যেন ভেসে যাবে জয়শীলা। বিভিন্ন সুরের চিন্তাগুলো যেন তালগোল পাকিয়ে বিশ্রী চেঁচাতে সুরু করেছে। বিশ্রী হট্টগোলের মধ্যে কোনো কিছুরই খেই ধরতে পারছে না জয়শীলা। যুদ্ধের সময় কারফ্যুয়ের রাত্রে ট্যাক্সির ভূতুড়ে হেডলাইটের মতো আজ বিদায়ের সময় রজতের চোখের দৃষ্টিটা স্থির হয়ে রয়েছে চোখের পরদায়। পুরুষের চোখের সেই লোভার্ত দৃষ্টি চিনতে কোনো মেয়েরই ভুল হয় না। অন্তরে শিউরে উঠেছিল জয়শীলা। রজত সম্পর্কে ভয় জেগেছে তার। সে-ভয় হয়তো তার নিজেকেও নিয়ে। ভেতরে-ভেতরে তার নিজের শক্তিতেও ভাঙন ধরছে। আর এই ভাঙনের রন্ধ্রপথেই আসে বিপদের জানানি। কী আশ্চর্য, অনেক অপবাদ দশজনে ছড়িয়েছে তার আর রজতের সম্পর্কে। কিন্তু,

অপবাদটা সত্যিকার যাচাই করবার উৎসাহ জাগেনি, কারণ লোকনিন্দাকে উপহাস করবার ঝোঁকটাই তখন তীব্র ছিল। আজ রজতের চোখের প্রখর দীপ্তিতে এক লহমায় নিজের অন্তরাকাশটাও যেন পড়ে ফেলতে পারল জয়শীলা। রজতের চোখই জানিয়ে দিয়েছে, ওর চোখে জয়শীলা মেয়ে মাত্র। এতদিনকার বন্ধুত্বের সম্পর্কটার গায়ে এত চড়া রঙ দেওয়া ছিল, আসল রঙটাই হারিয়ে গিয়েছিল। মেয়ে-পুরুষে বন্ধুত্ব সম্ভব সমতার ভিত্তিতে। রজতের সঙ্গে চিন্তায় ধারণায় স্বভাবে বুদ্ধিতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যে তার সঙ্গে ওর মিল নেই, সে কথা জানে জয়শীলা। তবু, তারা একত্রিত হতে পেরেছিল সহানুভূতির মধ্যে। জীবনে একটি বস্তুরই অভাব ছিল জয়শীলার—পুরুষের সহানুভূতির। দেবপ্রিয় নির্বানের কাছে তা পায়নি। অথচ এই অভাববোধটুকু রজত পেরেছিল মিটোতে। জীবনে আলোর পেছনে যে এত অন্ধকার, তা জানা ছিল না তার। সহানুভূতির পেছনে যে এত লোভের ক্লেদ স্তরে স্তরে জমা থাকতে পারে, আগে ভাবা উচিত ছিল জয়শীলার। তার নিঃসঙ্গ অবস্থার সুযোগ নেবে রজত, এই যদি ভেবে থাকে সে, এর চেয়ে আর বোকামি কি আছে! আপিসে দশজনে বাড়িতে শাশুড়ি যে অপবাদে মুখর হয়ে উঠেছেন, সেটাই কি সত্যি হবে! সবাই কি জানবে আবার সুযোগ নেবার ফন্দিতেই বাড়ি ছেড়েছে জয়শীলা! না, কখনোই নয়। স্বাধীনতা মানে যে স্বেচ্ছাচার নয় এই কথাই জীবন দিয়ে জানিয়ে দেবে সে। রজত যদি সীমা লংঘন করতে চায়, তার সঙ্গে শেষ বোঝাপাড়া করতে হবে বৈকি।

সারা সংসারটা তার কাছে রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। সে-সংগ্রাম একক-সত্তার, আত্মচৈতন্যের, আত্মবিস্তারের। কুণালের ঘুমন্ত শরীরকে সজোরে আঁকড়ে ধরল জয়শীলা।

পার্কের গাছেগাছে পাখিদের কিচিরমিচির ডাকে ঘুম ভাঙল জয়শীলার। সারারাত্রি ভীষণ অস্বস্তি আর অনিদ্রার মধ্যে কেটেছে। ভোরের দিকে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। রোদে ভেসে গেছে বারান্দা, জানালার খড়খড়ি গলে ঘরের মেঝেতে রোদের ছেঁড়া ছেঁড়া নকশা। লক্ষ্মী সাত-সকালে উঠে বাসি কাজ চুকিয়ে উনুন ধরিয়ে চায়ের জল চাপিয়ে দিয়েছে। খুব কাজের মেয়েটা। জয়শীলা এবার উঠল। কুণালের ঘুম ভাঙেনি। বাথরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করল জয়শীলা। সারা-শরীরে কেমন জ্বালা। চোখেমুখে গ্রীবায় জল ছিটিয়েও যেন শান্তি নেই। থেকে-থেকে রজতের

উগ্র চোখের দৃষ্টিটাই বিভীষিকার মতো ভেসে উঠেছে চোখের সামনে। ঘুমঘুম আচ্ছন্নতার মধ্যেও যেন রেহাই দেয়নি তাকে। নির্জ্ঞান মনেও তোলপাড় চলেছে অচেতন অবস্থায়। অথচ সজ্ঞানে যে ভয়টাকে কাটাতে বিন্দুমাত্র ভয় পায়নি সে, নির্জ্ঞান অবস্থায় সেই বস্তুটাই এমন ভীতিকর হয়ে উঠল কেন, বুঝতে পারে না জয়শীলা। যেন মনে হয় অচেতন মুহূর্তে এই ভয়কে নাড়াচাড়া করতে রোমাঞ্চ অনুভব করেছে সে। কেন এমন হয়? সজাগ পাহারার আড়ালে গোপন মানসিকতায় কী আরো এমন ক্রিয়া চলে, যার উপরে মানুষের হাত নেই! এতদিন দেবপ্রিয়, নির্বানকে নিয়েই তার জীবনের সমস্যা আবর্তিত হচ্ছিল, রজতকে কেন্দ্র করে যে অভাবিত একটা নতুন সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে, আগে বুঝতে পারেনি সে। নাকি জীবনটাই এই, এক সমস্যার নিবোনো ধোঁয়া বন্ধ করতে গিয়ে আর এক জায়গায় আগুন জ্বলে উঠে! রজত সম্পর্কে সমস্ত বিরূপ সমালোচনা, মেয়েদের সম্পর্কে তার স্থূল মনোভাবের পুরানো বিবরণটা যেন নতুন করে মনে পড়ল জয়শীলার। মেয়েদের সম্পর্কে রজতের যে সত্যিসত্যি শ্রদ্ধার অভাব আছে, এ-ব্যাপারটা এতদিন বিশ্বাস করবার হেতু পায়নি সে। হয়তো রজতের এই আসল চেহারা! এতদিন হয়তো রজত তার সঙ্গে শ্রদ্ধা-শ্রদ্ধা খেলা খেলেছে শুধু তাকে আরো বেশি ওর ওপর নির্ভরশীল করে তুলতে। কিন্তু, কী চায় রজত জয়শীলার মতো মেয়ের কাছে। দেবপ্রিয়ের কাছে বড় ছিল জয়শীলার মন। নির্বান দাম্পত্য জীবনে মনকে অপ্রধান ভেবেছে, কিন্তু শেষকালে তার অন্ধমনই তাকে তিলে তিলে দগ্ধে মারল। রজত চায় তার দেহ। মেয়েদের কাছে তার নিজের যে-দেহটা শুধু মনের ভাণ্ডার বলে মনে হয়, সেই মনহীন দেহটাই যে পুরুষের চোখে এত বড় করে দেখা দিতে পারে, এইটে ভেবেই বিস্ময় হয় জয়শীলার। অপণা মাংসে হরিণা বৈরী। বাসি জামাকাপড় ছাড়তে-ছাড়তে অপলকে নিজের দেহের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে যায় জয়শীলা। বাথরুমে কাপড় ছাড়বার আগে কোনোদিন মনে থাকে না তার, সে একটি মেয়ে, যার দেহ আছে, যে-দেহ ইন্ধন জোগায়, পোড়ে, পোড়ায়। কিন্তু, রজত যদি তার আগুনে পোড়ে, জয়শীলা কি করতে পারে। এতদিন জয়শীলার সঙ্গে মিশে সে যদি তাকে না চিনতে পেরে থাকে, দোষ তার। রজতের সঙ্গে আলাপটা ঘরোয়া আবেষ্টনীতে টেনে এনেছে বলেই সে যদি তার অধিকারের মাত্রা ছাড়াতে চায়, সে-

নির্বুদ্ধিতা তাকেই দাহ করবে। শরীর দিয়ে কোনোদিন জয়শীলা তার চোখে মোহ ছড়াতে চায়নি—তার মেলামেশায় সহজতা ছিল, রঙ ছিল না।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে চা করতে বসেও চিন্তাটা তার মস্তিষ্ক থেকে কিছুতেই দূর হতে চাইল না। কুণালকে টোস্ট আর দুধ এগিয়ে দিয়েও নিশ্চিন্ত হতে পারল না সে। বাজারের পয়সা নিয়ে লক্ষ্মী বেরিয়ে গেল, ফিরেও এল একসময়, তবু নিশ্চল বসে রইল জয়শীলা। তারপর হঠাৎ একসময় ধড়মড় করে উঠল সে, হাসল, ছি ছি ছি, এমন একটা বাজে ব্যাপার নিয়ে এতক্ষণ সে রোমন্থন করেছে ভাবতেই লজ্জা হয় তার।

সেদিন আপিসে গেল না জয়শীলা। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর রোদ কমে আসতে রিকশা করে কুণালকে নিয়ে চলে গেল স্নেহলতার ওখানে।

ফিরল খাওয়া দাওয়া সেরে অনেক রাত্রি করে।

শুনল রজত অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে চলে গেছে।

হাসল জয়শীলা। এই তো চেয়েছিল সে। রজত যদি তার মনোভাব বুঝতে পারে, আর এ-বাসায়,না আসে তাহলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে সে।

শোবার আগে কাগজ নিয়ে রজতকে লিখতে বসে অনেক কাটাকুটি করে তারপর কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আলো নিবিয়ে বিছানায় উঠে এল। থাক। রজতকে আরো কয়েকদিন পরে লেখা যাবে।

দিন কাটল।

একটি হপ্তাই ঘুরে গেল এর পর।

সেদিন আপিসের করিডোরে পা দিতেই হুড়মুড় করে কোথা থেকে ছুটে এসে নির্ঝরিণী তাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল আড়ালে। চোখ মুখ জ্বলজ্বল, উর্ধ্বশ্বাসে ফিস ফিস করে বললে, 'হ্যাঁরে, যা শুনছি সত্যি নাকি ?'

নির্ঝরিণী কী বলবে এ যেন জানা ছিল জয়শীলার। তবু মুখ গম্ভীর করে উত্তর দিল : 'কি শুনেছ ?'

'আহা, ন্যাকা সাজছিস কেন ভাই। রজতের জন্যে তুই নাকি শ্বশুরবাড়ি

ছেড়েছিস। রজত নাকি তোকে আলাদা বাসা করে দিয়েছে। মাইরি বল না ভাই?'

জয়শীলা শাদাটে পাণ্ডাশে মুখে দাঁড়িয়ে রইল। মূক। জয়শীলার মতো তেজী মেয়েও আচমকা নির্ঝরিণীর মন্তব্য শুনে নার্ভাস বোধ না করে পারল না। কিন্তু, কিছুক্ষণ মাত্র। চাপা রাগটা সামলে নিয়ে ধীর গলায় শুধু বললে, 'পরের দরজায় আড়ি না পেতে, এবার বিয়ে করবার চেষ্টা করো নির্ঝর, বয়েস তো হল—' বলে আর দাঁড়াল না, তরতর করে এগিয়ে গেল।

নিজের টেবিলে চুপ করে বসে অনেকক্ষণ দম নিল সে। যেন বোঝবার চেষ্টা করল আপিস সমাজের নাড়ীকে। একটা ব্যক্তিগত ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে সারা আপিসের এত মাথাব্যথা হতে পারে, ভাবতেই আশ্চর্য লাগছে। আপিসটা যেন তার অবৈতনিক গার্জেন হয়ে বসতে চায়, শস্তা মোড়লির অহমিকা। দাঁত দিয়ে অধরোষ্ঠ কামড়ে ধরল জয়শীলা। কিছু করবার মতো একটা জেদ মরিয়া হয়ে উঠছে তার মধ্যে। না। মাথা ঝাঁকালো সে। ভেবেছিল রজতকে চিঠি লিখে বাসায় আসতে বারণ করে দেবে। কিন্তু, তা মিথ্যে। তার হার—প্রবল মিথ্যা-শক্তির কাছে নতি। আসুক, আসুক রজত—মিথ্যাকে সত্য বলে প্রতিপন্ন করতে রজতকে এখন ফেরানো চলবে না। ওরা কত অপবাদের বোঝা মাথায় চাপাতে পারে, তাই দেখবে জয়শীলা।

সারাদিন আপিসে টেবিল আঁকড়ে রইল সে। কাজের তাড়ায় নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে চাইল। তারপর মাথা তুলে যখন তাকাল পৌনে পাঁচটা উৎরে গেছে ঘড়িতে। কাগজপত্তরগুলি তুলে রেখে এবার উঠে পড়ল জয়শীলা। চায়ের তেষ্টা পেয়েছে। এখন ক্যানটিনে চা পাওয়া যাবে না। কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে বেরোলো আপিস থেকে।

খোলামেলা আকাশের নিচে হাঁটতে-হাঁটতে অকস্মাৎ মাথার ভেতরটা শূন্য নিরেট মনে হচ্ছে জয়শীলার। আর অসম্ভব হাল্কা বোধ হচ্ছে নিজেকে। দায়-দায়িত্ব চুকিয়ে হঠাৎ যেন সাংখ্যোক্ত নিরাসক্ত পুরুষের মতো মনে হচ্ছে নিজেকে। গভর্ণমেণ্ট প্লেসের পাশ দিয়ে আপিসফেরত মানুষেরা ছুটেছে, কাউন্সিল হাউস স্ট্রিট বেয়ে মোটরের স্রোত, দিগন্তে বেলাশেষের রোদের সোনা, আর অফুরন্ত হাওয়ার লাস্য।

ভিড় ঠেলে ভিড় হয়ে কখন ট্র্যামে উঠল, কখন নামল, খেয়াল নেই জয়শীলার। চায়ের তেষ্টাও কখন ভুলে গেছে। বাসায় ফিরে দেখল লক্ষ্মী

এখনো ফেরেনি। কুণালকে নিয়ে দেশবন্ধু পার্কেই আছে বোধহয়। তারপর কুণালও ফিরে এল একসময়, লক্ষ্মী চায়ের জল চাপাল।

'মা—ওমা—'

'কি রে?'

'আমাকে ইয়ো-ইয়ো কিনে দেবে?'

'ইয়ো-ইয়ো কি আবার?'

'সেইযে চাকতির সঙ্গে সুতো বাঁধা থাকে—তুমি কিচ্ছু জানো না—' কুণাল গাল ফুলোলো।

'আচ্ছা আচ্ছা দেবো কিনে।'

'ছুটো কিনবে কিন্তু। একটা ফুলকাকুর জন্যে। মা—ওমা—'

'কী বলবি, বল্ না?'

'আমরা কবে বাড়ি যাব?'

'কেন? এটা কি বাড়ি নয়?'

মুখ গোঁজ করে রইল কুণাল।

'আচ্ছা বল্‌তো ঃ কার জন্যে তোর বেশি মন খারাপ করে?'

'ঠাকুমা...'

'আমাকে ছেড়ে তুই থাকতে পারবি ঠাকমার সঙ্গে?'

'পারব।'

'মন খারাপ করবে না?'

'বারে! কেন?'

'আমাকে দেখতে পাবিনে যে!'

'ধ্যাৎ। তুমি আপিস থেকে ফিরলেই তো দেখতে পাব।' বুদ্ধিমানের গলায় বললে কুণাল।

জয়শীলা চুপ করে রইল।

সন্ধ্যার কালো যবনিকা নেমেছে পৃথিবীর পরে। এতক্ষণকার হাল্‌কা পল্‌কা ভাবটা কেমন ভারি আর গুটিয়ে আসছে মনের ভেতরে। তরল চিন্তাগুলো যেন সন্ধ্যা-রাত্রির বরফে জমে শক্ত হয়ে যাচ্ছে। নির্ঝরিণীর কৌতুক-চকচকে মুখ ভাসছে চোখের সামনে। শুধু কি নির্ঝরিণী, সমস্ত আপিসটাই বোধহয় কৌতুকতেলতেলে হয়ে উঠেছে। বেঁচে থাকার দায়ে যেখানে মানুষের পরিশ্রম বিকিয়ে যাচ্ছে, সেখানে অপরের জন্যে এত কৌতূহল উদ্বৃত থাকে কি করে। আশ্চর্য মানুষ, আশ্চর্যতর তার মন।

সিঁড়িতে জুতোর আওয়াজ।

রজত।

তার মনের এই অবস্থায় রজতকে পেয়ে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল জয়শীলা।

'কি, কালকে কোথায় গিয়েছিলে?' রজত হাসল।

'মাসিমার ওখানে। বোসো।'

রজতকে খারাপ লাগছে না। বাড়ি থেকে স্নান সেরে ছিমছাম হয়ে এসেছে। হাতের সিগারেটের গন্ধটাও কেমন মিষ্টি লাগছে।

চা এল।

পার্কের ধারে বারান্দার দিকে উঠে এল তারা। মারহাট্টা ডিচের ওপর তেমনি এক টুকরো চাঁদ ঝুলে রয়েছে। জ্যোৎস্নার আবছা আলোয় গাছের মাথাগুলি রহস্যময়। পার্কের মধ্যে কে যেন বেহাগসুরে বাঁশি বাজাচ্ছে।

'তোমার পরিবেশটুকু সতিই কাব্যিক।' বললে রজত।

জয়শীলা হাসল। 'হ্যাঁ। কাব্যামোদীর কাছে। আমাদের মতো কেরানি-মেয়েদের কাছে কাব্য বড় ঘেঁসে না।'

রজত কবির গলায় বললে, 'পৃথিবীর কাব্য কোনোদিন ফুরোবে না। চাঁদ যখন তার স্নিগ্ধ কিরণ বর্ষণ করে তখন কে কেরানি আর কে মজুর তার বিচার করে না।'

'দোহাই রজত, আর কাব্য নয়। যদি কিছু বলার না থাকে বরং চুপ করে থাকো...' জয়শীলার গলা ক্লান্ত শোনাল।

রজত হাসল। 'প্রয়োজনের কথা ফুরিয়ে গেলে তো কাব্যের কথাই আসবে জয়শীলা। কিন্তু, কী হয়েছে তোমার বলো তো? কাব্যকে এড়াতে গিয়ে তুমি নিজেই যে মৌনকবি হয়ে পড়ছ? আচ্ছাঃ তুমি কবিতা লিখেছ কোনোদিন।'

'তুমি চুপ করবে!' হঠাৎ কেমন বেসুরো আর কর্কশ শোনাল জয়শীলার কণ্ঠস্বর।

বিস্মিত হবার পালা রজতের। 'কী হয়েছে তোমার?'

'কিছু একটা হতেই হবে এমন কোনো কথা আছে।' জয়শীলা থমথমেঃ 'আচ্ছা কই, তোমার বাড়িতে তো নিয়ে গেলে না একদিন।'

জয়শীলা কথার মোড় ঘোরাতে চায় বুঝতে পারল রজত, তাই চট করে কোনো উত্তর না-দিয়ে সিগারেট ধরাল সে।

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে রাত্রি নামছে। পার্কে ঝোপঝাড়ের মধ্যে মুঠোমুঠো আগুন ছড়িয়ে খেলা করছে জোনাকিরা। ঝিঁঝির ব্যাগপাইপ।

পাশাপাশি নিশ্চুপ কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ওরা। কিন্তু, নীরবতাও যে এত অসহ্য, কে জানত। কথা বলে মন হাল্কা হয়, মৌনমুখ মস্তিষ্ককে আরো সবাক করে তোলে। এই বাসায় আসার পর থেকে রজতের মস্তিষ্কের আমূল সংস্কারটাই কেমন বদলে গেছে। জয়শীলার সঙ্গে আর তেমন সহজ সুরে কথা বলতে পারে না। কেমন অস্বাচ্ছন্দ্য আর অস্বস্তি। একটা ভূতুড়ে আমোদ জড়িয়ে থাকে তাকে সব সময়। দিনের পর দিন জয়শীলার সমগ্র অস্তিত্বটা কেমন চেতনায় বাতাস করতে থাকে, উড়ু উড়ু হযবরল হয়ে পড়ে সমস্ত সংজ্ঞা। তার বাড়ির নড়বড়ে জানালার পাল্লার মতো হাওয়ায় ছটফট করতে থাকে মনের ইচ্ছাগুলি।

হঠাৎ তার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে জয়শীলা বললে, 'আপিসে ওরা কি কানাকানি করছে, শুনেছ তো?'

'শুনেছি।' রজত বললে।

'এর কোনো জবাব দেওয়া যায় না? চুপ করে সয়ে যেতে হবে।' জয়শীলা আবেগ-থরথর।

'তুমি খুব চিন্তিত হয়েছ দেখছি।' রজত হাসল।

'চিন্তিত? মোটেই না।' জয়শীলা হাত রাখল রজতের মনিবন্ধে। হাসল। 'সময়-সময় এত বিচ্ছিরি লাগে...'

'ধুলোর ভয়ে ঘরের জানালা বন্ধ করে রাখলে যে সমস্ত বাড়িটাই অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়ে জয়শীলা।'

জয়শীলা চুপ।

রজত আবার বললে, 'কিন্তু, কতদিন এইভাবে কাটাবে। একটা কিছু সিদ্ধান্তে তো আসা দরকার।'

জয়শীলা বিস্ময়-বিহ্বল অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল রজতের মুখের দিকে। তারপর হাসল। বললে, 'জীবন কি একটা অংক যে তাকে সিদ্ধান্তে পৌঁছতেই হবে। তাছাড়া জীবনের কোনো সিদ্ধান্ত নেই রজত। পারো তুমি পথ দেখাতে?'

রজত বললে, 'আমার দেখানো পথ তোমার পছন্দ হবে কেন, জয়শীলা। জীবন তোমার, তার পথও তোমাকে খুঁজে নিতে হবে।'

'তবু...তোমার কি প্রস্তাব?'

'আমার কোনো প্রস্তাব নেই।'

'তবে বুঝতেই পারছ, সিদ্ধান্ত আমার হাতে নেই। নির্বান না ফিরে এলে—'

'ওর ফেরার আশা তুমি করো?'

'করি বৈকি। করি কুণালের কথা ভেবে। আগে এত ভেবে দেখিনি। এখন দেখছি কুণালের দায়িত্বের বোঝা আমার কাছে কম নয়।'

'কিন্তু, কুণালের দায়িত্বের কথা ছেড়ে দিলাম। তোমার কথা ভেবে দেখেছ।'

জয়শীলা হাসল। 'আমার কথা! সে তো সারাক্ষণই ভাবছি।'

রজত আবার সিগারেট ধরাল। তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে চিন্তিত গলায় বললে, 'তোমার কি মনে হয়ঃ জীবন সংশোধনের অপেক্ষা রাখেনা?'

'কী জানি।'

'আমার মনে হয় সংশোধনের অবকাশ আছে। জীবনকে নতুন করে গড়ে তোলো।'

'আমার জীবনের ওপর দিয়ে আটাশটা ঋতু পার হয়ে গেছে, রজত...'

'আর আটাশটা ঋতু যাতে এইভাবে ক্ষয় না হয়ে যায়, তাই কি তোমার দেখা উচিত নয়?'

'চুপ করো, চুপ করো রজত।'

'না। চুপ করব না। নির্বানীতোষের জন্যে তোমার ইহকাল পরকাল সব গেছে একথা ভাববার মতো বোকামি আর কিছু নেই। আমি বলছি, কিছুই তোমার যায়নি, তুমি আবার সব পেতে পারো, স—ব...'

'চুপ করো। তোমার পায়ে পড়ি তুমি আজ যাও, যাও রজত—' টলতে টলতে ছুটে বেরিয়ে গেল জয়শীলা।

ঝড় চলে গেলেও যেমন তার গন্ধ রেখে যায় মাটিতে তেমনি রজত চলে যাবার পরও দুর্বোধ্য মন্ত্রের মতো তার কথাগুলো তোলপাড় করতে লাগল রক্তে। যে নিষ্ফল চিন্তার ধিকিধিকি আগুনে নিজেই জ্বলে খাক হয়ে যাচ্ছে সেই আগুনকেই কেন হঠাৎ হাওয়া দিয়ে প্রজ্বলন্ত করে দিল রজত! নিছক বর্তমানেই বেঁচে থাকতে চায় সে, যে-ভবিষ্যত অন্ধকার শূন্য নিরর্থক তার কথা ভেবে কি হবে। কিন্তু, কি ইংগিত করে গেল রজত, কোন্ নতুন ভবিষ্যতের চেহারা সে তুলে ধরল তার চোখের সামনে।

যা গেছে, যা হারিয়ে গেছে জীবনের রুদ্রাক্ষমালা থেকে, তা আবার কি করে পাওয়া যাবে, কি ক'রে গাঁথা হবে ছিন্নসূত্র। রজত একদিন প্রশ্ন করেছিল: পৃথিবীতে একজনের স্থান আরো একজন নিতে পারে কিনা! মনে আছে, জয়শীলা উত্তর দিয়েছিল, পারে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে পুরোপরি পারে না। একজনের বদলে আর একজন স্থান নিতে পারে, কিন্তু ঠিক সে স্থানটিতে নয়, অন্যখানে। দেবপ্রিয়ের শূন্যস্থান নির্বান নিতে পারেনি—তাদের প্রকৃতি আলাদা, চরিত্র আলাদা। নির্বানের পরেও যদি অন্য ব্যক্তি তার জীবনে আসে সে নির্বানকে স্থানচ্যুত করে আসবে না, তার অস্তিত্ব অন্য অর্থ অন্য রূপ নিয়ে আসবে। কিন্তু কী করে' তা সম্ভব। জীবনের এতটা পথ আবেগের প্রবল জোয়ারে ভেসে এসে এখন যেন ঝিমুনি আসছে তার, দম ফুরিয়ে আসছে। তার জীবনে দুই প্রতিপক্ষ ছিল—মামাবাবু আর দেবপ্রিয়। মামাবাবু মারা গিয়ে জয়শীলার কেরিয়ার গঠনের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে অর্থহীন করে গেছেন। যে জেদের বশে দেবপ্রিয়কে প্রাণপণে অস্বীকার করতে গিয়ে নির্বানকে আঁকড়ে ধরে আনন্দিতজীবনে ভাসতে চেয়েছিল সে, সেখানেও হার হয়েছে জয়শীলার। এখন তার এই জীবন সম্পর্কে কোথাও কারো কাছে জবাবদিহি করবার কিছু নেই। এ-জীবন তার একার, নিজস্ব। কিন্তু, জীবনের ওপর নিজস্ব অধিকার এসেও তো স্বচ্ছন্দ হতে পারছে না সে। না পারছে ভাঙতে, না গড়তে। দু'পা হাঁটতে চাইলেও তিন পা পিছিয়ে আসছে। আজ বেশ বুঝতে পারছে জয়শীলা: একা থাকলেই জীবনটা সত্যি স্বাধীন হয় না। দশজনের বন্ধনের মধ্যেই সত্যিকার মুক্তির আনন্দ। বনস্পতি থাকে একাকী তার মাথা তুলে আপন স্পর্ধায়, কিন্তু অসংখ্য শেকড়ের সঙ্গে তার মূল থাকে জড়িয়ে।

তবু, নির্বানীতোষ যদি আর ফিরে না আসে, ছটা বছর তো পুরতে চলল, তাহলে সে কি করবে। নির্বান এলেও অবশ্য পুরানো সমস্যা থেকে যাচ্ছে। থাকুক। কুণাল সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারত সে। কুণালের মা হয়েও তার বাপের দাবি তো সে মেটাতে পারে না।

সকালে ঘুম ভাঙল এক অদ্ভুত অনুভূতির মধ্যে। রাত্রির গ্লানি বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নেই। শরীর আর মন ঝরঝরে লাগছে। রাত্রির ক্ষয়পাওয়া চিন্তাগুলো মনে পড়তেই হাসি পাচ্ছে জয়শীলার। জীবনে এত ভয় পাবার কি আছে। পায়ে পায়ে নিজের ভাগ্যকে নিজেই গড়েছে সে। এখন ভেঙে পড়লে তো চলবে না, নিজের পায়ে ভর দিয়ে এগোতে হবে।

সময় মতো আপিসে গেল, ফিরলও সময় মতো।

কুণালকে নিয়ে পড়তে বসল। হাতের লেখা শুদ্ধ করে' দিল। তারপর রজত এল যথারীতি। আজ আর গতদিনের কথা ভেবে রজতের সামনে দাঁড়াতে আর অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করল না জয়শীলা। রজত তো সবই জানে, সবই জেনেছে যখন তখন আর সংকোচ করার কি আছে। কুণালকে রাতের খাবার খাইয়ে দিয়ে দুজনে এসে বসল পার্কের ধারের বারান্দার ধারে। আজ আকাশ মেঘে-মেঘে মসীমাখা। সমস্ত পৃথিবী অন্ধকারের পুরু কম্বল মুড়ে মূর্ছাহত। পার্কের গায়ে আলোগুলো অনর্থক অন্ধকারকে দূর করবার শপথে নিজেদের আরো হাস্যকর করে তুলেছে। হাওয়া রুদ্ধ, গাছের পাতা নড়ছে না। থমথমে গুমোট চারিধারে।

রজত আজ সজ্জিত সংযত, তদুপরি গুমোট আবহাওয়া তাকে একেবারে অসহায়, মূক করে' দেয়। নিঃশব্দে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে চলে সে।

জয়শীলা হেসে বললে, 'আজকাল তুমি যেন কেমন বদলে যাচ্ছ, রজত।'

রজত সিগারেট ধরিয়ে বললে, 'বদলেছি কি আমি একাই। তুমি বদলাওনি।'

'আমি! কই, কে বললে।'

'তোমার চোখ বলে, মুখ বলে—'

'এটা তোমার বানানো।' জয়শীলা হাসল। 'তুমি আমাকে বদলানো দেখতে চাও তাই।'

রজত উদাস গলায় বললে, 'হবে।'

নিঃশব্দতা।

একটু থেমে জয়শীলা বললে, 'আমরা শুধু বন্ধু তাই না?'

রজত রুদ্ধ নিশ্বাসে বললে, 'হঠাৎ এ-প্রশ্ন কেন জয়শীলা।'

'কী জানি। মাঝে-মাঝে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে।'

'শুধু কুতূহল? আর কিছু নয়?'

'আর কি হতে পারে?' জয়শীলা শুকনো হাসল।

'কিন্তু…' রজত চিন্তাটা গুছিয়ে নেবার জন্যে অথবা সিগারেটে টান দেবার প্রয়োজনে কিছুক্ষণ চুপ করে' রইল। তারপর বললে, 'কোনে কিছু হতে পারাটাই জীবনে আসল নয়, হাত-চাওয়াটাই খাঁটি।'

'তোমার হেঁয়ালি বোঝা আমার পক্ষে সহজ নয়…'

'সহজ কথা যখন সহজ করে' বলতে পারিনে তখন হেঁয়ালি ছাড়া উপায় কি!'

শুকনো পাতার ওপর দিয়ে হেঁটে গেলে যেমন শব্দ হয় তেমনি একটা সরসরানি জয়শীলার রক্তে। বললে, 'তুমি একটু বোসো, দেখি ও রান্নার কতদূর কি করল—'

রজত নীরবে সিগারেট টানতে লাগল।

রান্নাঘরে নয়, ভেতরের বারান্দার অন্ধকার কোণে রেলিঙ ধরে দিগন্তের দিকে দৃষ্টি রেখে স্থির দাঁড়িয়ে রইল জয়শীলা। রজতের দিক থেকে তার জীবনে যে কোনো বিপদ আসতে পারে, ভাবেনি জয়শীলা। বিপদ রজতের নিকট নয়, বিপদ তার নিজের মধ্যে। নিজের অদৃষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ করতে-করতে কখন ক্লান্ত তনুমন গোপন আশ্রয় খুঁজেছিল রজতের বাহুমূলে, বুঝতে পারেনি। বন্ধুত্বের শক্ত বর্ম দিয়ে নিজেকে বেঁধে রেখেছিল সে, কিন্তু তার মধ্যেও যে ফাটল থাকতে পারে, কল্পনা করা যায়নি। তবু, কী আশ্চর্য, রজতের প্রতি তার সত্যিকার আন্তরিক কোনো প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। যে-মন ভালোবাসে সে-মন কবে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। রজতকে সে ভালোবাসেনা, তার অস্তিত্ব তার শরীরে রোমাঞ্চ সৃষ্টি করে না। না-কুহেলি, না-মেদুরতা। তার সঙ্গে সম্বন্ধের যোগসূত্রটা এত শক্ত কঠিন ডাঙায় বাঁধা, এত স্পষ্ট, এত নিরাবরণ যে গানিতিকের মন নিয়ে সমস্ত কিছু ভাবতে পারে জয়শীলা। কেন এমন হল। এর চেয়ে যদি রজতের প্রেমে পড়ত সে, তাহলে এমন ভোঁতা অনুভূতি হতনা তার। এমন স্থূলত্বের বোঝা তাকে উৎপীড়িত করত না। রজত কি দিতে পারে তাকে। সে সংসারী মানুষ—তার স্ত্রী-পুত্র—তাদের সব দিয়ে যে উচ্ছিষ্ট রইবে তাতে জীবনের দাবি মেটে না। আর সত্যি-সত্যি কি রজত তাকে ভালোবাসে, যে-ভালোবাসার চরিতার্থতা নেই, নেই সার্থকতা—তা নিয়ে জয়শীলার কি হবে। পারে রজত তার জন্যে সংসার ছাড়তে যেমন করে সে ছেড়েছে। কিছু পেতে হলে কিছু ছাড়তে হবে। জোড়াতালি দিয়ে জীবনে বাঁচা যায়না। না। কিছুতেই না। রজতকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। মন দৃঢ় করে জয়শীলা রান্নাঘরে গেল।

রজত দাঁড়িয়েছিল পার্কের দিকে চোখ রেখে। টিপটিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল কিছুক্ষণ আগে থেকে, এবার ঝমঝম করে বৃষ্টির আওয়াজ শুরু হল। এতক্ষণকার গুমোট জ্বালার পর ক্ষুব্ধ আকাশ যেন ভেঙে পড়ল। জলের ছাঁট আসছিল বারান্দায়, পায়ের কাছে, ভিজছে পায়ের পাতা। রজত সরে দাঁড়াল না। ভিজবে, আরো ভিজবে সে, ভিজে-ভিজে

নিজেকে শীতার্ত ক্লান্ত করে তুলবে। অসময়ের বৃষ্টির গন্ধ ভালো লাগছিল রজতের।

'একী! ভিজে যাচ্ছ যে তুমি।' জয়শীলা বারন্দায় পা দিতে গিয়ে পিছিয়ে এল।

হঠাৎ কড়কড় করে বাজ ডেকে উঠল। চমকে ওঠে চিৎকার করতে যাচ্ছিল জয়শীলা, কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুল না তার, এতক্ষণকার হিসেব-করা মনের দৃঢ়তা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, বিদ্যুতাভাসে শাদা পাঙাশে মুখের চেহারা, থরথরিয়ে উঠল সমস্ত শরীরটা, ঠোঁট থেকে শুরু করে একটা অনল-প্রদাহ ছড়িয়ে পড়ে রক্তে।

বৃষ্টি থেমে গেলে, রজত চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ নিথর প্রস্তরের মতো বসে রইল জয়শীলা। আতসবাজির মতো হঠাৎ জলে ওঠে ছাই হয়ে গেল মনের জগতটা। একটা অর্থহীন ধূসর অনুভূতি। খোলা প্রান্তরে দাঁড়িয়ে ঝড় আসবার আগে যেমন একটা ভয় পাকে-পাকে জড়িয়ে ধরে তারপর ফেনানো-ফাঁপানো ঝড়ের উচ্ছ্বাসটা হাস্যকরভাবে কেটে গেলে যেমন নিজেকে বোকা-বোকা করুণ ঠেকে, জয়শীলার মনের অবস্থাটা ঠিক তেমনি। রজত সম্পর্কে ভয়ের শেকড়টা হৃদয়ের অনেকদূর পর্যন্ত গেঁথে গিয়েছিল, কিন্তু সত্যিকার ভয়টা যখন ঝাঁপিয়ে পড়ল তার দেহের ওপর, দেখল মনের একটি চুলও নড়েনি। উত্তেজিত হবার চেষ্টা করেও উত্তেজিত হতে পারল না জয়শীলা। মন যদি প্রশ্রয় না দেয়, দেহ সাড়া দেবে কি করে! ঘুমের ঘোরে কুণাল তাকে জড়িয়ে ধরলে এর চেয়ে বেশি রোমাঞ্চ অনুভব করত সে।

কিন্তু...এ কী হল! তার মনের সমস্ত দৃঢ়তা কি করে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। রজতের হঠাৎ সান্নিধ্যের স্পর্শ থেকে তো সে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারল না, ওর শক্ত কঠিন বাহুপাশ ছিঁড়ে সে তো পারল না নিজেকে ছিনিয়ে আনতে। রজতের দৃঢ় আশ্লেষে সে যেন মুগ্ধের মতো বিহ্বল হয়ে আটকে রইল। রজতের মুহুর্মুহু চুম্বনের উষ্ণতার কনিকাও এখন লেগে নেই তার ঠোঁটে। তবু যতক্ষণ জড়িয়ে ধরে ছিল রজত তার মধ্যে দেহেরও একটা গোপন ষড়যন্ত্র ছিল বৈকি। তরঙ্গের দোলায় নদীর জলের যে কাঁপুনি। দেহের মরচে-ধরা জানালা-দরজাগুলো আর্তনাদ করে খুলে যাবার চেষ্টা করছিল। আর বহুকালের ঘুমিয়ে-পড়া একটা উচ্ছৃংখল বন্যতা ভীষণ দাপাদাপি করছিল শোণিত-সায়রে। জয়শীলার তখন মনে হচ্ছিল: জীবনের অনেক সমস্যা,

অনেক দুশ্চিন্তা দেহের কোলাহলের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে সাময়িক রেহাই পাবার পথ আছে। দেহের এই দিকটা আগে ভেবে দেখেনি জয়শীলা। টিকে-থাকবার আরো একটা যে এমন চোরাপথ আছে, ভেবে দেখেনি সে।

বৃষ্টিভেজা রাত্রির শীত-শীত হাওয়ায় কাঁপুনি ধরল জয়শীলার দেহে। হাতের আঙুলগুলি নিশপিশ করছে, কপালের শিরাদুটো দবদব করছে। ধপ্ করে বিছানার পাশে বসে পড়ল সে।

দিন কাটল।

অনেক—অনেক দিন।

তন্দ্রাতুর ক্লান্ত অলসতার মতো দিন কেটে যায় জয়শীলার। সময়গুলি যেন ভারি শক্ত ইট, আর অব্যক্ত যন্ত্রণার মতো তার ঢিমে ছন্দ। জ্বরের ঘোরঘোর আবিলতার মধ্যে গড়িয়ে-গড়িয়ে চলে জীবন। কি যে হচ্ছে, কি যে ঘটে যাচ্ছে তার চারপাশ দিয়ে তার অর্থবোধ হয়না, ধোঁয়া-ধোঁয়া, শূন্যতা।

বহু রজনী অভিনীত নাটকের নায়কের মতো রজতের উপস্থিতি—তার চলাফেরা, কথাবার্তা—মুখস্ত হয়ে গেছে জয়শীলার। পার্কের ধারের বারান্দাটা নাটকের দৃশ্যের পশ্চাদ্‌পট। মাথার ওপর অগণন তারকার ক্ষীণপ্রভা, মারহাট্টা ডিচের ওপর গাছের ফাঁকে চাঁদের হাতছানি, আর মুঠো-মুঠো হাওয়ার খুশি। মুহূর্ত কাটে। রাত্রির তরল রক্ত জমাট থকথকে হয়ে আসে, গভীর মৌন ধ্রুপদ সংগীতের রেশের মতো জড়িয়ে ধরে চেতনায়। জয়শীলার কাঁধে রজতের ভারি হাত, স্পর্শকাতর দেহের রক্তে উষ্ণতা নামে, কাঁধ থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত ছড়িয়ে যায় প্রদাহ, বারান্দায় মূক অন্ধকারে দুটো কায়া এক হয়, স্বভাব-উত্তেজিত রক্ত টগবগ করে ফোটে, সেই উত্তেজনা থেকে কিছুটা কুড়িয়ে নেয় জয়শীলা। তার মাথার চুলে, চিবুকে, গ্রীবায় রজতের পুরুষ-স্পর্শ, সিগারেটের গন্ধভারি ঠোঁটের উগ্রতায় জ্বালা-জ্বালা-করা খর চেতনা বিদ্যুতের মতো ছড়িয়ে পড়ে দেহে। সৃষ্টির আদি এক অন্ধআবেগের মতো ভেসে যায়, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে মনের ইচ্ছাগুলি। রজতের কাঁধে মাথা রেখে চোখ বন্ধ করে নিঃসাড়ে পড়ে থাকে জয়শীলা। যতক্ষণ তার অস্তিত্ব দিয়ে তাকে ঘিরে রাখে তখন আর অন্য ভাবনা-চিন্তার মেঘগুলি জটলা করতে পারে না মনের আকাশে। তারপর রজত চলে গেলে সঞ্চিত সমস্ত উষ্ণতা হারিয়ে চিন্তাদীর্ণ নিবো-নিবো উনুনের মতো মনে হয় নিজেকে।

আর ঘুমন্ত কুণালের দিকে চেয়ে অপরিসীম অপমানবোধে ক্লান্ত লাগে জয়শীলার। কুণালকে ভয় করে। ওর চোখমুখ কথা হাসি অবিকল নির্বানের মতো। কে জানে, বড় হয়ে সেও নির্বান হবে না!

এক-একদিন মনে হয়ঃ আর বুঝি সহ্য করতে পারবে না। তলে তলে যে লাভাস্রোত এতদিনে জমে উঠেছে সহসা কোনোদিন বিস্ফোরিত হয়ে পড়বে। একটা বিস্ফোরণই সে চায়! এক-একদিন ইচ্ছা জাগেঃ নির্বানকে চিঠি লিখতে। কিন্তু, ভাবা যত সহজ, করা তার চেয়ে কঠিন। যে মানুষটি আজ বছর সাতেকের মধ্যেও একবার খবর নিতে পারল না, তার কাছে যেচে কি করুণা ভিক্ষা করবে সে। না। জীবনে পশ্চাদপসরণেরও সীমা আছে। স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছেঃ নির্বান তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চায় না, চিঠিপত্রে কুণালের বার্তাটি পর্যন্ত নয়! হয়তো প্রোমে সে নতুন করে সংসার পেতেছে, হয়তো··· যাকগে। নির্বান কি করতে পারে, কি করছে—এ ভেবে লাভ কি তার। তবু, ভাবনাকে মলাটবন্ধ বইএর মতো থামিয়ে দিতে পারে না। কুণালের কথা ভাবতে গেলে ওর বাপের কথাও আসে। বাপের মতো দেখতে না-হয়ে সে যদি তার মতোই দেখতে হত, তাহলে হয়তো এত ভাবত না।

নিজের অন্তর্দ্বন্দ্বে জ্বলেপুড়ে খাক হতে থাকে জয়শীলা। জীবনে আবেগকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে, এখন মনে হচ্ছে, নিজেকে যত দুঃসাহসী ভেবেছিল আসলে তত নয়। দুঃসাহসী নভোচারী বিহঙ্গকেও একসময় কুলায় নামতে হয়। দুঃসাহসটা যত সত্যি নীড়ে ফেরাও ততখানি। পিছন ফিরবে না ভেবেও জীবনের প্রতিটি মোড়ে দাঁড়িয়ে একবার সে পেছন ফিরে তাকিয়েছে। রজতের সঙ্গে হঠাৎ এই নতুন সম্পর্কের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে ছেড়ে-আসা আমূল জীবনটা পর্যবেক্ষণ না-করে পারল না সে। দেবপ্রিয়, নির্বান ···কত স্মৃতি, কত ছবি—কথা আর কথা। হুড়মুড় করে একযোগে ভেসে উঠছে সমস্ত অতীতটা। কিন্তু—বেদনার সঙ্গে মনে হচ্ছে জয়শীলারঃ অতীতের কোনো উত্তেজনা কোনো বেদনা আজ আর অনুভূতিকে তীক্ষ্ণ করে না। ছায়াছবিতে দেখা এ যেন অন্য কারুর জীবন। অবাক লাগে জয়শীলারঃ পরমপ্রিয় জীবনটার সম্পর্কে এত নিরাসক্ত, নির্বিকার হতে পারল কি করে। যাকে বেশি ভালোবাসা যায় তাকে দূরেও সরিয়ে রাখা যায় বোধহয়। এত-দিন নিজের জীবন সম্পর্কে পরম আসক্তি জড়িয়েছিল, কারণ জীবনের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল তার। কর্তৃত্ব খোয়ানো আজকের জীবনটার যেন আর সে মালিক নয়। শাসন-ক্লান্ত অবশেষে অদৃষ্টের হাতে সঁপে দিয়েছে।

জীবনের প্রতি ভালোবাসা ছিল, বিশ্বাস ছিল, কিন্তু সমস্ত সাধু সংকল্প নিয়েও তো আপন-সত্তাকে উর্ধ্বে তুলে ধরতে পারল না জয়শীলা। বিশ্বাসের যদি দাম না থাকে, তবে পুরানো সংস্কারকে আঁকড়ে ধরে লাভ কি! কেন এমন হল। দেবপ্রিয়, নির্বান কারুর কাছেই বিন্দুমাত্র প্রীতি, সহানুভূতি কেন সে পেল না, ফাঁকি যদি সে দিয়ে না-থাকে তবে কেন তার জীবনটা ফাঁকির বোঝা হয়ে উঠল।

ভাবতে-ভাবতে কূল-কিনারা পায়না জয়শীলা। তবে কি জীবনের নিজস্ব একটা নিয়ম-কানুন আছে। ভালোবাসা দিয়ে সে-নিয়ম-কানুন জানা যায় না! তাকে বিচার দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে জানতে হয়। তবে কি সে বিচার বুদ্ধিহীন নির্বোধ জীবন-প্রেমের শিকার হয়েছে। পৃথিবীর হাটে হৃদয়কে প্রাধান্য দিতে গিয়ে বুদ্ধিকে খারিজ করেছে। মাথার ভেতরটা অনেক পরিষ্কার হয়ে আসে জয়শীলার। আবেগের ফেনা সরিয়ে যেন যুক্তির ডাঙা ভেসে উঠেছে চোখের সামনে। কিন্তু, এই যুক্তিধারণাগুলি যদি আগে মাথায় আসত, তাহলে জীবনের চেহারাটা এমন হত না। যখন এল, তখন আর ফেরবার পথ নেই। জীবন দিয়েই বোধহয় এই শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়।

অন্ধকার রাত্রির মৌনে জয়শীলার দীর্ঘশ্বাস মিশে গেল।

সেদিন আপিসের পর স্নেহলতার ওখানে গেল জয়শীলা।

'এতদিন পরে মাসিকে মনে পড়ল? বুড়ো মাসিমাকে আর ভালো লাগে না, না?

জয়শীলা কাঁধ থেকে ব্যাগটা আল্‌গা করে বিছানার ওপর পা ছড়িয়ে শুল। 'কী যে বলো মাসিমণি। কে বলেছে তুমি বুড়ো হয়েছ।'

'তোর শরীর মোটেই ভালো দেখাচ্ছে না। অত্যাচার করছিস খুব।'

জয়শীলা বিশীর্ণ হাসল।

'নির্বানের কোনো খবর এসেছে?' স্নেহলতার কণ্ঠে উদ্বেগ।

'না—'

'শাশুড়ির কাছে গিয়েছিলি?'

'না—'

স্নেহলতা একটা নিশ্বাস ফেললেন। 'আমার মনে হয়ঃ তোর শ্বশুরবাড়িতে ফিরে যাওয়াই ভালো।'

জয়শীলা হঠাৎ জ্বলে উঠল। জ্বলে উঠল যেন নিজের ওপরেই। 'তোমার

কি ওই এক কথা মাসিমা। ফিরে যা—ফিরে যা। কোথায় ফিরব, কোন্ আশায় ফিরব বলতে পারো?'

স্নেহলতা চুপ করলেন। চুপ না-করে উপায় ছিল না। কারণ জয়শীলা হয়তো এখনই তার নিজের জীবনের ওপর কটাক্ষ করবে। সারা জীবনব্যাপী এই একটি প্রশ্নই পুরানো ক্ষতের মতো তাঁকে রক্তাক্ত করছে। সত্যি কি ফেরা যায়! হয়তো ফেরা যায় না! কিন্তু না ফিরে উপায় কি। এই অসার ব্যর্থ জীবনে বেঁচে-থাকার কোনো অর্থ নেই।

'মাসিমা, রাগ করলে?'

'নারে, তোর ওপর রাগ করে পারি। পাগল মেয়ে!'

'আচ্ছা মাসিমণি—'

'কি রে?'

'সত্যি কি আর জীবনে বেঁচে-থাকার অন্য অর্থ নেই। ভুলকে যদি আজ ভুল বলে জেনে থাকি তাকে শোধরাবার অন্য পথ নেই?'

'তোর কথা আমি বুঝতে পারছিনে শীলা—'

'ধরো ঃ কেউ যদি আজ আমার এই ভুলে-ভরা জীবনটারই নতুন করে দাম দিতে আসে। যদি…'

স্নেহলতা বললেন, 'বুঝেছি। কিন্তু সেটাও যে একটা ভুল নয়, এ গ্যারান্টি কোথায় পাবি?'

জয়শীলা চুপ করে রইল।

স্নেহলতা আবার বললেন, 'মেয়েদের জীবনটা এক-ফসলের। বারোমাসে তার ফসল ফলে না। ভালোবাসার হৃদয় মেয়েদের একবারই ফোটে।' নিজের মনেই হেসে উঠলেন তিনি। 'খুব কাব্য করে ফেললাম নারে? বোস তোর খাবার নিয়ে আসি।'

স্নেহলতা খাবার আনতে গেলেন, না কাঁদতে গেলেন, কে জানে।

নির্জন ঘরটা অবকাশ পেয়ে এবার জয়শীলাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল। সেই চার দেয়াল, কড়িকাঠ, সিলিঙে হলদে ছোপ, সেই জানলার ফ্রেমে-আঁটা শেলেট-রঙা আকাশ, আর হাওয়ার লুটোপুটি। অনেক রঙিন স্মৃতির আলোড়ন জানালার পর্দার নীলে। দেবপ্রিয়! দেবানাং প্রিয়ঃ। দেবতার প্রিয় বলেই মানুষের ভোগে লাগেনি। স্মরণের বেলাভূমিতে পাখির পায়ের আঁকিবুকি, নীল ঢেউ ফেনিল। এই ঘর কৈশোর প্রথম-যৌবনের আবেগ বাষ্পে মদির।…'ভালোবাসার হৃদয়' মাসিমা বেশ বলেছেন। রাত্রির শিশিরের

একটি ফোঁটা ঝরে' পড়ল কুঁড়ির বুকে, কুঁড়ি দল মেলল, হল পরিপূর্ণ ফুল। তারও পর অনেক শিশির ঝরেছে ফুলের বুকে, দল হয়েছে মলিন বিবর্ণ, পরিশেষে একদিন টুপ করে' ছিন্নভিন্ন ঝরে পড়েছে ভুঁয়ে। কিন্তু কাব্য করে' বললেও, সত্যি কি মেয়েদের হৃদয় বস্তুটি তাই। পরিবর্তনই যদি পৃথিবীর ধর্ম হয়, তাহলে তার মন, তার হৃদয়ের পরিবর্তন কি অস্বাভাবিক! ভালোবাসার জন্যে যে হৃদয় বিস্তীর্ণ হয়ে রয়েছে—একজনের অবর্তমানে সে-হৃদয় শুকিয়ে যাবে, এ কেমন করে ভাবা যায়। ভালোবাসাই যেখানে মুখ্য সেখানে ব্যক্তির উপস্থিতি-অনুপস্থিতি নঙর্থক ব্যাপার। দেবপ্রিয় তার ভালোবাসাবোধটুকু উন্মেষের প্রত্যক্ষ কারণ হতে পারে এইমাত্র। তার হৃদয়-সাম্রাজ্যে দেবপ্রিয় ছাড়া ভালোবাসার অন্যপাত্র আসতে পারবে না, এর মতো মিথ্যা কিছু নেই। নির্বানকেও সে ভালোবাসতে চেয়েছিল বৈকি। আর একদিন রজতকেও নিশ্চয় ভালোবাসবে।

স্নেহলতা ফিরে আসতেই হেসে উঠল জয়শীলা। 'তোমার ধারণা যে ভুল তা আমি প্রমাণ করব মাসিমা।'

'সে কি। কি বলছিস্ তুই!' স্নেহলতা চমকে উঠলেন। 'এত ঠকেও কি জীবনে কিছু শিখলিনে তুই। জীবনটা কি জুয়ো যে একটার পর একটা বাজি ধরে তুই ভাগ্যপরীক্ষা করবি।'

'জুয়ো বৈকি মাসিমা—' মাথা ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে বললে জয়শীলা: 'নেশা তো বটেই, জীবনের নেশা, ওয়াইন-টনিকও বলতে পারো।' খিল-খিল করে' হেসে উঠল জয়শীলা। হাসতে-হাসতে বেদম কাশি পেয়ে গেল তার। চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল। মুখে আঁচল চাপা দিল সে।

স্নেহলতা অন্তরে শিউরে উঠলেন।

সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে জয়শীলার জন্যে একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা অপেক্ষা করছিল। এয়ার মেলের চিঠির গায়ে তার নাম ঠিকানা লেখা হস্তাক্ষর দেখে হতবুদ্ধি নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল জয়শীলা। নির্বানীতোষ! দীর্ঘ সাতবছর বিরতির পর কি-বার্তা বহন করে' আনল তার চিঠি! তবে কি সে ভুল বুঝেছে, ফিরে আসছে জয়শীলার কাছে। কিন্তু…যদি ফিরলই সে, তবে তার জীবনের এই আবর্তের মধ্যে কেন!

হৃদয়ের সমস্ত উত্তাপ, অনুভূতি যখন জ্বলে-জ্বলে ছাই তখন কি ওর ফেরার সময় হল! কিন্তু কি দেবে ওকে? কিছুই তো আর রাখেনি ওর জন্যে আলাদা করে। তার হৃদয়ের যা কিছু নিজস্ব সব উজাড়

করে' বিকিয়ে দিয়েছে। বোধকরি তার নিজের জীবনটাও আর তার হাতে নেই।

চিঠি হাতে ক্লান্ত শ্রান্ত অনড় স্থির হয়ে রইল জয়শীলা। যে—মনটা বিস্রস্ত এলোমেলো হয়ে গেছে তাকে গুটিয়ে এনে ভাববার চেষ্টা করল সে। অবাক হয়ে গেল: এতবড় হৃদয়ের মাঝখানে নির্বানীতোষের জন্যে একফোঁটা জায়গা নেই। উপেক্ষার কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত এতগুলি বছরের রিক্ততাকে তুমি ফিরিয়ে আনতে পারো! পারো আমার জীবনের সেরা দিনগুলিকে আবার আমার হাতে তুলে দিতে! পারো না। আমার চোখ চেয়ে-চেয়ে অন্ধ হয়ে গেছে, প্রসারিত হাত অপেক্ষা করে'-করে' পাথর, মনের সড়ক নীরবে মাথা কুটে কুটে পথ না পেয়ে অন্য বাঁক নিয়েছে। না-না-না। একটা মর্মন্তুদ যন্ত্রণা বুক থেকে ঠেলে উঠে তাকে পাগল করে' দিতে চাচ্ছে। দাঁতে দাঁত এঁটে পাথরের মতো শক্ত কঠিন দাঁড়িয়ে রইল জয়শীলা।

তারপর ধীরে ধীরে চিঠিটা খুলল। আলোর সামনে মেলে ধরল চিঠিটা। এক বর্ণ ভাষা বুঝতে পারছে না, একটি অক্ষরও চিনতে পারছেনা জয়শীলা। চোখে ঝাপসা দেখছে, থরথর করে' কাঁপছে আঙুলগুলি। হঠাৎ আলোতে বিবর্ণ পাণ্ডুর হয়ে উঠল মুখ, রক্তের সঞ্চালন বন্ধ হয়ে গিয়ে সে যেন জমাট স্ট্যাচুতে রূপান্তরিত। আবার, আবার বানান করে' পড়তে লাগল চিঠির লেখাগুলি। সংক্ষিপ্ত চিঠি। সাতবছরের জীবনের সারীভূত উপপত্তি। নির্বানীতোষ লিখেছে: "মার চিঠিতে জানতে পারলাম তোমার আপিসের রজত বলে' ছেলেটির সঙ্গে তুমি ঘর ছেড়েছ। এ-সম্পর্কে আমার মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তথাপি আমার একটা কর্তব্য থেকে যাচ্ছে—তোমাকে আইনের চোখে মুক্তি দেওয়া। আলাদা কাগজে তার ব্যবস্থা করেছি। আশা-করি, এরদ্বারা তুমি বন্ধনমুক্ত হতে পারবে।"

কখন পেছনে রজত এসে দাঁড়াল খেয়াল নেই জয়শীলার। অবাক চোখে রজত তার দিকে চেয়ে কি মনে করছে তা বিবেচনা করবার মতো অবস্থাও ছিলনা জয়শীলার। কতক্ষণ নিথর নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল সে। তারপর ধীরে ধীরে চেতনা ফিরে এল, উদ্গত নিশ্বাস চেপে এবার রজতের চোখের দিকে তাকাল। কয়েক মিনিট কোনো কথা বলতে পারল না। একটা শ্বাসরোধকরী পরিস্থিতি। ভাবতে অবাক লাগে জয়শীলার: চিঠি দেখেই কি করে কল্পনা করতে পেরেছিল, নির্বান ফিরে

আসছে, এত বড় নাটকীয় ব্যাপার কি করে আশা করেছিল সে। নাকি, গোপনে নির্বানের ফেরার সম্ভাবনা লালন করত সে, প্রশ্রয় ছিল তার নিজের মধ্যেই। তবু, ওর না-ফেরার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়েও তো মন হাল্‌কা হচ্ছে না। তার মুক্তিকে তো সে নিজে ছিনিয়ে আনতে পারেনি, নির্বান করুণা করে তাকে মুক্তি দিয়েছে। যে-মুক্তি স্বোপার্জিত নয়, তার কি দাম রইল তার কাছে। মন যেখানে মুক্ত হয়েছে, আইন তার পায়ে শেকল জড়াবে—এই কি ভেবেছিল নির্বান? যে-সংসার আমাকে দেউলে করেছে তাকে শ্রদ্ধা করতে হবে, সম্ভ্রম দেখাতে হবে! এত ভীরু, এত দুর্বল জয়শীলা! নির্বান ভুল ভেবেছে তার সম্পর্কে। এই মুহূর্তে আমি সিঁথের সিঁদুরের পরিহাসটুকু মুছে ফেলতে পারি, পারি সোনা বাঁধানো লোহা ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলতে। কাল প্রত্যুষেই চৌমাথায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করতে পারি আমার বৈধব্যকে।

'কী হল? তুমি অমন করে তাকিয়ে আছ কেন?' রজত জিগ্যেস করল।

কে? ও—রজত। হাসল জয়শীলা। সম্বিত ফিরে পেল। বললে, 'নির্বান চিঠি দিয়েছে। এই ছাখো পড়ে—'

রজত এক মুহূর্ত থমকে গেল। তারপর কোনো রকমে জড়ানো গলায় জিগ্যেস করল: 'কী, কী লিখেছে চিঠিতে।'

জয়শীলা বললে, 'ভয় নেই। ও ফিরছে না। আইনের চোখে আমাকে মুক্তি দেবার জন্যে ওর কনসেণ্ট পাঠিয়েছে।...কি, বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলে যে। শুনে আনন্দ হচ্ছে না তোমার। ছাখো তো আমি কেমন হাসছি।' খিলখিল করে হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো হেসে উঠল জয়শীলা।

'এই—এই জয়শীলা—অমন করছ কেন—'

'আমাকে প্রাণ খুলে হাসতে দাও রজত। কতদিন হাসতে ভুলে গেছি।' হাসতে হাসতে মুখ লাল, চোখ দুটো ঘুরতে লাগল, টলমল শরীরে তক্তপোশের বুকে গড়িয়ে পড়ল জয়শীলা।

'তুমি চুপ না করলে আমি এখুনি চলে যাব—'

'চলে যাবে! খুব বীরপুরুষ! কই, যাও দেখি—' জয়শীলা রজতের জামার হাতা ধরে ফেলল: 'এই তো তুমি চেয়েছিলে। তোমার ডিসপোজালে একটি আস্ত মেয়ে। আঃ অত দূরে দূরে কেন! জড়িয়ে

ধরো আমাকে, ভয় নেই কুণাল এখন জাগবে না, ওকি তুমি কাঠ হয়ে রইলে কেন—এই, এই বোকা ছেলে, এইতো আমি আমার শরীর নিয়ে ছড়িয়ে রয়েছি তোমার বুকের কাছে, আরো ঘনিয়ে এস কাছে…' বিড়-বিড় করে বকে চলল জয়শীলা যতক্ষণ না ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়।

রজত আর দাঁড়াল না। সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল নিচে।

পিছন থেকে রজত তাড়া না-দিলে বোধহয় নিজের জীবন সম্পর্কে এত তৎপর হত না জয়শীলা। ঘুরে ঘুরে ডিভোর্সের সব ব্যবস্থা পাকা করেছে রজত। সপ্তাখানেকের মধ্যেই ডিক্রি পাবে জয়শীলা! তারপর জীবনের এক নতুন অধ্যায়। তার একটা খশড়াও মনে মনে তৈরি করেছে জয়শীলা। জানে: রজতকে অস্বীকার করা সম্ভব হবে না। রজত তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধবে বলেই ডিভোর্সের ব্যাপারে এত মেতে উঠেছে। রজত হয়তো, হয়তো কেন, নিশ্চয়ই বিয়ের প্রস্তাব করবে। এর পর ওকে বিয়ে না-করে উপায় নেই। কিন্তু—রজতের ছেলেমেয়ে স্ত্রী—সে-দিকটা যে একবারও ভেবে দেখেনি জয়শীলা, তা নয়। কিন্তু ভেবে-ভেবেও কিনারা পায়নি। একদিক গড়তে গেলে আর একদিক তো ভাঙতেই হবে। ভাঙনের উপরেই তো সে নিজের জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে যাচ্ছে। স্বার্থপরের মতো চিন্তাটা মনে হলেও, উপায় কি! পৃথিবীতে টিকে-থাকার মূল সূত্রটা এতদিন সে বোঝেনি। বাঁচার ইচ্ছাটাই স্বার্থপরতার কারাগারে বন্দী। স্বার্থবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে পৃথিবীতে টিকে-থাকা যায়না। রজতের সম্পর্কে প্রশ্ন একটা অবশ্যই আছে। কি দেবে, কি পাবে রজতের কাছে। প্রেম! বেঁচে-থাকার নিয়মে প্রেমের কোনো স্থান নেই। জীবনই একটা নেশা, এই নেশাকে সর্বস্ব করে বেঁচে থাকার অসুবিধে নেই। রজত তাকে ঘর দেবে, আশ্রয় দেবে। ঘর আর আশ্রয় ছাড়া আজ আর কোনো কামনা নেই জয়শীলার। প্রশ্নটা যতই স্থূল হোক, যতই মোটা তারে বাঁধা থাক, এর মতো সত্য কিছু নেই।

যথানিয়মে আপিস করল জয়শীলা, নিয়মমতো ফিরল বাসায়। কুণালকে নিয়ে পড়তে বসল। ভারি সময়কে আর উৎপীড়িত হতে দিল না জয়শীলা। এত শান্ত, এত ধীরস্থির হয়ে গেছে সে, যে দেখে অবাক হয়। আবেগ নয়, উত্তেজনা নয়, সহজ পৃথিবীকে এবার সহজ চোখে দেখবার সাহস অর্জন করেছে জয়শীলা।

দিন তিনেক আপিস থেকে ছুটি নিয়েছিল জয়শীলা। শরীর খারাপ বলে অথবা দশজনের থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে একটু বিশ্রাম নেবে বলে। এই কদিন রজত আসেনি বাসায়। বোধহয় ব্যস্ত আছে সে।

সেদিন সন্ধ্যের দিকে হঠাৎ আপিসের মেয়েরা এসে হাজির। নির্ঝরিণী, বিজয়া, সুধা আর সুশীলাদি।

'কী সৌভাগ্য, তোমরা আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েছ…'জয়শীলা অভিনন্দনে সহজ হতে চেষ্টা করল।

ওর অভিনন্দনের উত্তরে ওরা কি বলল, আদৌ কিছু বলল কিনা, কানে গেল না জয়শীলার।

চা তৈরি করল, দোকান থেকে কেক আনাল।

আবহাওয়াকে সহজ করে তুলতে চেষ্টা করেও সহজ হচ্ছিল না।

মেয়েদের চোখে জয়শীলা যেন অন্য কোনো বিস্ময়কর নারী—যাকে দেখে বিস্ময় হয়, ভয় হয়। না-কথা-বলার অস্বস্তিতে ঘরের মধ্যে অসময়ে গুমোট নেমে আসে।

জয়শীলাই নীরবতা ভাঙল। 'বাঃ তোমরা চুপ যে। এত দিন পর তোমাদের আগমন ঘটল। কই, সুশীলাদি, তোমার উপদেশের ঝাঁপি খোলো—'

নির্ঝরিণী একটু কেশে বললে, 'বাসাটা তোমার বেশ ভালোই হয়েছে। দক্ষিণ খোলা…'

জয়শীলা হাসল। 'ওদিকে ছোট্ট বারান্দা আছে। পার্কের হাওয়া সোজা এসে লাগে। চাই কি, মাথার ওপরে তারা দেখতে পাবে, মারহাট্টা ডিচের ওপরে গাছের মাথায় চাঁদ…'

নির্ঝরিণী হাসল। 'আমাদের জীবনে কি আর কাব্য আছে ভাই। কেরানি আমরা আমাদের কে রাজা হবে!'

জয়শীলা বললে, 'বেশ তো। আমার বাসা থেকেই মাঝে মাঝে কাব্য কুড়িয়ে নিয়ে যেও।'

'না বাবা। তোমার ওই কাব্যের মনিমুক্তো আঁচলে করে বেঁধে নিয়ে যেতে পারব না। আঁচল পুড়ে যাবে।'

নির্ঝরিণী, বিজয়া, সুধা উঠে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

জয়শীলাকে একলা পেয়ে সুশীলা জিগ্যেস করল: 'হ্যাঁরে, কি শুনছি তোর সম্পর্কে—'

'কি শুনছ সুশীলাদি—'

'ডাক্তারের সঙ্গে ডিভোর্সের জন্যে তুই নাকি কোর্টের আশ্রয় নিয়েছিস।'

'সবটা তুমি শোনোনি সুশীলাদি। আমার কাছে এলেই জানতে পারতে। হ্যাঁ ঃ দু'একদিনের মধ্যেই আমি ডিক্রি পাব।'

সুশীলা চুপ করে রইল। তারপর বললে, 'কাজটা কি ভালো করলি। এবার—?'

জয়শীলার মুখ শক্ত-কঠিন। বললে, 'তারপরটাও ভেবেছি বৈকি। হ্যাঁ তোমরা যা অনুমান করেছ তাই। আমি রজতকেই বিয়ে করছি।'

সুশীলা আবার নির্বাক। দম নিয়ে বললে, 'রজতের স্ত্রী আছে, ছেলেমেয়ে আছে। তাদের কথা একবার ভেবে দেখেছিস।'

'এত কথা ভাবতে গেলে আমার চলে না…'

'আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি তোকে দেখে। তোর মতো মেয়ে, রজতের মধ্যে কি পেল, কি আছে ওর।'

'কিছু পেতেই হবে, এমন কি কথা আছে।' জয়শীলা মুখের ওপর নেমে-পড়া চুলগুলি পিঠের দিকে সরিয়ে দিল।

'তোর কি ধারণা, রজত তোকে ভালোবাসে?'

'জানিনা। জানতেও চাইনে। শুধু জানি ঃ বেঁচে-থাকার পক্ষে প্রেম অপরিহার্য নয়।'

সুশীলা গম্ভীর। 'তাই বলে ওর মতো একটা ভাল্‌গার…'

'সুশীলাদি!' জয়শীলার কণ্ঠ গর্জন করে উঠল।

'রাগ কোরো না জয়শীলা। দিদি বলে ডাকো তাই তোমার জীবনে ইনট্রুড করবার অধিকার আমার আছে। মনেপ্রাণে যাকে খারাপ কুৎসিত বলে মনে করি তাকে চিরদিনই তাই বলে যাব।' সুশীলার গলার স্বর শান্ত হয়ে এল ঃ 'রজতকে তুমি ভালো করে জানো? এর মধ্যে দেখা হয়েছে তোমার সঙ্গে?'

জয়শীলা বললে, 'না—'

সুশীলা বললে, 'আপিসেও ছুটি নিয়েছে সে। তোমার কি ধারণা তোমার ডিভোর্সের ব্যাপার নিয়ে সে ব্যস্ত?' হাসল সে। বললে, 'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে রজত কিছুই বলে নি তোমাকে। পরশু দিন রজতের স্ত্রী তার পঞ্চম কন্যার জন্ম দিয়েছে ইডেন হাসপাতালে। আমি জানিনা এত বড় ভাল্‌গারিটির তুমি প্রশ্রয় দেবে কিনা!'

কী-একটা উত্তর দিতে গিয়ে চুপ করে গেল জয়শীলা। ফ্যালফ্যাল

করে শুধু চেয়ে রইল সুশীলার মুখের দিকে। বয়েসের আঁকিজুকি সুশীলাদির কপালে, রুক্ষ কর্কশ চুল, ফাটা ঠোঁট। কোনো কিছুই চেয়ে দেখল না. জয়শীলা। যেন পরিস্থিতিটা বোঝবার চেষ্টা করছিল! ভাল্‌গারিটি, নোংরামি! কথাগুলোর ব্যঞ্জনা আজ তার কাছে নতুন বলে মনে হচ্ছে। জীবনটা কি কখনো খাঁটি সোনা হতে পারে, খাঁটি সোনা সংসারের কোন প্রয়োজনে লাগে! সোনায় খাদ মিশিয়েই তো গয়না তৈরি হয়। জীবনটা কি কখনো কোনোদিন নির্ভেজাল পরিচ্ছন্ন হতে পারে। জীবনের প্রতিপদে নোংরামো, অশুচিতা, ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করেও তার হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে-ছেঁকে জীবনের কোনো সারবস্তু পাওয়া যাবে কি! যে ভালোত্বেয় আমার উপকার নেই তাতে আমার কি কাজ হবে! ভালো, ভালো, ভালো। জীবনে হাজারবার শুনেছে কথাটা সেই শৈশব থেকে, অনেক মোহ-মায়া জন্মেছে কথাটার সম্পর্কে। কেতাবের পাতায় অক্ষরের বন্ধনে কেবল তার ব্যবহার ঘটেছে। ব্যবহারিক জীবনে তার কোনো প্রয়োগ দেখা যায়নি। ভাল্‌গারিটি! সুশীলাদি গির্জের মতো মুখ করে কথাটা বলেছে। কিন্তু, জীবনে ভাল্‌গারিটিকে তুমি কি করে পাশ কাটাবে! বেঁচে থাকাটাই আজ এক হিসেবে ভাল্‌গার। সুশীলাদি, বিজয়া, সুধা, নির্ঝর—তোমাদের ব্যর্থ জীবনের বোঝা ঠেলে তোমরা কি সত্যি বেঁচে আছো। তিল তিল করে ক্ষয় হয়ে যাওয়া তোমাদের জীবনটা কি সত্যিই ভাল্‌গার নয়! ভাল্‌গারিটির ঊর্ধ্বে উঠব বলে পাখা মেলে দিলেও পায়ের শেকলের বন্ধন উপড়োবে কি করে। ভাল্‌গারিটি থেকে যদি মুক্তি চাও আগে পায়ের শেকল ভাঙো। সারা পৃথিবী মন্থন করে আমাকে একজন তাজা মানুষ দিতে পারো—যে সময় সমাজ পরিবেশের সীমাবদ্ধতা ভাঙতে পেরেছে। রজতকে আমি মহামানব ভাবিনি, তার ভাবনার আলোকে সে যথার্থ মানুষ। তার সংকীর্ণতা, অক্ষমতা, সীমাবদ্ধতা সত্বেও সে এ যুগের মানুষ। অসংখ্য জটিলতার জালে তার মস্তিষ্ক সচল, শাদা-কালো দ্বন্দ্ব-মিলনে তার মানসলোক গতিশীল। সে ক্লাসিক যুগের ভাস্কর-মানুষ নয় যে হয় শয়তান নয় দানব। রোমান্টিক যুগের মানুষ রজত—পাপপুণ্য শয়তানদেবতার দ্বন্দ্বে বিক্ষুব্ধ তার হৃদয়বৃত্তি। একনিষ্ঠ স্বামী হবারও তার একাগ্র একরোখামি নেই, প্রণয়ী সাজবার অধ্যবসায়েও তার বিরাম নেই।

সুশীলা ওরা চলে যাবার পরও তেমনি স্থির অকম্পিত বসে রইল জয়শীলা। কী আশ্চর্য, বুদ্ধি দিয়ে যে ঘটনাকে বোঝা যায়, হৃদয় দিয়ে তো তার

সাড়া মেলে না। রজতের স্ত্রী পঞ্চম কন্যারত্নের জন্ম দিয়েছে। এই স্বাভাবিক ব্যাপারটাকে যুক্তি দিয়ে মেনে নিতে চাইলেও, মনের সমর্থন পায় না। স্বামী হয়ে স্ত্রীর প্রতি সে কর্তব্য করেছে, তার চারিত্রিক সাধুতারই প্রমাণ দিয়েছে রজত। কিন্তু, এই ঘটনাকে সে কেন লুকোল তার কাছে। তবে কি তার মনেই এ ব্যাপারে গোপন লজ্জা ছিল! লুকোতে গিয়ে সমস্ত ব্যাপারটাকে ভাল্‌গারিটির পর্যায়ে নিয়ে গেছে সে। রজত কি ভেবেছিলঃ এই ঘটনা শুনে জয়শীলার তার ওপর বিরূপ ধারণা হত। নাকি তার দৈহিকতার দারিদ্র্যকে সে আড়াল করতে চেয়েছিল জয়শীলার চোখ থেকে। হয়তো তাই। কিন্তু, রজত কি জানেনা, তার দেহসর্বস্বতাকে সে একদিনও লুকোতে পারেনি জয়শীলার কাছে। তা জেনেও তো আপত্তি তোলেনি জয়শীলা। বরং প্রশ্রয়ই দিয়েছে। পৃথিবীতে জ্ঞান হওয়ার পর রজত যদি দেহকেই ব্যবহার করতে শিখে থাকে, সেটা যদি সত্যি হয়, তাহলে তাতে লজ্জা পাবার কি আছে। এও তো এক ধরণের বামাচারী তান্ত্রিক সাধনা!

ভাবতে-ভাবতে বোধহয় ঝিমুনি এসেছিল, ঘোর কেটে গেল জয়শীলার। সিঁড়িতে রজতের জুতোর শব্দ।

হাসতে-হাসতে ঘরে ঢুকল রজত। 'শোনো, কালকেই তুমি ডিগ্রি পাচ্ছ। দুপুরে কোনো সময় ওঁর আপিসে মিঃ চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা কোরো।'

জয়শীলা নিজেকে গুটিয়ে নিল। হাসল। 'আমার জন্যে তোমার কত খাটতে হল।'

রজত সিগারেট ধরিয়ে বললে, 'ঠাট্টা হচ্ছে?'

'বারে! ঠাট্টা হবে কেন!'

'তবে ফরমালিটি।' রজত হাসল ফের।

'বাজে কথা বকতে হবে না। শোনোঃ আজ রাত্রে তোমার এখানে নিমন্ত্রণ। না খেয়ে পালাতে পারবে না।'

'পালাব বলে তো আসিনি জয়শীলা। খাবার ঘুষ না দিলেও আমি থাকতাম।'

'তা আমি জানি। তোমার দৃষ্টি অনেক উঁচু।'

রজত হাসল। 'বামন যখন নই তখন চাঁদ ধরতে দোষ কি।'

'কিন্তু সত্যিই সেটা চাঁদ কিনা, তাও জানা দরকার।'

রজত উত্তর দিল না। আত্মপ্রত্যয়ের হাসি হাসল।

'তুমি একটু বারান্দার ধারে গিয়ে বসো। আমি কুণালকে খাইয়ে আসি।'

'যথা ইচ্ছা।'

কুণাল পড়ার বইএর ওপর ঘুমের ভারে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। আজ সারাদিন পড়া হয়নি। সন্ধ্যাবেলায় জয়শীলা অবশ্য বসেছিল ওকে পড়াবে বলে। সুশীলারা এসে পড়ল তাও হল না। অনেকক্ষণ একা-একা বই গু জে থেকে-থেকে ঘুমিয়ে পড়েছে কুণাল।

'এই ওঠ—খাবিনে—'

কুণালকে তুলে দিল জয়শীলা। বসে বসেই সে ঢুলতে লাগল। খাবার এনে মুখে পুরে দিতে লাগল জয়শীলা। চোখ বুজেই চিবিয়ে গেল কুণাল। মুখ ধুইয়ে দিয়ে ওকে বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল জয়শীলা।

এবার ছুটি। ঘরের জানালার গরাদ ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়াল জয়শীলা। ওধারের বারান্দা থেকে রজতের সিগারেটের গন্ধ ভেসে আসছে। কি বলছিল সুশীলাদি। ভাল্‌গারিটি, নোংরামি। রজত পঞ্চম কন্যার পিতা হয়েছে! ওইযে বারান্দায় তার অপেক্ষায় ইন্দ্রিয়গ্রামকে সজাগ করে রেখেছে ওই মানুষটি এখন জয়শীলার সান্নিধ্যের লোভে ব্যাকুল। কিন্তু, মন কেন নাড়া দেয় না। ও যাওয়া মাত্র মানুষটি কি বলবে, কেমন করে হাসবে, কেমন করে' সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে তাকে আচ্ছন্ন করে দেবে—সব জানা জয়শীলার। জয়শীলাকে নিবিড় আশ্লেষে জড়িয়ে ধরে সে হয়তো তার মধ্যে তার প্রসবক্লান্ত স্ত্রীরই স্বাদ খুঁজে পাবে, জয়শীলার ঠোঁটে চাপ দিতে-দিতে হয়তো ভাববে ইডেনে শুয়েথাকা তার সদ্যোজাত কন্যাটির কথা। মন দিয়েই তো মেয়েরা সকলের থেকে আলাদা হয়, অনন্য হয়, পুরুষের আলিঙ্গনে পিষ্ট সব নারীদেহই এক। দেহবিলাসী রজতের কাছে জয়শীলার তো বিশিষ্ট পরিচয় নেই।

সুশীলাদি' এসে তার শান্ত মনে ঝড় লাগিয়ে দিয়ে গেছে। একই বৃত্তে ঘুরে-ঘুরে তার চিন্তাগুলি ক্ষয় হচ্ছে। ভাববে না বলেও ভাবনাকে থামিয়ে রাখা যায়না। চিন্তিত মুখে সে বারান্দার দিকে এগিয়ে গেল।

'এই যে বোসো—'

জয়শীলা ধপ্‌ করে' বসে পড়ল।

'তোমাকে আজ ক্লান্ত দেখাচ্ছে।'

'হবে—'

'কি ভাবছ শুনি?'

'ভাবনার কি শেষ আছে।'

'আছে—আছে। আমার চোখের দিকে চেয়ে ছাখো। আমি তোমার ভাবনাহর।'

জয়শীলা হাসল। না। তোমার চোখে আমার ভাবনা দূরের আশ্বাস নেই রজত। তোমার চোখে বাসনা, দাহ, আমি ছটফট করছি। আপনা মাংসে হরিণা বৈরী। আমার শরীরের দিকে তুমি অমন করে চেয়ো না। বড্ড কুশ্রী, বড্ড বীভৎস দেখায়। একটু রঙ চড়াও, স্বপ্নের পালিশ লাগাও—আমাকে একটু স্বপ্নিল করে' তোলো, আমি যে মেয়ে, আমার খড়কুটো পেলেই চলবে না, আমি আড়াল চাই, আব্রু চাই, আমাকে এমন লজ্জাহীনা কাঙাল করে' তুলো না।

রজত ঘন হয়ে বসেছে জয়শীলার পিঠে ঠেস দিয়ে। জয়শীলা সংকুচিত হল, কুঁকড়ে দুমড়ে এতটুকু হয়ে গেল সে। কি ভাবছে রজত। প্রসব-ক্লান্ত ওর স্ত্রীর কথা, শিশুকন্যার কথা। কিন্তু, আমি বিশিষ্ট হতে চাই, আলাদা হতে চাই। আমি জয়শীলা, রজত শুনছ, আমি জয়শীলা!

'এই—এই রজত—দুষ্টুমি করে না—'

রজত হাসল। চোখে বিদ্যুৎ জ্বলে উঠল। জয়শীলার শরীরকে নিয়ে সে যেন তাণ্ডব নৃত্য শুরু করবে। জয়শীলা চোখ বন্ধ করে' নিঃসাড়ে দাঁত চেপে পড়ে' রইল। মূক ধরিত্রীর মতো প্রচণ্ড বর্ষণের হিংস্রতাকে সে সহ্য করতে চাইল। কিন্তু সহের সীমা আছে। হঠাৎ ক্ষিপ্রবেগে টান-টান হয়ে উঠে দাঁড়াল জয়শীলা, মাথার দুধারে কালো চুলের বন্যা, ধিকধিক জ্বলছে চোখের মণি, ঘন নিশ্বাসে ফুলে-ফুলে উঠছে বুক। নিচে থেকে ওর দেহকে দেখে রজতের মনে হল: জয়শীলার শরীরটা যেন প্রচণ্ড লম্বা হয়ে-হয়ে আকাশ ফুঁড়ে উঠছে, টলমল করে কাঁপছে, আধো-আধো অন্ধকারের মধ্যে দলিত ফণিনীর মতো বিচিত্র রহস্যময় দেখাল তাকে।

'এস—আমার হাত ধরো—' স্তব্ধ সমাহিত গলা জয়শীলার। ওকে টেনে নিয়ে এল ঘরে। 'বোসো বিছানায়—'

শক্ত কঠিন পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে দৃঢ় হাতে দরজা বন্ধ করে জয়শীলা। আলুথালু বেশবাশ, স্খলিতকেশ জয়শীলাকে অপার্থিব বস্তু বলে মনে হচ্ছে! উজ্জ্বল চাখের তারা, রক্তলাল মুখ, ঘনঘন নিশ্বাসের ছন্দে বুক ওঠানামা করছে। উজ্জ্বল পাথরের চোখে জয়শীলা তাকিয়ে রইল রজতের দিকে। তারপর স্থির পায়ে হেঁটে গেল আলোর বোতামের দিকে। আলো নিবে যেতেই একরাশ অন্ধকার যেন গ্রাস করল রজতকে।

রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রস্তরখণ্ডের মতো স্থির নিষ্কম্প রজত।

নিঃশব্দতা।

মুহূর্ত কাটছে। রাত্রির ধমনীতে ফোঁটায়-ফোঁটায় রক্ত জমা হচ্ছে।

অন্ধকারকে চূর্ণ করে জয়শীলার ছায়া-দেহটা অনিবার্যের মতো এগিয়ে আসছে রজতের দিকে। কাছে, আরো কাছে। হঠাৎ জয়শীলার শরীর-স্পর্শে চমকে উঠল রজত। একটা নিরাবরণ হিমহিম ভয় যেন টুঁটি চেপে ধরতে চাচ্ছে তার। মুখের ভেতর শুকনো খশখশে, ঢোঁক গিলতে কষ্ট হচ্ছে রজতের। সমস্ত ঘরটায় যেন এক লহমায় অক্সিজেন ফুরিয়ে গেছে। মৃত্যুর মতো তীব্র যন্ত্রণা, অব্যক্ত, ভোঁতা-ভোঁতা।

ফিশফিশ করে জয়শীলা বললে, 'তুমি তো এই চেয়েছিলে। আমার শরীর। নাও, তুলে নাও। কোনো ব্যবধান, কোনো আবরণ রাখিনি আমি।'

কুমোরের চাকা ঘুরছে। তালতাল মাটি, নরম, গলা-গলা, নিমেষে রূপ পাচ্ছে, আকার পাচ্ছে। স্পষ্ট একটা মানুষের দেহ, ছন্দিত, বঙ্কিম, সুঠাম—নাক মুখ চোখ, মাটি জমছে, শক্ত কঠিন স্তনাগ্র, গ্রীবাদেশ, নিতম্ব। সৃষ্টির আদিমতম রমণী। হে সৃষ্টিকর্তা, প্রাণ দাও, চেতনা দাও তোমার সৃষ্টিকে। স্পন্দন দাও, আবেগ দাও, রক্ত ঢালো শিরায়-শিরায়, পরিপূর্ণ প্রাণীন সত্তায় তাকে প্রতিষ্ঠিত করো।

নতুন দিনের আলোয় চোখ মেলল জয়শীলা। নরম রোদে ছেয়ে গেছে বিশ্ব-চরাচর। শিশুর চোখের মত নরম। রোদের দিকে চোখ মেলে দিয়ে হাসল জয়শীলা। বর্ষণক্লান্ত আকাশের মতো তার চিত্তলোক ঝলমল করছে। পাশ ফিরে শুল জয়শীলা। কাল রাত্রির পর থেকে আজ সে মুক্ত। সংসারের কাছে ছোট বড়ো সব ঋণ সে মিটিয়ে দিয়েছে। যেন দীর্ঘকাল মামলার পর সমস্ত সম্পত্তির দাবি চুকেবুকে গিয়ে এবার তার স্বস্তির পালা। পৃথিবীর কাছে আর কোনো ঋণ সে রেখে গেল না।

আজ আর কোনো তাড়াহুড়ো নেই। আপিসে যাবে না। বেলা হতেই কুণালকে স্নান করিয়ে দিয়ে নিজেও স্নান করে নিল জয়শীলা। লক্ষ্মী আজ দুজনেরই খাবার একসঙ্গে বেড়ে দিল। খাওয়া-দাওয়ার পর হঠাৎ আলনা

থেকে জামাকাপড় পেড়ে, কি মনে হল, স্তূপাকার করে বিছানায় এনে জড়ো করল জয়শীলা। তক্তপোশের তলা থেকে ট্রাঙ্কটা বের করে ভাঁজ করে জামাকাপড়গুলো ভরতে লাগল তার মধ্যে। ছোট্ট সংসার। ট্রাঙ্কের মধ্যে বেমালুম আত্মগোপন করল। কুণালের জামা ইজের কীড্‌ব্যাগে গুছিয়ে তুলল। এতক্ষণ পরিশ্রমে গায়ের জামা ভিজে জবজবে হয়ে গেছে জয়শীলার। পাখাটা খুলে দিল। হুড়মুড় করে বন্দী হাওয়াগুলো এবার ভীষণ দাপাদাপি শুরু করল ঘরের মধ্যে। জানালার গরাদ ধরে দক্ষিণের পার্কের দিকে তাকাল জয়শীলা। পার্কের পুকুরের ধারে এক পাল কাক কি নিয়ে তুমুল কলহ শুরু করেছে। মারহাট্টা ডিচের ওপার থেকে চেরাই-কলের ঘ্যাসঘ্যাস শব্দ ভেসে আসছে। দুপুরের উগ্র রোদে পার্কটা চোখ বন্ধ করে ঘুমোচ্ছে।

'দিদিমণি—'

লক্ষ্মী।

'আমাকে ডেকেছিলে?'

'হ্যাঁ।'

ব্যাগটা হাতে তুলে নিল জয়শীলা। 'তোর এমাসের মাইনে। কদিন আগেই দিয়ে দিলাম।'

লক্ষ্মী অবাক-চোখে চেয়ে রইল। 'তুমি কি কোথাও চলে যাচ্ছ দিদিমণি?'

'এ্যাঁ।' ফিরে তাকাল জয়শীলা। লক্ষ্মী অত চওড়া করে সিঁদুর পরে কেন! 'কি বললি? না। কিছু ঠিক নেই।'

লক্ষ্মী চলে যাচ্ছিল।

জয়শীলা ডাকলঃ 'শোন। মোড় থেকে আমাকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দিবি?'

লক্ষ্মী বেরিয়ে গেল।

শাড়ি বদলাল, জামা বদলাল জয়শীলা। কুণালকেও পরিচ্ছন্ন করে দিল।

'দিদিমণি, তোমার ট্যাক্সি এসেছে—'

'আচ্ছা।'

ট্যাক্সি ড্রাইভার অনুগ্রহ করে ট্রাঙ্কটা নামিয়ে নিল। কীড্‌ব্যাগ হাতে জয়শীলাও নামল। দরজায় তালা লাগিয়ে কুণালের হাত ধরে এবার ট্যাক্সিতে উঠে বসল।

ট্যাক্সি ছুটল। ডালহৌসি পাড়া।

রজত আগে থেকেই বসেছিল মিঃ চক্রবর্তীর ঘরে। ট্যাক্সির শব্দে বেরিয়ে

এল। ট্যাক্সির বিল মিটিয়ে দিতে যাচ্ছিল রজত, জয়শীলা বাধা দিল। 'আমি এই ট্যাক্সিতেই ফিরে যাব।'

মিঃ চক্রবর্তীর আপিসে ঢুকল জয়শীলা কুণালের হাত ধরে।

প্রৌঢ় পক্বকেশ দীর্ঘদেহ চক্রবর্তী হাত তুলে নমস্কার করলেন। 'বসুন—'

আরো দু' একজন মক্কেল বসেছিল, কাজ শেষ করে তাদের বিদায় দিলেন মিঃ চক্রবর্তী। এবার দুপুরে-আলো-জ্বালা ঘরটায় কুণালকে বাদ দিলে তিনজন প্রাণী। কলিংবেল টিপলেন চক্রবর্তী। জয়শীলার দিকে ফিরে জিগ্যেস করেলন: 'চা চলবে?'

'না। ধন্যবাদ।'

'কোলড্ ড্রিঙ্ক?'

জয়শীলা মাথা নাড়ল।

মিঃ চক্রবর্তী চেয়ারে কাত হয়ে বসলেন। মোটা সিগারটা ঠোঁটে চেপে চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইলেন। তারপর সোজা হয়ে বসে জয়শীলার দিকে চোখ রেখে জিগ্যেস করলেন: 'তাহলে? এখন কি করবে ঠিক করলে?'

জয়শীলা মৃদু গলায় বললে, 'কিসের—?'

মিঃ চক্রবর্তী হাসলেন। 'নাও ইউ আর ফ্রি অব ইওর চয়েস। এ নিউ লীজ্ অব লাইফ, ডু ইউ আন্ডারস্ট্যাণ্ড মাই চাইল্ড? জীবনের শেষ কথা হতাশ হয়ো না, বেশ দেখে শুনে ভেবে চিন্তে আবার জীবন শুরু করো।'

'ধন্যবাদ। অশেষ ধন্যবাদ মিঃ চক্রবর্তী।'

'নো মোর সেরিমোনি, মাই চাইল্ড। ইট ইজ মাই প্রফেশন। ল তোমাকে প্রটেকসন দিয়েছে।' জয়শীলার ডিক্রির কাগজটা এগিয়ে দিলেন মিঃ চক্রবর্তী।

জয়শীলা উঠে দাঁড়িয়ে কাগজটা হাত বাড়িয়ে নিল।

মিঃ চক্রবর্তী চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে আবার বললেন, 'বিং এ ল-ইয়ার আই মাস্ট এড্ভাইস ইউ ফর ওয়ানথিং। আই বিলিভ ইন ল অব লাইফ—জীবনের আদালতেও একটা আইন আছে, আমি আশা করি, সে-আইনকে তুমি বুঝতে চেষ্টা করবে। নাও গুড বাই মাই চাইল্ড। আই হোপ উই স্যুড্ নট মীট এগেন।'

কুণালের হাত ধরে বেরিয়ে এল জয়শীলা। পাশে রজত।

ট্যাক্সিতে উঠতে-উঠতে জয়শীলা রজতকে জিগ্যেস করল, 'তুমি কোথায় যাবে ?'

রজত হাসল। 'তোমার সঙ্গে যাব। আপিসে ছুটি নিয়েই এসেছি।'

জয়শীলা চিন্তিত গলায় বললে, 'ও!'

গাড়ি চলছিল সেনট্রাল এভিনিউ ধরে।

ইডেন হসপিটাল রোড পার হতেই হঠাৎ বিশ্রী গলায় চেঁচিয়ে উঠল জয়শীলা : 'ড্রাইভার রোখো—'

'কি হল ?' রজত অবাক হয়ে জিগ্যেস করল।

'একদম ভুলে গেছি। আমাকে এখুনি সুশীলাদির সঙ্গে আপিসে দেখা করতে হবে।' জয়শীলা স্থির গলায় বললে : 'তুমি বরং এখানে নেমে যাও। আমার ফিরতে যদি দেরি হয় আমার বাসার চাবিটা রাখো, খুলে বসতে পারবে।'

রজত বোকার মতো চাবি হাতে নেমে গেল।

'ড্রাইভার ফেরো। ডালহৌসি—'

গাড়ি ঘুরল।

ফুটপাথে দাঁড়ানো রজতের দেহটা ক্রমশ মিলিয়ে যেতে আবার আশ্চর্য শান্ত গলায় জয়শীলা চেঁচিয়ে উঠল : 'ড্রাইভার সোজা হাওড়া স্টেশন চলো—'

শিখ ড্রাইভার বোধহয় একটু অবাক হয়েছিল। কিন্তু জয়শীলার নির্দেশ পালন করতে সে দ্বিধা করল না। কালো মসৃণ পিচের বুকে গড়াতে-গড়াতে গাড়ি এগিয়ে চলল।

জয়শীলা চেয়ে দেখল : পাশে বসে কুণাল ঢুলছে, ঘামে নেয়ে উঠেছে ওর সারা শরীর। জয়শীলা পাশে জায়গা করে কুণালের ঘুমন্ত দেহকে কোলে তুলে নিল। রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম, নাকের ডগায়, চোখের কোলে, চিবুকের ঘাম মুছিয়ে দিল।

হাওড়ার ব্রীজ পার হতে-হতে জয়শীলার শুধু মনে পড়ছিল তার বন্ধু সেবা মিত্রের কথা। কতবার চিঠিতে লিখেছে : কী পড়ে রয়েছিস কলকাতায়, কেরানিগিরি করে নিজেকে শেষ করে দেবার জন্যে তোর মতো মেয়ের জন্ম হয়েছিল রে! চলে আয় আমার এখানে রামপুরহাটে, আমি আর এ্যাসিসটেণ্ট টীচার নেই, হেড মিসট্রেস হয়েছি, চলে আয়, আমার পক্ষে তোর মতো

মেয়েকে ইস্কুলে জায়গা দেওয়া মোটেই অসুবিধের হবে না। রামপুরহাটে নেমে যে-কোনো রিকশাঅলাকে জিগ্যেস করলেই হেড মিসট্রেস সেবা মিত্রের কোয়ার্টারে তোকে পৌঁছে দেবে।

হাত ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটার সংকেত।

ট্যাক্সির বিল মিটিয়ে দিয়ে কুলির পিছন পিছন বুকিং আপিসের দিকে এগিয়ে গেল জয়শীলা।

'কোন্ ট্রেণ মাইজি ?'

'কিউল প্যাসেঞ্জার।'

ভ্যানিটি ব্যাগে টিকিট পুরে' প্লাটফর্মের ভেতরে পা দিল জয়শীলা।

মরুভূমির দেশের গাড়িটা তখন দীর্ঘপথ পাড়ি দেবার উত্তেজনায় ধুঁকছে॥